Scanned by CamScanner

অপরিহার্য শরীয়াহ

Scanned by CamScanner

অপরিহার্য শরীয়াহ

আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ

অনুবাদ
আশিক আরমান নিলয়
মুহাম্মাদ জামিল

সম্পাদনা
সালমান মাসরুর

Scanned by CamScanner

অপরিহার্য শরীয়াহ

প্রথম সংস্করণ|

রমাদ্বান ১৪৪৩ হিজরি, এপ্রিল ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব © ইলমহাউস পাবলিকেশন ২০২২

ইলমহাউস পাবলিকেশন

www.facebook.com/IlmhouseBD

প্রচ্ছদ: উম্মে আবদুল্লাহ

নির্ধারিত মূল্য: ২৬০ টাকা

Oporiharjo Shariah abridged translation of Al Hukmu Bi Ghairi Ma Anzalallah by Shaykh Abdur Rahman Ibn Salih Al-Mahmood. Published by Ilmhouse Publication. First Edition, March 2022.

Scanned by CamScanner

“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।

নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগূতকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়।

আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।”

তরজমা, সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৬

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

পূর্বকথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি তাওবাহ কবুলকারী, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, যিনি অতীব দানশীল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, বিধানদাতা নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

> তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান চায়? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? [আল-মায়িদাহ, ৫০]

আধুনিক পৃথিবী থেকে আমরা সমাজ, আইন ও শাসন নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা পাই। ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে মানবজীবন, জীবনের উৎস এবং উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে। এই ব্যাখ্যাগুলোর কেন্দ্রে আছে মানুষ। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী—

আদিম মানুষ এক সময় সমাজ গঠন করে। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে গড়ে তুলে শাসনব্যবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা নিয়ম-কানুন, প্রথা-প্রচলন, সামাজিকভাবে স্বীকৃত আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আইনের সীমানা। কালক্রমে আসে বিভিন্ন ধরনের আইন ও শাসনব্যবস্থা। আসে নানা ধরনের পরিবর্তন। ধাপে ধাপে মানুষ এসে পৌঁছায় আধুনিক সময়ের আধুনিক ব্যবস্থায়। আধুনিক সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো সেই পরিবর্তন ও বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপ। আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা।

এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদী, মানুষকেন্দ্রিক এবং সেক্যুলার। মানুষ নিজেই আইন ও মূল্যবোধের নির্মাতা। আইন ও শাসনের সীমারেখা এখানে নির্ধারিত হয় কেবলই মানুষের পার্থিব

Scanned by CamScanner

লাভক্ষতির সমীকরণকে সামনে রেখে। মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বকে এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে না, কিংবা স্বীকার করলেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। মানুষই সর্বেসর্বা। পাশ্চাত্যে জন্ম নেয়া এই ব্যাখ্যা ও কাঠামো উপনিবেশবাদের যুগে পুরো পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাঠামোর অধীনেই আজ আমাদের বসবাস।

কিন্তু ইসলামের বক্তব্য একেবারেই আলাদা। ইসলাম বলে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। কেবল তিনিই সার্বভৌম। মানুষের জীবনমৃত্যু সহ সমগ্র সৃষ্টির একক মালিকানা কেবল তাঁরই। তিনিই নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। নির্ধারণ করে দিয়েছেন বৈধ ও অবৈধ এর সংজ্ঞা। ইচ্ছেমতো এই সীমানা আর সংজ্ঞা বদলে ফেলার অধিকার মানুষের নেই।

ইসলাম শেখায়, আমাদের জান, মাল, সময়, সম্পদ—সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি অধিকার তৈরি করে না। সৃষ্টির অধিকার আসে সৃষ্টির মালিকের কাছ থেকে। পার্থিব কর্তৃপক্ষ কেবল সেই অধিকারের বাস্তবায়ন এবং রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। এর বেশি কিছু না। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার বাইরে আর কিছু করার অনুমোদন মানুষের নেই। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তার অনুমোদন দেয়ার অধিকারও মানুষের নেই। একই কথা প্রযোজ্য আইনের ক্ষেত্রে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই বিধানদাতা।

এই বিধানগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন ওয়াহীর মাধ্যমে। মানব ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন ধাপে নবী-রাসূলগণের কাছে ধারাবাহিকভাবে ওয়াহী এসেছে, যার পূর্ণতা ঘটেছে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে। মুহাম্মাদ (ﷺ)—এর আনীত শরীয়াহর মাধ্যমে। দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দান করেছেন পরিপূর্ণ জীবনবিধান।

ইসলামী শরীয়াহতে ঠিক করে দেয়া হয়েছে মানবজীবনের প্রতিটি অংশ নিয়ে দিকনির্দেশনা, বিধান এবং সীমানা। মুসলিমদের দায়িত্ব এই শরীয়াহকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করা। মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। কারণ একজন মুসলিম, নির্দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নাযিলকৃত এই জীবনবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। নৈতিকতা এবং আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে নেয় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাকে। আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা এবং বিধানের বদলে কেউ যদি মানবরচিত কোনো ব্যবস্থাকে পছন্দ করে বা প্রাধান্য দেয় তবে সে আর মুসলিম থাকে না।

কাজেই আইন ও শাসনের ব্যাপারে পাশ্চাত্য থেকে আসা ধারণা আর ইসলামের শিক্ষা

Scanned by CamScanner

সাংঘর্ষিক। একটির কেন্দ্রে আছে মানুষ, আরেকটির কেন্দ্রে তাওহীদ ও রিসালাত।

দুঃখজনকভাবে, শরীয়াহর এই গুরুত্ব এবং ব্যাপ্তি আমরা ভুলে গেছি। প্রথমে উপনিবেশবাদী আগ্রাসন, তারপর নিজেদের গাফিলতি আর আপসকামীতার কারণে বর্তমানে আমরা পালন করছি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের এক খণ্ডিত রূপ। গ্রহণ করে নিয়েছি অন্যান্য ব্যবস্থা ও মতবাদ। শরীয়াহ বহির্ভূত ব্যবস্থার অনুসরণ কতোটা ভয়াবহ বিচ্যুতি বেশিরভাগ মুসলিম আজ তা জানে না। সাধারণ মুসলিমদের এ বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক করা যাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের অনেকেও দুঃখজনকভাবে বিদ্যমানতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য তৈরি করেছেন বিভিন্ন ব্যাখ্যা। ফলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বেড়েছে সংশয় ও বিভ্রান্তি।

শরীয়াহ শাসনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে এই সংশয় ও বিভ্রান্তিগুলো দূর করা এবং এ ব্যাপারে সঠিক অবস্থান সাধারণ মুসলিমদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি। বর্তমান সময়ে বিষয়টি নিয়ে যারা সবচেয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম সারির হলেন শাইখ ড. আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ (ফাকাল্লাহু আসরাহ)। শরীয়াহর আবশ্যকতা, শরীয়াহ বহির্ভূত আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং সেগুলো মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়ার মতো বিষয়গুলোর হুকুম নিয়ে তাঁর অনবদ্য গবেষণা 'আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ: আহওয়ালুহু ওয়া আহকামুহু'। এ গ্রন্থে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিশুদ্ধ অবস্থান তুলে ধরেছেন। খণ্ডন করেছেন মুরজিয়া এবং খারিজি গোষ্ঠীর প্রান্তিক চিন্তাধারার। আলোচনার মৌলিক উৎস হিসেবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহকে। পাশাপাশি অতীত ও বর্তমানের নির্ভরযোগ্য আলিমদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ও মতামত পুরো গ্রন্থজুড়ে ছড়িয়ে আছে মণি-মুক্তোর মতো।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা বাংলাভাষাভাষীদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাদের এই কাজটি করার তাউফিক দান করেছেন। আমরা আশা করি, যারা সত্যান্বেষী, যারা আন্তরিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের পথ অনুসরণ করতে আগ্রহী, এই বইটি তাদের সংশয় নিরসন করবে।

আমরা দুআ করি মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন, এতে বারাকাহ দান করেন। সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে সত্যের পথ সমুন্নত করার কারণে মহান আল্লাহ যেন লেখকের প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করেন। তাঁকে সত্যের ওপর অবিচল রাখেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাদের নেতৃবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ

Scanned by CamScanner

মুসলিমদের সেই পথের হিদায়াত দান করুন, যার ওপর তিনি সন্তুষ্ট। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

ইলমহাউস পাবলিকেশন
শাবান ১৪৪৩, মার্চ ২০২২

Scanned by CamScanner

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবিগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল সত্য অনুসারীদের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্য আকীদাহ, ইবাদাত, আখলাক, লেনদেনসহ সর্বক্ষেত্রে যে সহজ-সরল, নিখুঁত জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তাকে বলা হয় শরীয়াহ। এ শরীয়াহ মানবজাতির প্রতি আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত, বিশাল বড় রহমত। একজন মুসলিমের ওপর আবশ্যক হলো, শরীয়াহর সকল বিধি-বিধানের সামনে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। কারণ, যে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে কোনো মানবরচিত আইনকানুনকে পছন্দ করে বা প্রাধান্য দেয়, শরীয়াহর বিধানে অনাগ্রহী হয়, সে মুসলিম থাকে না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করা মুসলিমদের ওপর ফরয। কারণ, শরীয়াহর বাস্তবায়ন ব্যতীত ইসলামের অসংখ্য বিধানের ওপর আমল করা অসম্ভব, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বিধান যথাসাধ্য বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সকলে শরীয়াহ বাস্তবায়নের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরী। পাশাপাশি শরীয়াহ বহির্ভূত বিকৃত মানহাজে শরীয়াহ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং কখনো সম্ভব হয়েও ওঠেনি, এ বিষয়টিও বিশ্বাস রাখা জরুরি।

শরীয়াহর অপরিহার্যতা ও বর্তমান সময়ের বাস্তবতা নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন শাইখ ড. আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)। তাঁর এ বইতে তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও অতীত-বর্তমানের নির্ভরযোগ্য আলিমদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ও মতামতের আলোকে শরীয়াহর অপরিহার্যতার বিষয়টি অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। বইটির মূল আরবি নাম, الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (আল-হুকমু বি গাইরি মা-আনযালাল্লাহ : আহওয়ালুহু ওয়া আহকামুহু)। 'Manmade Law Vs Shariah' নামে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন নাসিরুদ্দিন আল-খাত্তাব। ইংরেজি থেকে বাংলাভাষীদের জন্য 'অপরিহার্য শরীয়াহ' নামে অতি সুন্দর অনুবাদ উপহার দেয়ার আয়োজন করেছে ইলমহাউস পাবলিকেশন।

Scanned by CamScanner

আল-হামদুলিল্লাহ, চমৎকার এ বইটির শার'ঈ সম্পাদনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কাজটি করেছি বেশ আগ্রহ নিয়ে। বইটি বর্তমান সময়ে অতি প্রয়োজনীয়, পাশাপাশি অনেক আগে মূল আরবি বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছিলো, তখন থেকেই এর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম এবং ইসলামী আইন ও গবেষণা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের সিলেবাসেও বইটি সংযুক্ত করেছিলাম।

যা-হোক, যথাসাধ্য ভালোভাবে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। সম্পাদনার সময় যেসব কাজ বিশেষভাবে করা হয়েছে, তা হলো:

১. কুরআন ও হাদীসের তরজমা নিরীক্ষণ।

২. সম্পূর্ণ অনুবাদ নিরীক্ষণ।

৩. মূল আরবি কিতাবের সহযোগিতায় দুয়েক জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধন।

৫. শেষের তিন অধ্যায়ে বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায় - ভ্রান্ত যুক্তিতর্ক ও এর জবাব - এ কিছু আলোচনার পুনরাবৃত্তি বাদ দেয়া হয়েছে।

৬. মূল বইয়ের আলোচনাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত করা। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় কিছু আলোচনা বাদ দেয়া হয়েছে।

৭. আয়াত ও হাদীসের শুধু তরজমা রাখা হয়েছে, মূল আরবি রাখা হয়নি। কারণ, এমন দলিল আনা হয়েছে অসংখ্য। মূল আরবি রাখলে পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং পাঠকের জন্যও আলোচনা অনুসরণ করা আরো কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৭. বইয়ের টীকায় প্রয়োজনীয় কিছু সহীহ হাদীস যুক্ত করা হয়েছে, শার'ঈ বিভিন্ন পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। লেখকের কিছু অস্পষ্ট কথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু জায়গায় লেখকের সাথে একমত না হতে পেরে নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে টীকা যুক্ত করা হয়েছে।

৮. শার'ঈ কিছু শব্দের যথাযথ অর্থ ব্র্যাকেটে কিংবা টীকায় সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু শার'ঈ পরিভাষা ও নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ নির্ভরযোগ্য সূত্রের আলোকে ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন, মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী বানিয়ে নিন এবং যারা এ বইটির কাজে দিনরাত মেহনত করেছেন তাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন।

সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবিগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল সত্য অনুসারীদের ওপর।

সালমান মাসরুর
শাবান ১৪৪৩ হিজরি, মার্চ ২০২২

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদের জন্ম ১৯৫৩ সালে (১৩৭৩ হিজরী)। হিজাযের ক্বাসীম প্রদেশের অন্তর্গত বুকাইরিয়াহ শহরে। তিনি বানু তামীম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষাগত জীবনে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুলুদদ্বীন অনুষদ থেকে মাস্টার্স এবং ডক্টরেট সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল আকীদাহ। পরবর্তীতে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদাহ বিষয়ক অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে আছেন -

- শাইখ উসমান আন-নাজরান
- শাইখ সালিহ আল-সুহাইবানী
- শাইখ সালিহ আল-ফাওযান
- শাইখ আব্দুল করিম আল-লাহিম
- শাইখ সালিহ আন-নাসির
- শাইখ আব্দুর রাহমান আল-বাররাক

বক্ষ্যমাণ বইটি ছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই তিনি রচনা করেছেন।

বর্তমান সাউদি সরকারের বিনোদন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং নীতিমালার সমালোচনার কারণে ২০১৯ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি বন্দী আছেন।

আল্লাহ তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের মন্দ আমল ও নফসের ক্ষতি থেকে। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি শরিকবিহীন; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

> "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:১০২]

> "হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (হক) দাবি করে থাকো এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে দৃষ্টিমান।" [সূরা আন-নিসা, ৪:১]

> "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৭০-৭১]

সর্বোত্তম কিতাব আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। দ্বীনের মাঝে নব-উদ্ভাবিত সকল বিষয় নিকৃষ্ট। নব-উদ্ভাবিত এসকল জিনিস বিদআহ, আর প্রতিটি বিদআহ পথভ্রষ্টতা।

ফিতনার পরিমাণ ও পরিধি বর্তমানে ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহর মাঝে হানা দেয়া একটি বিদআহ হলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ত্যাগ করে

Scanned by CamScanner

ভিন্ন কিছু দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা। বিচার-ফায়সালার জন্য আল্লাহর শরীয়াহ বাদ দিয়ে ভিন্ন কিছুর শরণাপন্ন হওয়াও এর অংশ। এটিই এখন অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি।

আহলুস সুন্নাহর আকীদাহর একটি প্রামাণ্য সংকলন আল-আকীদাতুত তাহাবিয়াহ। ইবনু আবিল-ইয আল-হানাফি (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত এ পুস্তিকাটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে সময় আমি রিয়াদে অবস্থিত কুল্লিয়াতু উসুলিদ দ্বীন (উসুলুদদ্বীন অনুষদ) ও কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহয় (শরীয়াহ অনুষদ) পড়াতাম। তখন প্রায়ই আকীদাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হত, যা 'আত-তাহাবিয়াহ'র ব্যাখ্যাকার লিখেছেন।

এর মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো কবীরা গুনাহগারের ব্যাপারে অবস্থান। পরকালে তার পরিণতি কী হবে? দুনিয়াতেই বা তাকে ফেলা হবে কোন শ্রেণিতে?

এ বিষয়ে সালাফুস সালিহীন ছিলেন মধ্যপন্থার অনুসারী। যে মধ্যপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে মুরজিয়া এবং ওয়ায়িদিয়্যাহ (খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা) গোষ্ঠী। সঠিক মতটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য উভয় প্রকারের প্রান্তিকতাকে পর্যালোচনা করতে হবে।

খারিজিরা মনে করে ঈমান হলো কথা, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের সমষ্টি। এতটুকু পর্যন্ত তাদের অবস্থান ঠিক আছে। কিন্তু কারও ঈমান আছে কি নেই, তা নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড তারা বানিয়ে ফেলেছে বাহ্যিক কাজকর্মকে। এখানে এসে তারা মারাত্মক ভুল করেছে। মু'তাযিলা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেকেও এ ব্যাপারে খারিজিদের এই ভুলের অনুসরণ করেছে। এদেরকে একত্রে ওয়ায়িদিয়্যাহ বলা হয়।

ত্রুটিপূর্ণ এই মূলনীতির জের ধরেই তারা বলত, যারা কবীরা গুনাহ করে—যেমন: যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি—তারা এগুলোকে হালাল মনে না করলেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। খারিজিরা সরাসরি এসকল গুনাহগারকে কাফির বলে দেয়। আর মু'তাযিলাসহ অন্যান্য গোষ্ঠী এদেরকে ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি একটি শ্রেণিতে ফেলে। উল্লিখিত সবগুলো গোষ্ঠী বিশ্বাস করে, পরকালে কবীরা গুনাহগাররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

খারিজিদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থান মুরজিয়াদের। মুরজিয়াদের মতে ঈমান শুধু জানার নাম। ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্কই নেই; তা অন্তরের আমল হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। জাহমিয়্যাহ এবং অন্য আরও কিছু গোষ্ঠীর চরমপন্থীরা এই অবস্থান গ্রহণ করে।

একই ধরনের আরেকটি মত হলো, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস। বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

Scanned by CamScanner

কালাম শাস্ত্রবিদদের[১] বিভিন্ন অংশও (আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন) এমন অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের মতে, অন্তরে বিশ্বাস থাকলেই ঈমান আছে; যদিও ওই ব্যক্তির মধ্যে ঈমান-বিধ্বংসী অন্য কোনো কিছু উপস্থিত থাকে। এখান থেকেই তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে, অন্তরে অবিশ্বাস না করলে কেউ কাফির হয় না। তারা ভুলে যান যে, শুধু বাহ্যিক কাজের ভিত্তিতেই ইসলামের ইমামগণ অনেককে মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অপমান করা, মূর্তিকে সিজদাহ করা, অথবা কুরআনের মুসহাফকে পদদলিত করা। অন্তরেও অবিশ্বাস থাকতে হবে, এমন কোনো শর্ত তাঁরা জুড়ে দেননি। সত্যি বলতে কী, আলিমগণ এ রকম অনেক বিষয়কেই বড় কুফর (আল-কুফর আল-আকবার) বলে ঘোষণা দিয়েছেন, এমনকি ওই কুফরের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঈমান অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি করলেও। যেমন : জাদুটোনা চর্চা করা, আল্লাহর শত্রুদের আউলিয়া (অভিভাবক, মিত্র, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, উপদেষ্টা, সাহায্যকারী ইত্যাদি) হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

এখন আসা যাক এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়ে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা। মুরজিয়া মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীলরা এ ব্যাপারে একটি ভ্রান্ত ধারণার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। তারা বলছে, আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো কিছুকে অস্বীকারকারী কাফির বটে। কিন্তু আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা "শুধুই" ছোট শিরক (আশ-শিরক আল-আসগার)। স্পষ্টত মৌখিকভাবে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার না করলে কেউ নাকি কাফির হবে না। কেবল কবীরা গুনাহগার হবে।

খারিজিরা যেসব দলিল দিয়ে তর্ক করত, সেগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে ইবনু আবিল-ইয বলেছেন,

> "কিন্তু তারপরও একটি বিষয়ে রয়ে যায়, যা আপাতদৃষ্টে শাইখের (ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ) মতকে খণ্ডন করছে। আল্লাহ নিজেই কিন্তু কিছু গুনাহকে কুফর বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,
>
> *"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]*
>
> আর নবী ﷺ বলেছেন,
>
> *"মুসলিমকে গালি দেয়া ফুসুক (অন্যায়, পাপ)। আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা*

---

[১] কালাম শাস্ত্রবিদ বা দার্শনিকদেরকে আরবিতে আহলুল কালাম (أهل الكلام) বলা হয়। এমনিভাবে আরবিতে তাদেরকে মুতাকাল্লিমুনও (متكلمون) বলা হয়। মুতাকাল্লিমুন হলো মুতাকাল্লিম (متكلم) এর বহুবচন। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

কুফর...।[২]

এ রকম আরও কিছু হাদীস[৩] উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

> “কবীরা গুনাহগারকে এখানে যে অর্থে কাফির বলা হচ্ছে, তা আলাদা। এর অর্থ এই না যে, সে আর মুসলিম নেই। সে ক্ষেত্রে তো সে মুরতাদ হয়ে যেত। যেকোনো মূল্যে তাকে হত্যা করা জরুরি হয়ে পড়ত তখন...”[৪]

এরপর তিনি এ বিষয়ে আরও আলোচনা করেছেন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে বিভিন্ন সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে এবং এ ধরনের গুনাহগার ব্যক্তিদেরকে কাফির, মুনাফিক ও বেঈমান বলা হয়েছে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে শেষের দিকে তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন,

> “কিন্তু আরেকটি ব্যাপার এখানে এড়িয়ে গেলে চলবে না। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন পরিচালনা করা এমন কুফর, হতে পারে যা ওই ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিতে পারে; অথবা এটি কবীরা বা সগীরা গুনাহও হতে পারে। একে রূপক অর্থেও কুফর বলা যায়, অথবা এটি ছোট কুফরও হতে পারে। উভয়পক্ষেই আলিমগণের মত আছে। একেক ক্ষেত্রে একেক মত প্রযোজ্য হবে।
>
> শাসক বা বিচারক যদি মনে করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করা বাধ্যতামূলক না বরং ঐচ্ছিক, অথবা নিশ্চিতভাবে কোনো বিধানকে আল্লাহর নাযিলকৃত হিসেবে জানার পরও সে যদি একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, তাহলে এটা বড় কুফর (কুফর আকবার)।
>
> আরেকটি ক্ষেত্র এমন হতে পারে যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করাকে সে ফরয বলে মানে। নির্দিষ্ট কোনো একটি ব্যাপারে শরীয়াহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত তাও জানে, কিন্তু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে তখন বিচার করে না। পাশাপাশি সে স্বীকার করে যে, ভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত দেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ক্ষেত্রে সে শুধু গুনাহগার। তাকে কাফির বলা যাবে রূপক অর্থে, বা ছোট কুফর (কুফর আসগার) অর্থে।
>
> আর যদি সে ওই বিষয়ে আল্লাহর বিধান না জানে, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ভুল করে ফেলে, তাহলে সে প্রচেষ্টার জন্য সাওয়াব পাবে।

---

[২] সহীহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৬৪।
[৩] শারহুত তাহাবিয়াহ, পৃ. ৪৩৯, আত-তুর্কি ও শুয়াইব আল-আরনাউত সম্পাদিত।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২।

Scanned by CamScanner

তার ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৫]

বক্তব্যটি ভালো করে খেয়াল করুন। অন্য সব কবীরা গুনাহ শুধুই দুই ধরনের।

১। গুনাহগার ব্যক্তি শরীয়াহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে যখন সে জানে এটা শরীয়াহর বিধান, এ ক্ষেত্রে সে কুফরে আকবার অর্থে কাফির হবে। অথবা,

২। সে শরীয়াহর বিধানকে স্বীকার করে কিন্তু অবাধ্যতার কারণে গুনাহ করে। এ ক্ষেত্রে সে একটি কবীরা গুনাহ করল। এমন ব্যক্তি কাফির নয়।

কিন্তু আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করা বা না-করার ক্ষেত্রে ইবনু আবিল-ইয তৃতীয় আরেকটি প্রকার এনেছেন। বলেছেন,

"আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করাকে সে ফরয বলে মানে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে শরীয়াহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত তাও জানে। পাশাপাশি স্বীকার করে যে, ভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত দেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে শাসন করার একটি পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এতে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। বিষয়টি নিচে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। পাশাপাশি আলিমদের ব্যাখ্যাও উল্লেখ করব এ ব্যাপারে।

যেহেতু এ বিষয়ে কিছু সংশয় রয়েছে, তাই আমি এই গ্রন্থটি বিশদভাবে রচনা করেছি, এ বিষয়ে যা বলা আছে তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক আলিমদের মতামত উল্লেখ করেছি।

এ গ্রন্থ ছয়টি অংশে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায় : শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন এবং ইসলামী আকীদাহতে এর অবস্থান

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয় আকীদাহর একদম মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, এ নিয়েই প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা। যেমন : ইবাদাত, রুবুবিয়্যাত এবং আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণবাচক বৈশিষ্ট্য একত্ববাদের সাথে সম্পর্কিত (অর্থাৎ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত)। এটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্যদানের সাথেও সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে অতীত-বর্তমানের প্রখ্যাত মুফাসসির ও অগ্রগণ্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৫] শারহুত তাহাবিয়াহ, পৃ. ৪৪৬।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায় : শরীয়াহ-শাসনের বাধ্যবাধকতা : নুসুস থেকে প্রমাণ

এই অধ্যায়ের আলোচনা বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াহর শরণাপন্ন হওয়ার বাধ্যবাধকতা নিয়ে।

এ-সংক্রান্ত দলিল অসংখ্য, বিশেষত কুরআনে। তাই এ অধ্যায়টিকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদে।

১। আল্লাহর শরীয়াহ অনুসরণের আবশ্যিকতা এবং অন্য কারও অনুসরণের সাধারণ নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আয়াত। এগুলোর সংখ্যা এতই বেশি যে, শুধু প্রথম দিকে কিছু আয়াতের সাথে মুফাসসির ও ইমামগণের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। বাকিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাখ্যা ছাড়াই। আগ্রহী পাঠকগণ নিজ দায়িত্বে খুঁজে নিতে পারবেন সেগুলো।

২। বিস্তারিত বর্ণনা : এই সেকশনে কিছু আয়াত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ সেগুলো আলোচ্য বিষয়ের দলিল। চারটি উদ্ধৃতির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি, যার মধ্যে মুফাসসিরীন ও আলিমদের মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত।

৩। সূরা মায়িদাহর আয়াতসমূহ : এটি কুরআনের পঞ্চম সূরা। যাতে আল্লাহর বিধান বাদে অন্য বিধানে শাসন-বিচার পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি বিস্তারিত বিষয়, সেজন্য পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায় : সূরা মায়িদাহ : প্রাসঙ্গিক আয়াত বিশ্লেষণ

সূরা মায়িদাহর আয়াতসমূহের আরও আলোচনা এসেছে। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কখন বড় কুফর আর কখন ছোট কুফর, তা এ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি। দৈর্ঘ্যের কারণে এবং স্পষ্টতার স্বার্থে এ আলোচনাটিও বিভক্ত হয়েছে পাঁচটি উপাংশে :

১। আসবাবুব নুযুল : সূরা মায়িদাহর শানে নুযুল বা আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট, এ নিয়ে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত, এবং সঠিকতর মতটির পর্যালোচনা।

২। আয়াতগুলো কাদের প্রতি নির্দেশিত : আয়াতগুলোর প্রয়োগের ব্যাপ্তি। এখানে উদ্দেশ্য কি ইহুদিরা, খ্রিষ্টানরা, নাকি মুসলিমরা? বিভিন্ন মত উল্লেখের পর আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছি।

৩। কখন কুফরে আকবার হবে : আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কখন বড় কুফর, এই অংশটিতে ব্যাখ্যা করেছি। উল্লেখ্য, সূরা মায়িদাহয় এ কাজটিকে কুফর (অবিশ্বাস), যুলম (অন্যায়) এবং ফুসুক (বিদ্রোহ-বিরুদ্ধাচার, পাপ) আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে আমি দেখিয়েছি যে, একই কাজটি তিন

Scanned by CamScanner

রকম হতে পারে :

ক) আদর্শিকভাবে অস্বীকার; হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম মনে করা।

খ) আল্লাহর আইন-বিরোধী আইন প্রণয়ন।

গ) আনুগত্যের মাধ্যমে। আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তনকারীদের প্রতি জেনেশুনে আনুগত্য করা।

সবগুলো প্রকার বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি উল্লেখ করেছি একাল-সেকালের গণ্যমান্য মুফাসসির ও ইমামগণের মতামত।

৪। কখন ছোট কুফর (কুফরে আসগার) হবে : আল্লাহর আইন-বিরোধী শাসন-বিচার কখন ছোট কুফর, তা এই অংশের আলোচ্য। ঠিক কোন প্রসঙ্গে আলিমগণ এ মতটি দিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫। এটি আগের অংশের উপসংহার বলা চলে। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় 'কুফর দুনা কুফর' (ছোট কুফর) এর কথা বলেছেন। এটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় : আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারীদের ব্যাপারে আলিমগণের মতামত

আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারীদের ব্যাপারে আলিম ও ইমামগণের কী অবস্থান, তা এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে :

১। সাহাবিদের সময়ে যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের ফিতনা এবং তাদের ব্যাপারে সাহাবিগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) রায়।

২। তাতারদের সংবিধান ইয়াসিক এবং এর বিরুদ্ধে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাসীর (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের অবস্থান। ইয়াসিক ও তার উৎস এবং মুসলিম হওয়ার পরও ইয়াসিকের প্রতি তাতারদের আনুগত্যের স্বরূপ এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩। আরও কিছু সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

পঞ্চম অধ্যায় : ভ্রান্ত যুক্তিতর্ক ও এর জবাব

বিভিন্ন ভ্রান্ত যুক্তিতর্ক ও সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মতানুসারী ব্যক্তিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান যুক্তিতর্কগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায় : আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

এটি পুরো গ্রন্থের উপসংহার। অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে উল্লেখ করেছি আমি। যেমন

১। শার'ঈ ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য।

২। কোনো ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণার পদ্ধতি, সালাফগণ কী পদ্ধতিতে তাকফীর করতেন।

পুরো গ্রন্থ জুড়ে বিভিন্ন দলিল ও আলিমদের উক্তিগুলো হুবহু ও আক্ষরিকভাবে উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও কিছু উদ্ধৃতি বেশ বড়, তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও ভাবগাম্ভীর্য অনুসারে আমি মনে করেছি, এটাই এই গবেষণাপত্রের সাথে মানানসই। এজন্য শরীয়াহর দলিলের সাথে শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ইমামদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে বলতে চাই, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, আলোচনা করেছি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হুকুম এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি। বাস্তব জীবনে এই গ্রন্থের প্রয়োগ কীভাবে হবে সেটা নির্ভর করবে 'প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ' ও 'বাধা নিরসন' এর ওপর। বইটির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর শরীয়াহ থেকে বিমুখ হওয়ার এবং মিথ্যে আইনকানুন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার ভয়াবহতা প্রমাণ করা।

আমি তো শুধু যথাসাধ্য চেষ্টাই করতে পারি। যদি সফল হয়ে থাকি, তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে। আর ভুল করে থাকলে সবটুকু দায় আমার ও শয়তানের।

আল্লাহ যেন আমাদের কাছে সত্যকে সত্য হিসেবেই প্রতিভাত করেন এবং তার অনুসরণের সামর্থ্য দেন। আর মিথ্যেকে যেন মিথ্যে হিসেবেই চিনিয়ে দেন এবং তা পরিহার করার সক্ষমতা দেন। আল্লাহর কাছে কথা-কাজে নিষ্ঠা রক্ষা এবং তাঁর সন্তোষজনক কাজ করার সামর্থ্য চাই।

আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের প্রতি।

ড. আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ

Scanned by CamScanner

প্রথম অধ্যায়

শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন এবং ইসলামী আকীদাহতে এর অবস্থান

শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন এবং আকীদাহর মাঝে সম্পর্ক গভীর। এ সম্পর্ক মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরপথে ব্যাখ্যা করে একে প্রমাণ করতে হয় না।

এ অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় দুটি।

১। বিষয়টির গুরুত্ব এবং যে মূলনীতিগুলোর ওপর তা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর আলোচনা। এ বিষয়ে আলিমগণের বিভিন্ন মন্তব্য আমরা দেখব। বিষয়টির গুরুত্ব জানতেন বলেই অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় তাঁরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।

২। আল্লাহর শরীয়াহ অনুসারে শাসনকে যারা শুধুই বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করে (ঈমানের সাথে একে সম্পর্কিত করে না), তাদের দাবি খণ্ডন। এ ধরনের লোকেরা বলে থাকে, এ বিষয়ে কোনো ধরনের বিচ্যুতিই কুফরের পর্যায়ে পৌঁছায় না; কেবল শরীয়াহকে সরাসরি অস্বীকার করা হলেই সেটাকে কুফর বলা যাবে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা যে আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত, তার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ আছে।

- কখনো এটি তাওহীদুল ইবাদাতের ভিত্তিতে আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত।
- কিছু ক্ষেত্রে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর ভিত্তিতে সম্পর্কিত।
- কখনো-বা তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের ভিত্তিতে আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত।
- কখনো সম্পর্কিত ঈমানের ভিত্তিতে।
- কখনো সম্পর্কিত ইসলামের ভিত্তিতে।
- কোনো কোনো সময় এ সম্পর্ক শাহাদাতাইনের (দুই সাক্ষ্যের) ভিত্তিতে।

যেসব আয়াতে এগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় বিপুল। অল্প কিছু উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করব।

Scanned by CamScanner

তাওহীদুল ইবাদাতের[৬] সাথে সম্পর্ক

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কারাগারে থাকাকালীন অন্যান্য বন্দীদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর কথাগুলো আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ধৃত করেন এভাবে,

> "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করো, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্ এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত কোরো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৪০]

আল্লাহ্ আরও বলেন,

> "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগূতকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।" [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৬]

> "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের এবং মারইয়ামের পুত্রকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র ইলাহের ইবাদাতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩১]

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর[৭] সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

> "নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" [সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৪]

> "আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন, তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরিক করে তিনি তা থেকে

---

[৬] তাওহীদুল ইবাদাত হলো, আল্লাহ-নির্দেশিত সকল ইবাদাতই একমাত্র আল্লাহর জন্যে করা। যেমন, দুআ, ভয়ভীতি, আশা, তাওয়াক্কুল, সালাত, যাকাত, হজ, কুরবানী, মানত ইত্যাদি ইবাদাত। এটাকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাতও বলা হয়। [সম্পাদক]

[৭] তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হলো, আল্লাহর কর্মে তাঁকে এক বলে জানা ও মানা। এ বিশ্বাস রাখা যে,

Scanned by CamScanner

ঊর্ধ্বে।" [সূরা আল-কাসাস, ২৮:৬৮]

অনুরূপ আরও বহু আয়াত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের[৮] সাথে সম্পর্ক

আল-আসমা ওয়াস-সিফাত হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য নামগুলো হলো আল হাকাম (الحكم), আল হা-কিম (الحاكم), এবং আল হাকী-ম (الحكيم)।

আল্লাহ বলেন,

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিচারক (হাকাম) মানবো, যখন তিনি সেই (সত্তা) যিনি তোমাদের নিকট কিতাব নাযিল করেছেন, যা বিশদভাবে বিবৃত। আমি যাদেরকে (পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে, তা সত্যতা সহকারে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই কিছুতেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হোয়ো না।" [সূরা আল-আনআম, ৬:১১৪]

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ...

"...এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০:১০]

... وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

"...আর তিনি উত্তম ফায়সালাকারী (খাইরুল হাকিমীন)।" [সূরা আল-আরাফ, ৭:৮৭]

সূরা ইউসুফের ৮০ নং আয়াতেও এসেছে 'খাইরুল হাকিমীন'।

আহকামুল হাকিমীন, এসেছে সূরা নূহের ৪৫ নং আয়াত এবং সূরা তীনের ৮ নং আয়াতে।

একমাত্র আল্লাহই সকল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা এবং পুরো সৃষ্টিজগতের পরিচালকও একমাত্র তিনিই। [সম্পাদক]

[৮] তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত হলো, কোনো ধরনের تحريف (তাহরিফ) বা বিকৃতিসাধন, تعطيل (তাতিল) বা নিষ্ক্রিয়করণ تكييف (তাকয়িফ) বা ধরন নির্ধারণ ও تمثيل (তামসিল) বা সাদৃশ্য প্রদান ব্যতীত কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তাআলার সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সুউচ্চ গুণাবলিসমূহ একমাত্র তাঁর জন্যে সাব্যস্ত করা। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

...وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"...আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" [সূরা আর-রাদ, ১৩:৪১]

... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

"হুকুম কেবল আল্লাহর। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।" [সূরা আল-আনআম, ৬:৫৭]

ঈমানের সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ্ বলেন,

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূল ﷺ -এর এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর দিকে প্রত্যর্পণ করাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের এবং রাসূল ﷺ -এর দিকে এসো, তখন তুমি ওই মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯-৬১]

"আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। যখন তারা নিজেদের ওপর যুলম করেছিল, তখন যদি তোমার নিকট চলে আসত আর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতো এবং রাসূলও তাদের পক্ষে ক্ষমা চাইত, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পেত।

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৪-৬৫]

Scanned by CamScanner

"মুমিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর দিকে ডাকা হয়, তখন মুমিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম।" [সূরা আন-নূর, ২৪:৫১]

ইসলামের সাথে সম্পর্ক

ইসলামের ভিত্তিই হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। শিরক থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর আদেশ মানার নামই ইসলাম।

আল্লাহ বলেন,

"যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল এবং সে সৎকর্মশীলও, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার?" [সূরা আন-নিসা, ৪:১২৫]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে—শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত—যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর খুব দৃষ্টি রাখছেন।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯-২০]

"যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।" [সূরা লুকমান, ৩১:২২]

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৮৫]

"আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।" [সূরা আন-নাহল, ১৬:৮৯]

Scanned by CamScanner

শাহাদাতাইনের সাথে সম্পর্ক

ঈমানের সাক্ষ্য বা শাহাদাতের দুটি অংশ। তাই একে দ্বিবচনে বলা হয় শাহাদাতাইন। প্রথম অংশ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র সাথে সম্পর্ক আগেই তাওহীদুল ইবাদাহ অংশে আলোচনা করে এসেছি। এখন পরের অংশ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"র সাথে সম্পর্ক আলোচিত হবে।

আল্লাহ্ বলেন,

> "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে...।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]
>
> "রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও...।" [সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭]
>
> "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ্ ও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য প্রকাশ করো। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১-৩২]

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করা এবং তাঁর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফর এবং শিরক হবার প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেন,

> "...তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার করেন না।" [সূরা আল-কাহফ, ১৮:২৬]
>
> "...যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" [সূরা আল-আনআম, ৬:১২১]
>
> "তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? কে আছে বিশ্বাসীদের জন্যে বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম"? [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫০]

এখানে উদাহরণস্বরূপ অল্প ক'টি আয়াত পেশ করা হলো মাত্র। অনুরূপ আরও বিপুল সংখ্যক আয়াত রয়েছে। আল্লাহর আইন-বিধান মেনে চলার বিষয়টি যে বিভিন্ন দিক থেকে আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত, তা বারবার এ আয়াতসমূহে প্রমাণিত হয়েছে।

আলিমগণের মন্তব্য

এবার আলিমগণের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাক। প্রতিটি উদ্ধৃতিরই মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে শাসন-বিচার করা বা না করার বিষয়টি আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত।

Scanned by CamScanner

১। বিখ্যাত হাদীসে জিবরীলের একটি অংশে রাসূল ﷺ ঈমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন[৯]। এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযি বলেন,

> "এ হাদীসে 'ঈমান অর্থ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করা', কথাটির অর্থ হলো অন্তরে ও মুখে আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) স্বীকার করা। তাঁর প্রতি ও তাঁর আদেশমালার প্রতি আত্মসমর্পণ করা। তাঁর আদেশ মেনে চলার সংকল্প করার পাশাপাশি অবহেলা, অহংকার ও অবাধ্যতা পরিহার করা। তাহলেই বলা যাবে যে, আপনি আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের অনুসরণ করছেন ও তাঁর ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় পরিহার করছেন।"

কিছু পরে গিয়ে বলেন,

> "তারপর 'ওয়া রুসুলিহি' (এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি), কথাটির অর্থ আল্লাহর সকল রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি ঈমান আনা। তিনি যেসকল রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের প্রতি... এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। অন্যান্য রাসূলকে বিশ্বাস করার চেয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্বাস করার ধরনটা একটু ভিন্ন।
>
> অন্যান্য রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ তাঁদেরকে রাসূল বলে স্বীকার করা। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি তাঁর আনীত শরীয়াহর অনুসরণ করতে হবে। যদি তাঁর আনীত বিষয় মেনে চলেন, ফরয দায়িত্বগুলো পালন করেন, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মেনে নেন, অস্পষ্ট বিষয় থেকে দূরে থাকেন, ভালো কাজে ত্বরা করেন; তাহলেই বলা যাবে আপনি তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন।"[১০]

আল্লাহ ও তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসকে শাইখ আল-মারওয়াযি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, লক্ষ করুন। অন্তরের ও মৌখিক বিশ্বাসের পাশাপাশি তিনি বাস্তবে আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণের শর্তও যোগ করেছেন। অন্যান্য রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্বাস করার পার্থক্যটাও ঠিক এ জায়গাতেই। অন্যদের শুধু বিশ্বাস করতে হয়। আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুসরণও করতে হয়। শুধু বিশ্বাস করা এখানে যথেষ্ট নয়।

---

[৯] হাদীসে জিবরীলের যে অংশে রাসূল ﷺ ঈমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো, 'তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান আনবে এবং পুরো তাকদীরের ওপরও ঈমানে আনবে।' (সহিহু মুসলিম, হাদীস নং, ৭) [সম্পাদক]

[১০] তা'যীম কাদরুস সালাহ, ১/৩৯২-৩৯৩।

Scanned by CamScanner

২। কার আনুগত্য বাধ্যতামূলক, কার আনুগত্য বৈধ, এবং কারটা অবৈধ, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে আল-ইয ইবনু আব্দিস সালাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"আনুগত্য করতে হবে শুধুই আল্লাহর। কারণ সৃষ্টি করা, জীবিকা প্রদান, এবং ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শনের মতো অনুগ্রহ একমাত্র তিনিই দান করেন। যা কিছু কল্যাণকর তিনিই দান করেন, যা কিছু অকল্যাণকর তিনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এসব অনুগ্রহ দিতে সক্ষম নয়। তাই কোনো ব্যক্তি আনুগত্যের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর প্রাধান্য পাবার যোগ্য না।

ঠিক একই কারণে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শাসন ও বিচার করার অধিকার রাখে না। তাঁর বিধানাবলি চয়িত হয় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে, ইজমা[১১], কিয়াস[১২] এবং ইস্তিমবাতের[১৩] অন্যান্য পদ্ধতি থেকে। তাই ইসতিহসান[১৪] বা আল-মাসালিহ আল-মুরসালা[১৫] পদ্ধতি ব্যবহারের অধিকার কারও নেই।"[১৬]

ইবনু আব্দিস সালাম এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর ভিত্তিতে। সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী যেহেতু আল্লাহই, সেহেতু আদেশ করার অধিকারও একমাত্র তাঁর।

"...জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর..." [সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৪]

---

[১১] ইজমা এর শাব্দিক অর্থ, দৃঢ় সংকল্প করা, একমত হওয়া। পরিভাষায় ইজমা বলা হয়, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশার পর শার'ঈ কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে উম্মাহর মুজতাহিদগণ একমত হওয়া। [সম্পাদক]

[১২] কিয়াসের শাব্দিক অর্থ হলো, অনুমান করা, সমান করা। পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে মূল দলিলের সাথে শাখাগত দলিলকে উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী ইল্লত (হুকুমের কারণ) থাকার কারণে সমান করা। [সম্পাদক]

[১৩] ইস্তিম্বাতের শাব্দিক অর্থ হলো, বেরকরণ, উদ্ভাবন, উদ্ঘাটন। পরিভাষায় ইস্তিম্বাত বলা হয়, শার'ঈ নস (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে বিধিবিধান উদ্ঘাটন করা। [সম্পাদক]

[১৪] ইস্তিহসানের শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে ভালো মনে করা। পরিভাষায় ইস্তিহসান বলা হয়, সূক্ষ্ম দলিলের ভিত্তিতে কিয়াসে খাফি (অস্পষ্ট কিয়াস) কে কিয়াসে জালি (সুস্পষ্ট কিয়াস)-এর ওপর প্রাধান্য দেয়া কিংবা দলিলের ভিত্তিতে কোনো ব্যাপক হুকুম থেকে শাখাগত কোনো হুকুমকে পৃথক করা । [সম্পাদক]

[১৫] আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ বলা হয়, মুজতাহিদ কোনো একটি বিষয়ে মনে করে যে এ কাজের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জিত হবে এবং এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে শরিয়াহ কোনো আদেশ বা নিষেধও দেয়নি। [সম্পাদক]

[১৬] কাওয়ায়িদুল আহকাম, ২/১৫৮। উল্লেখ্য, আল-ইয ইবনু আব্দিস সালাম এখানে মাসলাহার বিষয়টিকে ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন না। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে মাসলাহা প্রযোজ্য, সে কথা

Scanned by CamScanner

৩। *"যে তার চেহারাকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে, এবং পাশাপাশি সে সত্যনিষ্ঠ... (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১১২)"*, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> "'চেহারাকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ' করার অর্থ নিজেকে বিনীতভাবে তাঁর আনুগত্যে সঁপে দেয়া। তাঁর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম শব্দটির মূল অর্থ সমর্পণ (ইসতিসলাম)। ইসলামে প্রবেশ করার মাধ্যমে আপনি আল্লাহর সামনে বিনীত হন ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মুসলিমকে 'মুসলিম' বলে ডাকার কারণই এটা যে, নিজের সকল ইন্দ্রিয় ও সক্ষমতাকে সে তার প্রতিপালকের আনুগত্যে সমর্পিত করে দেয়।"[১৭]

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন..." (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১২৮) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন,

> "এখানেও আল্লাহ আমাদের ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম) সম্পর্কে জানাচ্ছেন। বাইতুল্লাহর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় তাঁরা দুজন এ আয়াতে উল্লেখিত দুআটি করেছেন। 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন' এর ভাবার্থ, 'আমাদেরকে আপনার আদেশের প্রতি সমর্পিত এবং আপনার আনুগত্যে বিনীত করে দিন। আমরা যেন আপনার ইবাদাতে আর কাউকে অংশীদার না বানাই।' আগেও উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম অর্থ আল্লাহর সবিনয় আনুগত্য।"[১৮]

ইমাম আত-তাবারীর ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এক আল্লাহর উপাসনা ও বিনীত আনুগত্য করা ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। শাইখুল ইসলামও (ইবনু তাইমিয়্যাহ) এ কথাটি বারবার উল্লেখ করেছেন। কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সকল রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর ধর্ম ইসলাম। পূর্ব ও পরবর্তী কোনো প্রজন্ম এ ছাড়া আর যে দ্বীনেরই অনুসরণ করুক, সেগুলো আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত। এ আয়াতগুলো উল্লেখ করে আত-তাদমুরিয়্যাহ গ্রন্থে ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> "ইসলামের দাবি এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ (ইসতিসলাম)। মহান আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারও বা কিছুর প্রতি যে নিজেকে সমর্পণ করে, সে মুশরিক। আর যে তাঁর প্রতি মোটেও আত্মসমর্পণ করে না, সে উদ্ধত, অহংকারী। মুশরিক ও অহংকারী উভয়ই কাফির। এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করার দাবি হলো

তিনি উল্লিখিত বইটি ছাড়াও স্বরচিত অন্যান্য বইতেও লিখেছেন।

[১৭] তাফসীরুত তাবারি, ২/৫১০, মাহমুদ শাকির-সম্পাদিত সংস্করণ।

[১৮] প্রাগুক্ত, ৩/৭৩-৭৪, মাহমুদ শাকির-সম্পাদিত সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

উপাসনা ও আনুগত্যও করতে হবে শুধু তাঁরই। এটাই দ্বীন ইসলাম। এ ছাড়া আর কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করার মাধ্যমে এবং যে ক্ষেত্রে যে আদেশ তিনি করেছেন, সে ক্ষেত্রে সেটা পালন করার মাধ্যমেই অর্জিত হয় প্রকৃত আত্মসমর্পণ...।"[১৯]

তাহলে বোঝা গেল যে, ইবাদাত ও আনুগত্য ইসলামেরই দাবি।

ইমাম আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) 'দ্বীন' শব্দের অর্থ করেছেন সবিনয় আনুগত্য। *'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।...' (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,

"এটিই হলো ইসলাম। এর অর্থ আত্মসমর্পণ ও বিনীত হওয়া। শব্দটি থেকে উৎপন্ন ক্রিয়াপদ আসলামা (أسلم)। ইসলামে প্রবেশের কাজটিকে আসলামা বলা হয়। অনুরূপভাবে, যখন কোনো জনপদ দুর্ভিক্ষে পতিত হয় তখন যেমন বলা হয় 'আক্হাতাল-কাওম'। অর্থাৎ, জনপদটি (আল-কাওম) দুর্ভিক্ষকালে (কাহ্ত) প্রবেশ করেছে। একইভাবে বলা হয় 'আরবায়া' অর্থাৎ 'বসন্তকালে (আর-রাবী) প্রবেশ করেছে'।

অনুরূপ, যখন কেউ ইসলামে প্রবেশ করে তখন বলা হয় 'আসলামা'। যার অর্থ নির্দ্বিধায় বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করা।

কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াত তথা 'আল্লাহর কাছে দ্বীন শুধুই ইসলাম' এর ব্যাখ্যা হলো, আনুগত্যের অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং মুখে ও অন্তরে তাঁর প্রতি পূর্ণ দাসত্ব (উবুদিয়্যাহ), অধীনতা ও সমর্পণের স্বীকৃতি। কোনো অহংকার বা বিচ্যুতি ছাড়াই তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মানা, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, এবং দাসত্ব বা ইবাদাতে তাঁর সাথে কোনো সৃষ্টিকে শরিক না করার দ্বারা যা প্রকাশিত হয়।"

ইমাম আত-তাবারীকে বলা হয় শাইখুল মুফাসসিরীন। কুরআনের তাফসীর, আরবি ভাষার জ্ঞান এবং বিভিন্ন কিরাআতের প্রাজ্ঞতম শাস্ত্রবিদ। তাই এ ব্যাপারে আমরা তাঁর মত উল্লেখ করছি।

"হে মুমিনগণ, ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো..." (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২০৮), এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আত-তাবারী কী বলেছেন, দেখা যাক। প্রথমে এ আয়াতের বিভিন্ন কিরাআত (আয়াতটি পড়ার বিভিন্ন পদ্ধতি) ও আলিমদের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন,

---

[১৯] আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১৬৯, সাওয়ি-সম্পাদিত সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

"প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ যখন মুমিনদের বলছেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এবং তাঁর আনা ইসলামের অনুসরণ করতে—তখন এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার সকল বিধান মেনে চলা এবং প্রয়োগ করা। কিছু পালন করা, আবার কিছু অবহেলা করা—এ রকম হতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে 'কাফফাতান' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'পরিপূর্ণভাবে'। এটি আস-সিলম (ইসলাম) শব্দের বিশেষণ হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ, তোমরা যারা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর আনীত বিধানে বিশ্বাস করেছ, পরিপূর্ণভাবে আমলে প্রবেশ করো এবং এর কোনো অংশকে অবহেলা কোরো না।"[২০]

এরপর তিনি ইকরিমাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে এ আয়াত সংক্রান্ত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আত-তাবারী বলেন,

"ওপরে উল্লেখিত বক্তব্যের অনুরূপ কথা বলেছেন ইকরিমাহ। অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের প্রতি এখানে যে আহ্বান করা হচ্ছে তার অর্থ হলো ইসলামের সকল বিধান পালন করা। কোনো অংশকে অবহেলা করা যাবে না। এবং যা কিছু ইসলামের বিধান না এমন সবকিছু প্রত্যাখ্যান করা।"[২১]

তারপর এ আয়াতের ব্যাপারে তিনি দ্বিতীয় একটি মত উল্লেখ করেছেন। তা হলো, এখানে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান) সম্প্রদায়কে ইসলামে প্রবেশ করতে বলা হচ্ছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, ইসলামে প্রবেশ করে এর সকল বিধান পালন করার অর্থটি বেশি গ্রহণযোগ্য। আর আয়াতটির প্রযোজ্যতা ব্যাপক। তাই আদেশটি মুসলিম ও আহলে কিতাব, উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য।[২২]

৪। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, সব ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টির সাথে আল্লাহর গুণাবলির সম্পর্কও স্পষ্ট। আল্লাহর নামসমূহের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-খাত্তাবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আল-হাকাম: আল-হাকাম (বিচারক) মানে আল-হাকিম। এর অর্থ এমন সত্তা, যিনি সকল বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাবান; যার কাছে সবকিছুরই বিচার চাওয়া হয়। যেমন এ আয়াতসমূহে আছে :

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"...আল-হুকম (বিধান, সিদ্ধান্ত) তাঁরই, আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত

---

[২০] তাফসীরুত তাবারি, ৪/২৫৫, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

[২১] প্রাগুক্ত, ৪/২৫৬।

[২২] প্রাগুক্ত, ৪/২৫৮। "...আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না..." [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২০৮], এই আয়াতের তাফসীরও প্রাসঙ্গিকভাবে দ্রষ্টব্য।

Scanned by CamScanner

হবে।" [সূরা আল-কাসাস, ২৮:৮৮]

... أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"আপনার বান্দারা যে ব্যাপারে মতভেদ করে, তা আপনিই ফায়সালা করবেন (তাহকুমু)।" [সূরা আয-যুমার, ৩৯:৪৬]

হাকাম শব্দটি এ আয়াতেও আছে,

... أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

"আমি বুঝি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বিচারকের (হাকামান) শরণাপন্ন হব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন বিস্তারিত কিতাব...।" [সূরা আল-আনআম, ৬:১১৪]

আল-হাকিম শব্দটিও কয়েক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু বহুবচনে ও চূড়ান্ত রূপে। যেমন:

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

"...তিনি সর্বোত্তম বিচারক (খাইরুল হাকিমীন)।" [সূরা আল-আরাফ, ৭:৮৭; সূরা ইউসুফ, ১২:৮০]

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

"...সব বিচারকের সেরা (আহকামুল হাকিমীন)।" [সূরা হূদ, ১১:৪৫], "শ্রেষ্ঠতম বিচারক... (আহকামুল হাকিমীন)?" [সূরা আত-তীন, ৯৫:৮]

আল-হাকীম নাম এবং এই নাম থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শব্দও অনেক আয়াতে এসেছে। যেমন: হাকামা, ইয়াহকুমু, তাহকুমু, হুকমুহু, হুকমান ইত্যাদি।"[২৩]

আল্লাহর আইন মানার সাথে আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির সম্পর্ক নিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"আল্লাহ হলেন বিচারক (আল-হাকাম), যিনি বান্দাদের মাঝে বিচার করেন। সিদ্ধান্ত (আল-হুকম) তাঁর একার অধিকার। মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনে ও বিচারের জন্য তিনি নাযিল করেছেন কিতাব, পাঠিয়েছেন রাসূল। যে রাসূল ﷺ -এর

[২৩] ভাই মুহাম্মাদ আল-হামাদ আল-হামুদও আল্লাহর নামের ব্যাখ্যা ও অর্থের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। সেখানে আল-হাকাম, আল-হাকিম, এবং আল-হাকীম নামগুলোর ব্যাপারেও দীর্ঘ আলাপ করেছেন তিনি। এর একাংশ উদ্ধৃত করা হলো :
ক) ইবাদাতে যেমন আল্লাহর কোনো শরিক নেই, বিধান বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি তেমনই অদ্বিতীয়। আল্লাহ বলেন, "...তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার করেন না।" [সূরা আল-কাহফ,

Scanned by CamScanner

অনুসরণ করল সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বন্ধুদের (আউলিয়া) অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানে তারা শান্তিতে থাকবে। আর রাসূল ﷺ -এর অবাধ্যতাকারীর জন্য আযাব অবধারিত।

আল্লাহ বলেন,

"মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেন সত্যভাবে, মানুষদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য, যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছিল। এতৎসত্ত্বেও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পারস্পরিক জিদের কারণেই তারা মতভেদ সৃষ্টি করল।..." [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১৩]

মানুষের মতভেদগুলো সমাধা ও তাদের মধ্যে বিচারের জন্যই যে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন ও কিতাব অবতীর্ণ করেছে। এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ, আমার পালনকর্তা, আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।" [সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০]

নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

"হে কারাগারের সঙ্গীরা, পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করো, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত কোরো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৩৯-৪০]

১৮:২৬]

খ) আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমতো শাসন ও বিচার করেন। কারণ, এ ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য, অংশীবিহীন।

গ) আল্লাহর বাণী প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। সর্বোত্তম বিচারকের কথা এমনই হয়ে থাকে।

ঘ) ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করার দাবি হলো নিজেদের মধ্যকার বিচার-ফায়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করা। কারণ, কুরআন ছাড়া আর কোনো উৎসই জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ আধার নয়।

ঙ) আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেছেন তাঁর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতে। নিজস্ব মতামত ও কামনা-বাসনার অনুসরণ নিষিদ্ধ করেছেন তিনি।

দেখুন: আন-নাহজুল আসমা ফি শারহি আসমায়িল্লাহিল হুসনা, মুহাম্মাদ ইবনু হামাদ আল-হামুদ, ১/৩০২-৩০৮।

Scanned by CamScanner

বিধান কেবল আল্লাহর। রাসূলগণ তা তাঁর পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের বিচার আল্লাহরই বিচার, তাঁদের আদেশই আল্লাহর আদেশ। তাঁদের আনুগত্য করা মানেই আল্লাহর আনুগত্য করা। রাসূল যা আদেশ দিয়েছেন, বা দ্বীনে আবশ্যক করেছেন সেগুলো মান্য করা এবং এগুলোতে রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করা সকল মানুষের ওপর ফরয। কারণ, এগুলোই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর আদেশ।"[২৪]

অন্যত্র শাইখুল ইসলাম কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটির প্রসঙ্গের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এ ব্যাপারে একটি মূলনীতিও সংজ্ঞায়িত করেন তিনি। সেখানে ব্যাখ্যা করে দেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর আনীত সকল কিছুতে বিশ্বাস করা ফরয। কিছু রাসূলকে অবিশ্বাস করা মানেই যেমন সকল রাসূলকে অস্বীকার করা, তেমনি রাসূল ﷺ -এর আনীত বার্তার কিছু অংশকে অবিশ্বাস করা মানে পুরো বার্তাকেই প্রত্যাখ্যান করা, তথা কুফরি করা। এ কথার দলিল উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম বলেন,

"আল্লাহ আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে তিরস্কার করেছেন, কারণ তাদেরকে আসমানি কিতাব দেয়া হলেও কিন্তু তারা সেই বার্তার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করে বসেছে। কিতাবে বিশ্বাসীদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে পথভ্রষ্টদের। একইভাবে (মুসলিম উম্মাহর মাঝেও) অনেকে মুমিনদের চেয়ে সাবিয়ি দার্শনিকদের প্রাধান্য দিয়েছে। তুর্কি, দাইলামি, আরব, পারস্যসহ বিভিন্ন জাতির জাহিলি অবস্থাকে আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও তাঁর নবীর ওপর ঈমান আনা মুমিনদের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে।

যারা সকল আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করার দাবি করে কিন্তু বিচার-ফায়সালা করার সময় কুরআন-সুন্নাহর দ্বারস্থ হয়নি এবং আল্লাহর পরিবর্তে বাতিল আইনপ্রণেতাদের সমীহ করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরও নিন্দা করেছেন।

একইভাবে আজ এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা মুসলিম হবার দাবি করলেও বিচারের জন্য সাবিয়ি, দার্শনিক ও অন্যান্যদের মত অনুসরণ করে। অথবা ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়া রাজা-বাদশাহদের বিধান মানে। যেমন : তাতার রাজাদের। যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর দিকে এসো।' তখন তারা একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[২৫]

সিদ্ধান্ত (হুকুম) প্রদানের অধিকার যেহেতু শুধুই আল্লাহর, তাই কোনো পার্থক্য করা ছাড়া রাসূল ﷺ -এর আনীত প্রতিটি বিধান মান্য করা আবশ্যক। বিচার-ফায়সালার জন্য আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য যেকোনো কিছুর শরণাপন্ন হওয়া মানেই মিথ্যা

---

[২৪] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩৫/৩৬১-৩৬৩; আরও দেখুন : পৃ. ৩৭২, ৩৮৩।

[২৫] মাজমুউল ফাতাওয়া, ১২/৩৩৯-৩৪০।

Scanned by CamScanner

আইনের (তাগূত) দ্বারস্থ হওয়া। তা সেটা সে যুগের সাবিয়ি-দার্শনিকদের আইন হোক, বা এ যুগের অনুরূপ কিছু। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হলে মিথ্যে আইনের প্রতি অবিশ্বাস করতে হবেই।

৫। আল্লাহর আইন মানার বিষয়টি "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সাক্ষ্যের সাথেও সম্পর্কিত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়ার দাবি হলো তাঁর সকল কথা বিশ্বাস করা ও তাঁর সকল আদেশ মান্য করা। তিনি যার অনুমোদন দিয়েছেন, তা বৈধ ধরতে হবে; তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাঁর নিজের যেসব নাম ও গুণ উল্লেখ করেছেন, সেগুলোও বিশ্বাস করতে হবে। সৃষ্টির সাথে নিজের সব ধরনের সামঞ্জস্য যেমন তিনি অস্বীকার করেছেন, তেমনি আমাদেরও তা অস্বীকার করতে হবে। পরিহার করতে হবে তাতীল (আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার) এবং তামসীল (আল্লাহর প্রতি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরোপ)।
>
> তাঁর আসমা ও সিফাত সত্যায়নের সময় সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্যকে অস্বীকার করতে হবে। আবার সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্য অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে বসা যাবে না। যা তিনি আদেশ করেছেন পালন করতে হবে। তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন, পরিহার করতে হবে। তিনি যা কিছুর অনুমোদন দিয়েছেন, তা হালাল; যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু নিষেধ করে গেছেন, এর বাইরে আর কোনো হারাম নেই।
>
> আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা আদেশ করে গেছেন, তার বাইরে কোনো দ্বীন নেই। তাই সূরা আল-আনআম, সূরা আল-আরাফ সহ কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের একটি বিশেষ দোষে অভিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি, এমন বেশ কিছু বিষয়কে তারা নিষিদ্ধ ভাবত। এভাবে তারা এমন এক দ্বীন আবিষ্কার করে নিয়েছে, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ পাঠাননি। আল্লাহ বলেন,
>
> *"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে আর তারা তাদের ধারণামতো বলে, এ অংশ আল্লাহর জন্য, আর এ অংশ আমাদের দেবদেবীদের জন্য।..." [সূরা আল-আনআম, ১৩৬]*
>
> *"নাকি তাদের এমন শরিক আছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীনের বিধি-বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?..." [সূরা আশ-শূরা, ৪২: ২১]*
>
> আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন,

Scanned by CamScanner

"...আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই। সেই সাথে আল্লাহরই অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও এক জ্যোতির্ময় প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪৫-৪৬]

আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, তিনি নবীকে প্রেরণ করেছেন তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্যের দিকে যে দাওয়াত দেয় সে শিরক করল। আর যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করল সে বিদআহ করল। শিরক নিজে যেমন একটি বিদআহ, তেমনি অন্য প্রতিটি বিদআহ শেষমেশ গিয়ে শিরকে পর্যবসিত হয়। বিদআতি মাত্রই কোনো না কোনো প্রকারের শিরকের অপরাধী[২৬]। আল্লাহ বলেন,

"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে এবং মারইয়ামের পুত্রকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে; অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদাতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো (হক, সত্য) মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩১]

এই পুরোহিত-সন্ন্যাসীরা আল্লাহর নিষেধকৃত অনেক বিষয়কে তাদের অনুসারীদের জন্য বৈধ করত, আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তার অনেক বিষয়কে তারা নিষিদ্ধ করত। আর ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এ ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করত। এইভাবে তারা শিরক করেছিল।"[২৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর এই দীর্ঘ ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, আকীদাহর বিষয়গুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। যেমন কালেমা শাহাদাতের উভয় অংশ একে অপরের পরিপূরক। ঠিক যেন ঈমান এবং ইসলাম। একই প্রসঙ্গে দুটিকে একত্রে উল্লেখ করলে প্রতিটির আলাদা আলাদা অর্থ থাকে। কিন্তু আলাদা করে উল্লেখ করলে উভয়ই একে অপরের অর্থ বহন করে। শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা মানে

---

[২৬] বিদআত হলো, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা। দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করার অনুমতি আল্লাহ কাউকে দেননি। সুতরাং যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং দ্বীনের নামে চালিয়ে দেয় সে বিদআতী। দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। তবে শিরক সব সময় শিরকে আকবার (বড় শিরক) হয় না। কিছু বিদআত আছে যেগুলোর কারণে শিরক আকবর সংঘটিত হয়। যেমন নেককার কবরবাসীর কাছে বা মাজারে গিয়ে পীর-আওলিয়ার কাছে সন্তান প্রার্থনা করা। আবার কিছু বিদআত আছে, যেসব বিদআতের কারণে শিরক আকবর হয় না, তবে অবশ্যই তা শিরকে আসগারের (ছোট শিরক) অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এসবই একেক প্রকারের শিরক। সুতরাং লেখকের কথা 'বিদআতী-মাত্রই কোনো-না-কোনো প্রকারের শিরকের অপরাধী' অর্থ হলো, বিদআতী ব্যক্তি হয়তো শিরকে আকবারের (বড় শিরক) অপরাধে অপরাধী অথবা শিরকে আসগরের (ছোট শিরক) অপরাধে অপরাধী। [সম্পাদক]

[২৭] ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ২/৮৩৪-৮৩৫।

Scanned by CamScanner

বক্তা মুহাম্মাদ ﷺ-কেও রাসূল বলে বিশ্বাস করে। যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্বীকৃতি দেয় না, তার কাছ থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি গ্রহণ করা হবে না। আবার 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা মানে বক্তা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকার করে। কিন্তু দুটি অংশ একত্রে উল্লেখ করলে প্রতিটির স্বতন্ত্র অর্থ দাঁড়ায়।

তাই ওপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতির মাত্র কয়েক বাক্য পরেই ইবনু তাইমিয়্যাহ এই বিষয়টির সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আত-তাদমুরিয়্যাহর উদ্ধৃতিটির অনুরূপ একটি মন্তব্য করে বলেন,

"ইসলাম শব্দটি দিয়ে আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও নিষ্ঠা বোঝানো হয়। আল্লাহ যেমনটি বলেছেন,

"আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের ওপর পরস্পর-বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" [সূরা আয-যুমার, ৩৯:২৯]

ইসলাম মানেই এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তিনি ছাড়া আর কারও কাছে সমর্পিত না হওয়া। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আমরা এটিই বুঝিয়ে থাকি। আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোনো সত্তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী মুশরিক। শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আর যে আল্লাহর কাছে মোটেও আত্মসমর্পণ করে না, সে অহংকারী। আল্লাহ বলেন,

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে ঢুকবে।" [সূরা আল-গাফির, ৪০:৬০]"[২৮]

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্যেও এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো ছাড়া রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস পূর্ণতা পায় না। এর মাঝে একটি হলো বিচার-ফায়সালা রাসূল ﷺ -এর কাছে সমর্পণ করা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ প্রায়ই এ কথাটি উল্লেখ করেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন,

"আল্লাহ বলেছেন,

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে

---

[২৮] ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ২/৮৩৬।

Scanned by CamScanner

মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]

আল্লাহ যদি কোনো শর্ত পূরণ না করার কারণে কারও ঈমানকে অস্বীকার করেন, তার অর্থ হলো সেই শর্তটি পূরণ করা ফরয। যে এই শর্ত পূরণ করবে না সে এই আয়াতের হুমকির অধীন। এবং সে ঈমানের ওই আবশ্যক স্তরে পৌঁছতে পারেনি যা থাকলে বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভ হয়।

আল্লাহর আদেশ পালনকারীদের প্রতি বিনা শাস্তিতে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। আর যারা কিছু আদেশ পালন করে, কিছু করে না, তাদের জন্য রয়েছে সতর্কবার্তা। ধর্মীয়-পার্থিব, মৌলিক-গৌণ যেকোনো বিষয়ের বিচার-ফায়সালার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা আছে। একবার তিনি ﷺ যে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবেন, মুমিনদের অন্তরে এর প্রতি কোনো দ্বিধা থাকতে পারবে না। পরিপূর্ণ সমর্পণের সাথে তা মেনে নিতে হবে।"[২৯]

নিচে আমরা এ আয়াতের তাফসীর আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। এখানে কালেমা শাহাদাতের সাথে আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন-বিচারের সম্পর্ক দেখানোটাই উদ্দেশ্য।

৬। এ বিষয়টি নিয়ে সুদীর্ঘ আলাপ করেছেন ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)। আমরা এখানে একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখব আলোচনাটি। প্রাসঙ্গিক দুটি হাদীস :

"সে-ই ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করেছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"[৩০]

এবং

"আযান শুনে যে বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই... আর আমি আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট..."[৩১]

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস দুটির ব্যাখ্যায় বলেন,

"এ দুটি হাদীস হলো কেন্দ্র, যার চারপাশে আবর্তিত হয় দ্বীনের সকল বিষয়। চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের স্বরূপ জানা যায় এ হাদীসদ্বয় থেকে। আল্লাহকে রব ও উপাস্য হিসেবে পেয়ে, রাসূলকে পেয়ে ও তাঁর অনুসরণ করে, দ্বীন ইসলাম পেয়ে এবং এর প্রতি সমর্পিত হয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে এখানে। এই চারটি বিষয়ের সমন্বয়কারী

---

[২৯] মাজমূউল ফাতাওয়া , (খণ্ড : ঈমান), ৩৭-৩৮।

[৩০] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার দলিল অধ্যায়, হাদীস নং ৩৪।

[৩১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাহ, মুআযযিনের কথার সাথে কথা মেলানো অধ্যায়, হাদীস নং ৩৮৬।

Scanned by CamScanner

সত্যিকার অর্থেই সিদ্দীক (প্রকৃত বিশ্বাসী)। মুখে বলা সহজ, কিন্তু সত্যিকারের পরীক্ষার সময় এগুলো বাস্তবায়ন করা কঠিনতম কাজগুলোর একটি...।"[৩২]

উভয় হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়ার পর তিনি বলেন,

"মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ পরিপূর্ণভাবে তাঁর অনুসরণ করা। এমনভাবে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, যেন নিজের চেয়েও রাসূল বেশি প্রিয় হন, তাঁর কাছ থেকেই শুধু পথনির্দেশ নেয়া হয়, তিনি ছাড়া আর কারও কাছে বিচার-ফায়সালার জন্য শরণাপন্ন না হওয়া হয়, তিনি ছাড়া অন্য কোনো কারও বিচার গ্রহণ না করা...।"[৩৩]

এরপর চতুর্থ বিষয়টির ব্যাখ্যায় ইবনুল কায়্যিম বলেন,

"এবার আসা যাক ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে। এর অর্থ হলো কথায়, বিচার-ফায়সালায়, আদেশ-নিষেধে ইসলামের বিধানাবলির প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা। অন্তরে এগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ থাকবে না। ইসলামের কিছু নিজের প্রবৃত্তি, নেতা, পীর-মাশায়েখ ও দলের কথার বিরুদ্ধে গেলেও পূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে তা গ্রহণ করা।"[৩৪]

ইবনুল কায়্যিমের এ কথাগুলো তাঁর কিতাবাদির অন্য অনেক স্থানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।[৩৫] নিচে এমন আরও উদাহরণ আমরা দেখব, ইন শা আল্লাহ।

৭। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন-বিচারের সাথে আকীদাহর সম্পর্ক এতই স্পষ্ট যে, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাবুত তাওহীদ-এ এ বিষয়টি *'তাওহীদ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের ব্যাখ্যা'* অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সেখানে এ আয়াতটি উল্লেখ করেন তিনি,

"তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে..." [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩১]

এখানেই তিনি ক্ষান্ত দেননি। বরং শুধু এ বিষয়টির জন্যই আলাদা একটি অধ্যায় রেখেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন *'হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করা আলিম ও শাসকদের আনুগত্যকারীরা আল্লাহর পাশাপাশি তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে'*। এ অধ্যায়ে তিনি সাহাবিদের কিছু বর্ণনা এবং আদি ইবনু হাতিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ঠিক পরের অধ্যায়ের শিরোনাম

---

[৩২] মাদারিজুস সালিকীন, ২/১৭২।

[৩৩] প্রাগুক্ত, ২/১৭২-১৭৩।

[৩৪] প্রাগুক্ত, ২/১৭৩।

[৩৫] মুখতাসারুস সাওয়ায়িক, ২/৩৫১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

Scanned by CamScanner

দিয়েছেন এ আয়াত অনুযায়ী,

> “তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়...।” [সূরা আন-নিসা, ৪:৬০]

অনুরূপ আরও আয়াত ও হাদীস তিনি অধ্যায়টিতে উল্লেখ করেছেন। অনেকেই কিতাবুত তাওহীদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। সকলেই এ দুটি অধ্যায়কে পরস্পর সম্পর্কিত হিসেবে দেখিয়েছেন। এ ছাড়া তাওহীদের সাথে শাহাদাতাইনের সম্পর্কও আলোচনা করেছেন তাঁরা। প্রথম অধ্যায়ের[৩৬] আলোচনায় শাইখ সুলাঈমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব যা লিখেছেন, তা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি এখানে :

> “আনুগত্য যেহেতু ইবাদাতের একটি প্রকার—যেহেতু তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) মুখ দিয়ে আল্লাহ যেসব আদেশ করিয়েছেন কেবল তাঁর অনুগত হয়ে সেগুলো পালন করার মাধ্যমেই ইবাদাত হয়—লেখক তাই আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার প্রতি এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কোনো সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্রভাবে মান্য করা যাবে না। সৃষ্টির আনুগত্য কেবল তখনই করা যাবে যখন তার আনুগত্য করা স্রষ্টার আনুগত্য করার অধীনস্থ হবে। এখানে আনুগত্যের অর্থ হিসাবে বিশেষভাবে বৈধ-অবৈধের বিধান মানার কথা এসেছে। হালাল-হারামের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির আনুগত্য যে করে, সে মুশরিক। আর রাসূল ﷺ নিজে থেকে কিছু বলেন না (আল্লাহর বিধানই বর্ণনা করেন)। এ কথাই এই আয়াতে বলেছেন আল্লাহ তা’আলা,
>
> *তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের (তাদের আলিমদের) রব হিসেবে গ্রহণ করেছে (আল্লাহর আদেশ ছাড়া নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বিভিন্ন বিষয়ে তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেছে। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এতে তাদের অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে) এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও (রব হিসেবে গ্রহণ করেছে)। অথচ তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে (তাওরাত ও ইনজিলে), তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ নেই (তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত পাবার অধিকার নেই)। পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু ঊর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তা থেকে।” [সূরা আত-*

---

[৩৬] “হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা আলিম ও শাসকদের...।” অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে।

Scanned by CamScanner

তাওবাহ, ৯:৩১]

পুরোহিত-সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করা বলতে এ আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে, নবী ﷺ তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করত, যা তিনি হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত। আর ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এ ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করত।"[৩৭]

এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় শাইখ সুলাঈমান বলেছেন,

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, এই সাক্ষ্যের অর্থই হলো তাওহীদ। আর এর অন্তর্ভুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনা। আর এ দুটি বিষয় নিয়েই গঠিত ঈমানের সাক্ষ্যদ্বয় তথা শাহাদাতাইন। নবী ﷺ এই দুটি জিনিসকে ইসলামের একটি রুকন হিসেবে একত্র করে উল্লেখ করেছেন যখন তিনি বলেছেন, 'ইসলাম প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি স্তম্ভের ওপর'।

এ অধ্যায়ে (লেখক) তাওহীদের প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতার ওপর আলোকপাত করেছেন। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হওয়াও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। এটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। মুমিন-মাত্রই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে।

একমাত্র উপাস্য হিসেবে যে আল্লাহকে মেনে নিয়েছে, আল্লাহর সকল বিধান মানা ও সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে সে বাধ্য। আর এই সব বিধান আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন তাঁর রাসূল ﷺ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েও বিচার-ফায়সালার জন্য যে রাসূল ছাড়া অন্য কারও দ্বারস্থ হয়, সে কালেমার সাক্ষ্যকে বাতিল করে দিয়েছে...।"[৩৮]

এই স্পষ্ট বিষয়ে তাই আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

৮। এ বিষয়টি নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন সমসাময়িক আলিমগণও। আপাতত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আলুশ শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) এবং শাইখ আব্দুল আযীয বিন বাযের মত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। পাঠকদের সুবিধার্থে অন্যান্য আলিমের নাম এ পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকায় উল্লেখ করে দেয়া হবে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীমের একটি গবেষণাপত্রের শিরোনাম "তাহকীমুল কাওয়ানীন (বিচারের জন্য মানবরচিত আইনের দ্বারস্থ হওয়া)"। এতে তিনি বলেন,

"সব দ্বন্দ্বে রাসূল ﷺ-কে যারা বিচারক হিসেবে মেনে নেয় না, আল্লাহ তাদের

---

[৩৭] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৫৪৩।

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫। তাঁর ব্যাখ্যার বাকি অংশও গুরুত্ব বিবেচনায় দ্রষ্টব্য।

Scanned by CamScanner

ঈমানহীন বলেছেন। আয়াতে শপথ এবং না-বোধক শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে বিষয়টি। আল্লাহ বলেন,

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]

আবার রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্তের প্রতি শুধু দ্বিধাহীন হলেই হবে না। পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট আর খুশিও থাকতে হবে। আবার এ দুটো শর্তেই শেষ নয়। এর সাথে যোগ করা হয়েছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের (তাসলীম) কথা। তাসলীম অর্থ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং যে বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব তার প্রতি অন্তরের সব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে নবী ﷺ-এর ফায়সালার কাছে আত্মসমপর্ণ করা। এটিই হলো প্রকৃত বিচারের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পণ।

ক্রিয়া-বিশেষ্য 'তাসলীম' ব্যবহার করে এ বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এর প্রতি থাকতে হবে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ..."[৩৯]

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায বলেছেন,

"এখানে উদ্দেশ্য হলো ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য সমর্পিত করা (তাওহীদ) আবশ্যক। অন্য কারও উপাসনা করা থেকে যেমন নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, তেমনি অন্য কারও উপাসকদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

শিরককে মিথ্যে বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। আর আল্লাহর শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করার মাধ্যমে তাওহীদের দায়িত্ব পূরণ করা মানুষ-জিন নির্বিশেষে আল্লাহর সকল বান্দার ওপর বাধ্যতামূলক। আল্লাহই বিচারক (আল হা-কিম)। এতে বিশ্বাস করা তাওহীদেরই অংশ, এ দুনিয়াতে তিনি বিচারক তাঁর শরীয়াহর মাধ্যমে, আর আখিরাতে তিনি নিজেই বিচারের রায় দেবেন। আল্লাহ বলেন,

"...বিধান (আল-হুকম) শুধুই আল্লাহর...।" [সূরা আল-আনআম, ৬:৫৭]

"...বিচার (আল-হুকম) শুধুই আল্লাহর অধিকারে, যিনি সুউচ্চ, সুমহান।" [সূরা আল-গাফির, ৪০:১২]

"যা নিয়েই মতভেদ করবে, তার সিদ্ধান্ত (আল-হুকম) আল্লাহর এখতিয়ারে...।" [সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০]"[৪০]

---

[৩৯] তাহকীমুল কাওয়ানীন, ৫-৬।
[৪০] মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি বায, ২/২০।

Scanned by CamScanner

অন্যত্র শাইখ বিন বায বলেছেন,

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্যটির তাৎপর্য অনেকেই ঠিকমতো বোঝে না। ফলে তারা আল্লাহর শরীয়াহ থেকে মুখ ফিরিয়ে শরণাপন্ন হয় মানব-রচিত আইনের। এর কারণ হয় অজ্ঞতা, নয়তো অবজ্ঞা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া মানেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে স্বীকার করার পাশাপাশি তাঁর কথা বিশ্বাস করা ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মানা। নবীজির আনীত শরীয়াহ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

"বলো, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১]

"...আর যা কিছু তিনি নিষেধ করেন, পরিহার করো...।" [সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭]

জিন ও মানব উভয় জাতির মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক হলো এক আল্লাহর উপাসনা করা। সেই সাথে সকল বিচার-আচার তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে হস্তান্তর করা। আল্লাহ বলেন,

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]"[৪১]

শাইখ বিন বায স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

"কালেমা শাহাদাতের বেশ কিছু ফলাফল রয়েছে। যেমন : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ দাসত্ব (উবূদিয়্যাহ), মিথ্যে উপাস্যের (তাগূত) উপাসনা পরিহার, এবং আল্লাহকেই একমাত্র বিচারক বলে মেনে নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রভু ও উপাস্য। তিনিই তাদের স্রষ্টা, তিনিই আদেশদাতা ও নিষেধকারী, জীবন ও মৃত্যুদাতা, হিসাবগ্রহীতা, পুরস্কারক ও শাস্তিদাতা। একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য। আল্লাহ বলেন,

"...জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর..." [সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৪]

আল্লাহ যেমন একমাত্র স্রষ্টা, ঠিক তেমনি আদেশদানের অধিকারীও একমাত্র

---

[৪১] প্রাগুক্ত, ২/৩৩৭।

Scanned by CamScanner

তিনিই। তাঁর আদেশ অবশ্য-পালনীয়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, ইহুদিরা তাদের পুরোহিতদের আল্লাহর পাশাপাশি রব হিসেবে মেনে নিয়েছে...”[৪২]

আর এভাবেই শরীয়াহ দিয়ে বিচার করার বিষয়টি তাওহীদ এবং শাহাদাতাইনের সাথে সম্পর্কিত। শাইখের আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এই হলো এ ব্যাপারে কয়েকজন প্রখ্যাত আলিমের বক্তব্যের সারমর্ম।[৪৩] বোঝা গেল যে, আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার বিষয়টি আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। এটি দ্বীনের একটি স্পষ্টতম বিষয়। এই বিষয়ের দাবি কী, তা নিয়েই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

অনেকের দাবি, আল্লাহর আইন দিয়ে বিচারের ব্যাপারে দীর্ঘ আলাপ করা হলো কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ ও শ্রম দেয়া। আজকাল নাকি নিছক রাজনৈতিক কারণে এসব আলোচনা বেশি হচ্ছে। বিপথগামী শাসক ও মুসলিম বিশ্বের পাশ্চাত্যায়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক ইসলামী দলই এ কথাটিকে স্লোগান বানিয়ে নিয়েছে, ইত্যাদি। এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্যই আকীদাহর সাথে এর সম্পর্ক দেখানো হলো। দলিল থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এটি দ্বীনের একটি মৌলিকতম বিষয়। ওপরে উদ্ধৃত আলিমদের আলোচনা থেকে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। আল্লাহই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী।[৪৪]

---

[৪২] উজুবু তাহকীমি শারয়িল্লাহ, পৃ. ৭, ৪র্থ সংস্করণ, দারুল ইফতা', ১৪০১ হিজরি।

[৪৩] সমসাময়িক আরও কয়েকজন আলিমের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যেমন শাইখ আহমাদ শাকির তাঁর উমদাতুত তাফসীর-এর টীকায় (৪/৪১৭) একে আকীদাহর অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। আরও দেখুন : হাওলা তাতবীকিশ শারীয়াহ, অধ্যাপক মুহাম্মাদ কুতব, পৃ. ৯-২৩; শারীয়াতুল কামাল তাশকু মিনাল ইহমাল, আব্দুল ওয়াহহাব রাশীদ সালিহ, পৃ. ২৫, ২৬; তাহকীমুশ শারীয়াহ ওয়াদ দাআওয়াল আলমানিয়্যাহ, ড. সালাহ আস-সাওয়ি, পৃ. ৩৫-৩৭, ৪২, ৪৩; আল-হাদ্দুল ফাসিল, আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক, পৃ. ৪২-৪৩; আশ-শরীয়াতুল ইসলামীয়্যাহ লাল-কাওয়ানীনুল ওয়াজয়িয়্যাহ, উমার আল-আশকার, পৃ. ১৬৫। এর বাইরেও আরও বহু উদাহরণ রয়েছে।

[৪৪] ইসলামী শরীয়াহ প্রয়োগের গুরুত্ব এবং মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে সতর্কতা নিয়ে অসংখ্য বই ও গবেষণাপত্র রয়েছে। আমার সামনে থাকা অল্প কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি :

১) তাহযীরু আহলিল ঈমান আনিল হুকমি বি গাইরি মা আনযালার-রাহমান, আল-আসআরদি, সালীম আল-হিলালি সম্পাদিত।

২) আল-ফাওয়াকিহুল ইযাব ফির রাদ্দি আলা মাল্লাম ইয়াহকুমিস সুন্নাহ ওয়াল-কিতাব, শাইখ হামাদ ইবনু নাসির ইবনি মুয়াম্মার, আব্দুস সালাম আল-বারজাস সম্পাদিত।

৩) আল-বুরহানু ওয়াদ-দালীল আলা কুফরি মান হাকামা বি গাইরিত -তানযিল, শাইখ আহমাদ ইবনু নাসির ইবনি গুনাইম, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হিজরি।

৪) আশ-শারীয়াহ লাল-কানুন, আহমাদ আব্দুল গাফূর আত্তার, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৪ হিজরি।

Scanned by CamScanner

৫) ইনহিসারু তাতবীকিশ শারীয়াহ ফি আকতারিল-উরূবাহ ওয়াল-ইসলাম, আহমাদ আব্দুল গাফূর আত্তার, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি, দারুল-আন্দালুস।
৬) উজুবু তাহকীমিশ শারীয়াতিল ইসলামীয়্যাহ, মান্না আল-কাত্তান, ১৪০৫ হিজরি সংস্করণ, ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৭) আসবাবুল হুকমি বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ ওয়া নাতায়িজুহু, ড. সালিহ আস-সাদলান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি, দারুল মুসলিম।
৮) আল-হুকমু বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ ওয়া আহলুল গুলু, মুহাম্মাদ সুরুর যাইনুল-আবিদীন, ২ খণ্ড, দারুল আরকাম সংস্করণ।
৯) উজুবু তাতবীকিশ শারীয়াহ, ড. মুহাম্মাদ আল-আমীন মুস্তাফা আশ-শানকীতি, ১৪১২ হিজরি সংস্করণ, মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল-হিকাম।
১০) ইন্নাল্লাহা হুয়াল-হাকাম, মুহাম্মাদ শাকির আশ-শারীফ, দারুল ওয়াতান সংস্করণ।
১১) আল-হুকমু বিল-কুরআন ওয়া কাজিয়্যাতু তাতবীকিশ শারীয়াহ, জামাল আল-বান্না, দারুল ফিকরিল ইসলামী।
১২) উজুবু তাতবীকিল হুদুদিশ শারয়িয়্যাহ, আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, কুয়েত।
১৩) আত-তালাযুমু বাইনাল-আকীদাতি ওয়াশ-শারীয়াহ, নাসির আল-আকল, দারুল ওয়াতান।
১৪) জুহুদুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি ইবরাহীম ফি মাসআলাতিল-হাকিমিয়্যাহ, আব্দুল আযীয আলু আব্দিল লাতীফ, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি।
১৫) ফি ওয়াজহিল মুআমারাহ আলা তাতবীকিশ শারীয়াতিল ইসলামীয়্যাহ, মুস্তাফা ফারগালি আশ-শুকাইরি, দারুল-ওয়াফা, ১৪০৭ হিজরি।
১৬) আশ-শারয়ু ওয়াল-লুগাহ, আহমাদ শাকির, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি., আলামুল কুতুব।
১৭) আল-কুরআন ফাওকাদ-দুস্তূর, আলি জুরাইশাহ, ১৪০৬ হিজরি, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ।
১৮) আল-হাকিমিয়্যাহ ফি তাফসীরি আজওয়ায়িল-বায়ান, আব্দুর রহমান আস-সুদাইস, দারু তীবাহ।
১৯) আবহাসুন ওয়া আহকাম, আহমাদ শাকির, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, কায়রো।
২০) সিয়াদাতুশ শারীয়াতিল ইসলামীয়্যাহ ফি মিসর, ড. তাওফীক আশ-শাওয়ি, আয-যাহরা লিল-ইলামিল আরাবি।
২১) হাত্তা লা তাজিল্লাশ শারিয়াহ নাস্সান শাকলিয়্যা, ড. আলি হাসানাইন আয-যাহরা।
২২) আল-হুকমু ওয়াত তাহাকুম ফি খিতাবিল ওয়াহয়ি, আবদুল আজিজ মুস্তফা, দারু তীবাহ।
২৩) নাজরিয়াতুস সিয়াদাহ ওয়া আসারুহা আলা শারয়িয়্যাতিল আনজিমাতিল ওয়াজয়িয়্যাহ, ড. সালাহ আস-সাওয়ি, দারু তিবাহ।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরীয়াহ-শাসনের বাধ্যবাধকতা : নুসুস থেকে প্রমাণ

শরীয়াহ দিয়ে শাসনের আবশ্যকতার ব্যাপারে এ অধ্যায়ে আনা বেশির ভাগ উদ্ধৃতি কুরআনের আয়াত। আর এ-সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে মূলত সেসকল আয়াতের শানে নুযুল বা তাফসীর এসেছে।

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ :

১। ওইসব আয়াত যেখানে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচারের আবশ্যকতা অথবা অন্য আইন অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে এসেছে। কুরআনে এ ব্যাপারে অনেক আয়াত এসেছে, তার মাঝে কয়েকটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সেগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটির ব্যাপারে মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা আনা হয়েছে।

২। ওইসব আয়াত যেখানে এই আবশ্যকতা-নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার পাশাপাশি এগুলো অমান্যকারীকে কুফর বা শিরকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু আলোচনা আসবে।

আর সূরা আল-মায়িদাহর ৪৪ নং আয়াত আলাদা অধ্যায়ে আলোচিত হবে। আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস। কার্য সমাধায় তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।

শরীয়াহ দিয়ে বিচারের সাধারণ আবশ্যকতা সংক্রান্ত আয়াত

১। আল্লাহ বলেছেন,

> "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে।..." [সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৬৫]

এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ أنداد (আনদাদ), যার একবচন ند (নিদ) (এখানে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে অনূদিত) সম্পর্কে ইমাম আত-তাবারী বলেছেন যে, এর অর্থ সমকক্ষ। আয়াতে উল্লেখিত অপরাধীরা কাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবত, সে ব্যাপারে দুটি মত তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

Scanned by CamScanner

একটি মত অনুযায়ী এখানে মনগড়া দেব-দেবীদের কথা বলা হচ্ছে। ইমাম আত-তাবারী বলেন,

"অন্য মতটি হলো নেতৃবৃন্দ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে যেসব নেতার আনুগত্য করা হতো, তাদের কথা বলা হচ্ছে এখানে। ...ইমাম আস-সুদ্দি বলেছেন, 'এরা হলো ওইসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুসারীরা তাদেরকে মান্য করে আল্লাহকে যেভাবে মান্য করা উচিত। তাদের আদেশ মানতে গিয়ে তারা আল্লাহকে অমান্য করে।"[৪৫]

"বলুন, 'আল্লাহকে ভালোবেসে থাকলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন, ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপ...।'" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১]

ভালোবাসা এবং আনুগত্যের ব্যাখ্যা এসেছে ইমাম আস-সুদ্দির তাফসীরে।

"যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করে বসবে..." (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৬৬), এই আয়াতের আলোচনায় আত-তাবারী বলেন,

"আগের আয়াতে (১৬৫ নং) উল্লেখিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বা 'সমকক্ষরাই' এ আয়াতে উল্লেখিত 'অনুসৃত'। শেষ বিচারের দিন নিজেদের অনুসারীদের সাথে এরা সম্পর্কচ্ছেদ করবে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আস-সুদ্দির ব্যাখ্যা সঠিক। তিনি বলেছেন যে, ওই আনদাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বীরা দেব-দেবী নয়; বরং নেতা গোছের মানুষ। এদের আদেশ মানতে গিয়ে লোকেরা আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে। অন্যদিকে বিশ্বাসীরা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে।

আরেকটি মত অনুযায়ী, এই (সূরা বাকারাহ, ২:১৬৬) আয়াতে অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী বলতে শয়তানকে বোঝানো হচ্ছে। এ মতটি সঠিক নয়। কারণ আয়াতে কেবল তাদের কথা বলা হচ্ছে যাদের আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রহণ করা হয় (শয়তানকে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রহণ করে না)।"[৪৬]

মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে ভালোবাসার স্বরূপের আলোচনায় ইবনুল কায়্যিম এ আয়াতটি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন,

"সৃষ্টি ও আদেশ, পুরস্কার ও শাস্তি, সবই ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত। এগুলো

---

[৪৫] তাফসীরুত তাবারি, ৩/২৮০, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।
[৪৬] তাফসীরুত তাবারি, ৩/২৮৮, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

ভালোবাসার স্বার্থেই করা হয়ে থাকে। আসমান-জমিনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এক ইলাহের প্রতি সমর্পিত হয়ে শুধু তাঁকেই ভালোবাসার রহস্যও এটিই। আর এটিই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের নিগূঢ় অর্থ।"

"এখানে আল্লাহ বলছেন, যে অন্য কাউকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে ভালোবাসে সে ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা অন্য কিছুকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই সমকক্ষতা সৃষ্টি বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে নয়, ভালোবাসার ক্ষেত্রে। এখানে প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সমকক্ষতা আরোপ করা হচ্ছে, এটা পৃথিবীর কেউই দাবি করে না। কিন্তু জগতের বেশির ভাগ মানুষ ভালোবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রহণ করেছে।" [৪৭]

"আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ওদের ভালোবাসে তারা...", এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মত দুটি উল্লেখ করার পর ইবনুল কায়্যিম বলেন,

"সমকক্ষ বানানোর বিষয় উল্লেখ করার সময় আল্লাহ আমাদেরকে আরও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা এ কাজ করেছে তারা জাহান্নামে থাকবে এবং আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে যাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছিল তারাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। অনুসারীরা তাদের উদ্দেশে বলবে,

'আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ ভেবে আমরা তো আসলেই বিরাট বড় ভুল করেছি।' [সূরা আশ-শুআরা, ২৬:৯৭-৯৮]

অনুসারীরা যে সৃষ্টি বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ বানায়নি, তা তো জানা কথা।[৪৮] বরং আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসা ও ভক্তি করার কথা, সে রকম ভালোবাসা তারা এদের দিয়েছে। সূরা আল-আনআমের আয়াতেও সমকক্ষ বলতে এ কথাই বোঝানো হচ্ছে,

"...তারপরও অবিশ্বাসকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ বানায়।" [সূরা আল-আনআম, ৬:১]

অর্থাৎ, অন্যদেরকে ভালোবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ বানানোর

---

[৪৭] মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১৯।

[৪৮] এখানে শাইখ আল-ফিকি (রাহিমাহুল্লাহ) অবশ্য বলেছেন, "কিন্তু তারা রুবুবিয়্যা বা প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবে। আইন-বিধান প্রণয়ন এ রকমই একটি বৈশিষ্ট্য...।"

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।"[৪৯]

এতক্ষণ আনদাদের যে দুটি অর্থ (দেব-দেবী ও নেতা) নিয়ে আলোচনা করা হলো, নিঃসন্দেহে উভয়ই সঠিক। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অর্থটির ওপর আলোকপাত। সূরা বাকারাহর এ আয়াতের ব্যবহৃত 'আনদাদ' শব্দটিকে মুফাসসিরগণ যে আল্লাহর পরিবর্তে আনুগত্য করা হয় এমন নেতা-নেত্রী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

২। আল্লাহ বলেছেন,

"একসময় সমগ্র মানবজাতি ছিল একটি মাত্র সম্প্রদায়। আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদ ও সতর্কতা সহকারে। আর তাদের সাথে করে অবতীর্ণ করলেন এমন সত্য কিতাব, যা দিয়ে মানুষের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সুরাহা করা হবে..." [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১৩]

মাহাসিনুত তাওয়ীল গ্রন্থে আল-কাসিমি বলেছেন,

"এখানে কিতাব বলতে বোঝানো হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন, সদাচার ও পথপ্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। সব দিক দিয়েই যা মানুষকে সত্য পথ দেখাবে।

'যা দিয়ে মানুষের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সুরাহা করা হবে' এর অর্থ আর বিশ্বাস ও কাজের ব্যাপারে মানুষের মাঝে থাকা মতপার্থক্যের ফায়সালা করা হবে...।"[৫০]

প্রত্যেক নবী তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং তাঁদের কাছে আসমানি কিতাব পাঠানো হয়েছিল যাতে তাঁরা মানুষের মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে বিচার করতে পারেন।

৩। আল্লাহ বলেছেন,

"...তাগূতের প্রতি অবিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানে দৃঢ়তম হাতল আঁকড়ে ধরা...।" [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৬]

তাগূত শব্দটির অর্থ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। আত-তাবারী এটির অর্থ হিসেবে শয়তান, জাদুকর ও গণকের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫১] প্রতিটির সমর্থনে সালাফদের বর্ণনাও এনেছেন। তাগূতের অর্থ গণক বা জ্যোতিষী হওয়ার সমর্থনে তিনি ইবনু জুরাইজের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। ইবনু জুরাইজ বলেছেন,

[৪৯] মাদারজিুস সালকীন, ৩/২১।

[৫০] মাহাসিনুত তাওয়ীল, আল-কাসিমি, ৩/৫২৮।

[৫১] তাফসিরুত তাবারি, ৫/৪১৬-৪১৮, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।

Scanned by CamScanner

"'...তাগূতের প্রতি অবিশ্বাস', অর্থাৎ, তাগূত অর্থ জ্যোতিষী, যাদের কাছে শয়তানেরা নেমে আসে। এবং তাদের মুখ ও অন্তরে নানা রকম কথা ছুড়ে দেয়।"

তারপর বলেছেন,

"আবুয-যুবাইর আমাকে বলেছেন যে, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে একবার তাগূত শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'এদের একজন জুহাইনাতে আছে, আরেকজন আছে আসলামে। এভাবে প্রত্যেক এলাকায় আছে একেকজন। এরা সবাই গণক। তাদের কাছে শয়তানেরা আসে।"[৫২]

এরপর ইবনু জারীর আত-তাবারী বলেন,

"আমার মতে, যা কিছুকে আল্লাহর স্থানে বসানো হয়, এবং আল্লাহর বদলে উপাসনা করা হয়, সেগুলোর সবই তাগূত। তা সে শয়তান, প্রতিমা, মূর্তি যা-ই হোক না কেন। হয় এরা জোর করে সে উপাসনা আদায় করে নেয়, আর নয়তো উপাসক স্বেচ্ছায় তা করে।"[৫৩]

এটাই তাগূতের সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা। তাগূত শব্দটি আরও অনেক আয়াতে আছে। যেমন:

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগূতের প্রতি ঈমান আনে...।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৫১][৫৪]

৪। আল্লাহ বলেছেন,

"বলুন, 'আল্লাহকে ভালোবেসে থাকলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তো মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' বলুন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করো।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তারা জেনে রাখুক) অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১-৩২]

ইমাম আত-তাবারীর মতে এখানে বিশেষভাবে নাজরানের খ্রিষ্টানদের কথা বলা হচ্ছে।[৫৫] কিন্তু ইবনু কাসীরের মতে এখানে ব্যাপক অর্থে সকলের কথা বলা হচ্ছে।

---

[৫২] প্রাগুক্ত, ৫/৪১৮।

[৫৩] তাফসিরুত তাবারি, ৫/৪১৯, ৮/৪৬৫।

[৫৪] জিবত এবং তাগূতের অর্থ ব্যাপক। সত্যিকার উপাস্য আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুর উপাসনা করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হোক তা কোনো প্রতিমা, শয়তান, কবর, পাথর, নক্ষত্র, ফেরেশতা, সাধু, বা অন্য যেকোনো মানুষ। (ড. মুহাম্মাদ মুহসিন খান ও ড. মুহাম্মাদ তাকিউদ্দীন হিলালি কুরআনের যে অনুবাদ করেছেন, সেখান থেকে পাদটীকাটি চয়ন করেছেন এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদক।

[৫৫] তাফসিরুত তাবারি, ৬/৩২৪, সম্পাদক : মাহমুদ শাকির।

Scanned by CamScanner

তিনি লেখেন,

"এ আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করেও মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুসরণ করে না, এমন সবাই মিথ্যা দাবি করছে। সব কথা, কাজ ও পরিস্থিতিতে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথ ও ধর্ম অনুসরণ না করলে এই ভালোবাসার দাবি মিথ্যে। সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, নবী ﷺ বলেছেন,

"আমাদের পন্থার (ইসলামের) সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আমল প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৫৬],[৫৭]

পরের আয়াতটির (আলে ইমরান, ৩২) ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর বলেন,

"এ থেকে বোঝা যায় যে, নবীজির পথের বিরুদ্ধে যাওয়া কুফর। এমন কাউকে আল্লাহ ভালোবাসেন না, সেই বিরুদ্ধাচারী যতই আল্লাহকে ভালোবাসার বা তাঁর নৈকট্য লাভের দাবি বা আশা করুক না কেন। এমনকি উলুল আযম[৫৮] সহ অন্য নবীগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর যামানায় জীবিত থাকলেও তাঁদের ওপর বাধ্যতামূলক হতো উম্মী নবী, খাতামুন নাবিয়্যীন, সমগ্র মানব ও জিন জাতির প্রতি প্রেরিত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা...।"[৫৯]

'*...সেই বিরুদ্ধাচারী যতই আল্লাহকে ভালোবাসার বা তাঁর নৈকট্য লাভের দাবি বা আশা করুক না কেন...*', ইবনু কাসীরের এ কথা থেকে মনে হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও মানুষজনকে ইঙ্গিত করে এ কথাগুলো বলছেন।

৫। সম্পদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবাধ্যতা করে এবং তাঁর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে নিক্ষেপ করবেন আগুনে। চিরকাল সেখানে বাস করবে সে, ভোগ করবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।" [সূরা আন-নিসা, ৪:১৪]

ইমাম আত-তাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়ার সময় মন্তব্য করেছেন, '*বাস করবে*' (খুলূদ) কথাটির অর্থ '*চিরকাল*' হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তারপর বলেছেন,

"প্রশ্ন উঠতে পারে, উত্তরাধিকারের ইসলামী বিধানের ব্যাপারে অবাধ্য হলেও কি

---

[৫৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকজিয়্যাহ, নাকজুল আহকামিল বাতিলাহ ওয়া রাদ্দু মুহদাসাতিল উলুম অধ্যায়, হাদীস নং ১৭১৮। এর আগের আরেকটি হাদীসে আছে, "আমাদের এই পন্থায় (ইসলামে) যে এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যা আদৌ এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

[৫৭] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/২৫, আশ-শাব সংস্করণ।

[৫৮] উলুল আযম দ্বারা ওইসব রাসুল উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অন্যান্য নবীদের চেয়ে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন এবং ধৈর্য ধারণ করে হকের ওপর অটল থেকেছেন। তারা হলেন, নুহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)। [সম্পাদক]

[৫৯] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/২৫।

Scanned by CamScanner

চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে? উত্তর হচ্ছে, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি অবাধ্যতার পাশপাশি এ দু-আয়াতে দেয়া আল্লাহর বিধান নিয়ে কারও মনে সন্দেহ থাকে, তাহলে সে চিরকালের জন্য জাহান্নামী। অথবা কেউ যদি এ আয়াতগুলো সম্পর্কে জেনেও এর বিরোধিতা করে, তাহলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর[৬০] বর্ণনাটি থেকে এমনটিই জানা যায়। সূরা নিসার ১১-১২ তম আয়াত নাযিল করে শিশু ও নারীদের প্রাপ্য উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়। নারী-শিশুরা সম্পদের ভাগ পাবে শুনে একজন বলে ওঠে,

"যারা ঘোড়ায় চড়তে জানে না, যুদ্ধ করতে পারে না, শত্রুর সম্পদ ছিনিয়ে আনতে পারে না, ওরাই বুঝি অর্ধেক উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে?"

এটা ছিল নারী, শিশু এবং মৃতদের জন্য আল্লাহ্ যে ভাগ নির্ধারণ করেছেন তার বিরুদ্ধাচরণ। ইবনু আব্বাস বলেন যে, এ রকম মুনাফিকদের ব্যাপারেই উক্ত (সূরা নিসার ১৪তম) আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এমন ধরনের লোকেরা চির-জাহান্নামী হবে, কারণ তারা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আপত্তি করে কাফির হয়ে গেছে, এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।"[৬১]

ইবনু কাসীরও ব্যাপারটিকে এভাবেই বুঝেছেন। সূরা নিসার ১৪তম আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন,

"কারণ সে আল্লাহর দেয়া বিধানের বিরোধিতা করেছে এবং একে বদলে ফেলেছে। এ রকম বিরোধিতার কেবল উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত আল্লাহর আইনের প্রতি অস্বীকৃতি থেকেই হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাকে চিরকাল লাঞ্ছনাকর ও মর্মান্তিক শাস্তি দিয়ে যাবেন।"[৬২]

৬। আল্লাহ্ বলেছেন,

"আমি আপনার কাছে সত্য সহকারেই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো পথে মানুষের মাঝে বিচার-সুরাহা করতে পারেন...।" [সূরা আন-নিসা, ৪:১০৫]

ইমাম আত-তাবারী বলেন,

"এ আয়াতে নবীজি ﷺ-কে সম্বোধন করা হচ্ছে। এখানে কিতাব অর্থ কুরআন।

---

[৬০] একই তাফসীরে একটু আগেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এখানে সেটির প্রতিই পুনরায় ইঙ্গিত করা হচ্ছে। দেখুন তাফসিরুত তাবারি, ৮/৩২, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।

[৬১] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৭২-৭৩, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।

[৬২] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ২/২০৩, আশ-শাব সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর দেখানো পথে বিচার করা মানে সেই কিতাবে বিধৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করা।”[৬৩]

ইবনু আতিয়্যাহ বলেন,

“আল্লাহর দেখানো পদ্ধতি মানে শরীয়াহর আইনকানুন। সেটা সরাসরি ওয়াহি থেকে হোক, কিংবা ওয়াহি থেকে চয়িত মূলনীতি থেকে। আর আল্লাহ তাঁর নবীগণকে মাসুম রেখেছেন।”[৬৪]

আল্লাহর রাসূলকেই যদি শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার করার আদেশ দেয়া হয়, তাহলে বাকি সবার ওপর সে আদেশ তো আরও বেশি প্রযোজ্য। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

“সিদ্ধান্ত দেয়া আপনার কাজ নয়...।” [সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৮]

ইমাম আত-তাবারী বলেন,

“এর অর্থ হলো, হে নবী, আমার মাখলুকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া আপনার কাজ নয়। বরং আপনার দায়িত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কাছ থেকে আসা নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, এবং তাদেরকে আনুগত্যদের পথনির্দেশ করা। কিন্তু তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত একান্তই আমার অধিকারে ও ইচ্ছাধীন; আর কারও নয়...।”[৬৫]

উহুদের যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি দুআ করেন। আয়াতটি মূলত সে প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। কিন্তু ইমাম আত-তাবারীর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিধানটি সাধারণভাবে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আয়াতটিও অনুরূপ:

“বলে দিন, ‘সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আল্লাহর অধিকারে’...।” [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৪]

আত-তাবারী বলেছেন, এর অর্থ, আল্লাহ সবকিছুকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালিত করেন, নিজের পছন্দমতো নিয়ন্ত্রণ করেন।[৬৬]

৭। *“আমি বুঝি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য বিচারকের (হাকাম) শরণাপন্ন হব?...” (সূরা আল-আনআম, ৬:১১৪)*, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি বলেন,

“অর্থাৎ বলা হচ্ছে আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তোমাদের জন্য বিচারক হিসেবে গ্রহণ করব? যখন তিনিই তাঁর নাযিলকৃত স্পষ্ট কিতাবের আয়াতে এর সমাধান দিয়েছেন?

---

[৬৩] তাফসিরুত তাবারি, ৯/১৭৫, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।
[৬৪] আল-মুহাররারুল ওয়াজীয, ৪/২৪৫।
[৬৫] তাফসিরুত তাবারি, ৭/১৯৪, মাহমুদ শাকির-সম্পাদিত।
[৬৬] তাফসিরুত তাবারি, ৭/৩২২।

Scanned by CamScanner

বলা হয়ে থাকে, 'আল-হাকাম' শব্দটি 'আল-হাকিমে'র চেয়ে জোরালো। শুধু তাকেই আল-হাকাম বলা যাবে, যিনি সত্য দিয়ে বিচার করেন। আল-হাকিম নিতান্ত একটি সম্বোধন। সত্য-মিথ্যা কিছু একটা দিয়ে বিচার করলেই এই সম্বোধনের অধিকারী হওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল-হাকাম সম্বোধনের মাঝে ভক্তি ও প্রশংসা নিহিত।"[৬৭]

৮। আল্লাহ্ বলেছেন,

"...জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর...।" [সূরা আল-আরাফ, ৭:৫৪]

কোনো সন্দেহ নেই। যিনি সৃষ্টি করেছেন, আদেশ দেবেন তিনিই। ইমাম আত-তাবারী বলেন,

"সকল সৃষ্টি আল্লাহর। কাজেই তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার বা তা রহিত করার অধিকার কারও নেই। আদেশ দেয়ার অধিকার শুধুই তাঁর। আর মুশরিকদের উপাসিত দেব-দেবীরা তো না কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি, না করতে পারে সৃষ্টি, না দিতে পারে আদেশ।"[৬৮]

ইমাম আল-বাগাওয়ি বলেছেন,

"সৃষ্টজগৎ তাঁর কর্তৃত্বাধীন, কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর আদেশ তাঁর অধিকারে মানে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যেমন ইচ্ছে, তেমনই আদেশ করবেন।"[৬৯]

৯। এ বিষয়ক প্রতিটি আয়াত নিয়ে বিস্তারিত কথা বললে আলোচনার কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। ওপরে যেসব আয়াত এবং মুফাসসিরগণের যেসব ব্যাখ্যা আমরা উপস্থাপন করেছি, সেগুলোই আপাতত যথেষ্ট। বাকি আয়াতগুলো আমরা নিচে উল্লেখ করে দিচ্ছি শুধু। আগ্রহী পাঠকগণ তাফসীর গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। তবে স্মর্তব্য যে, কুরআনে উল্লেখিত বিধান, আদেশ ও অনুমোদন দুই প্রকার :

♦ কাওনি (সর্বজনীন) বা কাদরি (তাকদির সংক্রান্ত, ঐশী নির্ধারণ)। এগুলো সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

♦ দ্বীনি (ধর্মীয়) বা শার'ঈ (বিধান সংক্রান্ত)। এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহর আদেশের সাথে।

---

[৬৭] তাফসীরুল কুরতুবি, ৭/৭০। আরও দেখুন রূহুল মাআনি, আল-আলূসি, ৮/৮, ২য় সংস্করণ।
[৬৮] তাফসিরুত তাবারি, ১২/৪৮৩-৪৮৪, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।
[৬৯] তাফসিরুল বাগাওয়ি, ৩/২৮৬।

Scanned by CamScanner

কাওনি হুকুম সংক্রান্ত আয়াতের উদাহরণ:

> "সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি সত্য দিয়ে বিচার করে দিন!'..." [সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১১২]

অর্থাৎ, এমন কিছু করে দিন, যাতে আপনার বান্দারা জয় লাভ করে আর আপনার শত্রুরা লাঞ্ছিত হয়।

শার'ঈ হুকুমের উদাহরণ:

> "...এটিই আল্লাহর বিচার। তিনি তোমাদের মাঝে মিটমাট করে দেন..." [সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৬০:১০]

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়:

ক) শার'ঈ (ঐশী আদেশ) ও কাদরির (ঐশী নির্ধারণ) মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। কাদরের নির্ধারিত ঘটনাগুলো ঘটবেই। তাতে এমন জিনিস থাকবে যা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যাবে। যেমন: কাফিররা কুফরি করবে, পাপীরা পাপ করবে। আর শার'ঈ আদেশ হলো সেসব কাজ, যেগুলোতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। কিন্তু কেউ তা মান্যও করতে পারে, আবার লঙ্ঘনও করতে পারে।

খ) কিছু আয়াতে উভয়ই একসাথে বিদ্যমান। যেমন :

"...তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার করেন না।" [সূরা আল-কাহফ, ১৮:২৬]

ইমাম আন-নাসাফি, ইমাম আল-বাইজাওয়ি সহ কিছু মুফাসসির এখানে হুকমিহি (তাঁর সিদ্ধান্ত ও আদেশ) কথাটিকে একটিমাত্র অর্থে নিয়েছেন বটে। কিন্তু আত-তাবারী ও ইবনু কাসীরসহ বেশির ভাগ মুফাসসিরের মতে এখানে শার'ঈ-কাদরি উভয় ধরনের হুকুমের কথা বলা হচ্ছে।[৭০]

আশ-শানকীতি বলেছেন, "আল্লাহর সকল নির্ধারণ এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাঝে একদম প্রথমেই রয়েছে তাশরী (শার'ঈ) আদেশ।"[৭১] এরপর অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট আরও অনেকগুলো আয়াত তিনি উল্লেখ করেছেন। নিচে এর কয়েকটি আমরা উল্লেখ করব। এর মধ্যে কিছু আয়াতে শুধু কাদরি (ঐশী নির্ধারণ, তাকদির সংক্রান্ত) হুকুমের কথা বলা হয়েছে, এমন ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু শার'ঈ হুকুম দেয়ার অধিকারও যে শুধুই আল্লাহর, এই ধারণাটিও সেসব আয়াতে অন্তর্ভুক্ত। পরের অনুচ্ছেদে এ আলোচনাই আসছে।

---

[৭০] শিফায়ুল আলীল গ্রন্থে ইবনুল কায়্যিমও এমনটি বলেছেন, পৃ. ২৮০; আরও আছেন ইবনু সাদি, ৫/২৭।

[৭১] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৪/৯০।

Scanned by CamScanner

গ) সর্বজনীন বিধান ও হুকুমের ক্ষমতা যেহেতু একমাত্র আল্লাহর, সেহেতু আদেশ দেয়ার একমাত্র মালিকও তিনিই। "...সৃষ্টি যার, আদেশও কি তাঁরই হওয়ার নয়?..." আয়াতটিতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

আপত্তি আসতে পারত যে, উল্লেখিত বেশির ভাগ আয়াতই কাদরি (তাকদির সংক্রান্ত) হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, অথচ আমরা সেগুলোকে শার'ঈ হুকুমের সাথে জুড়ে দিচ্ছি। এ অভিযোগ খণ্ডনের জন্যই ওপরের আলোচনাটুকু সংযুক্ত করা হলো।

এবারে আমরা প্রাসঙ্গিক বাকি আয়াতগুলো তুলে ধরছি:

"শুনে রাখো, ফায়সালা তাঁরই এবং তিনি অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।"[সূরা আল-আনআম, ৬:৬২]

"নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।" [সূরা আল-আনআম, ৬:৫৭]

"বরং সব বিষয় তো আল্লাহর হাতে।" [সূরা আর-রাদ, ১৩:৩১]

"এমনিভাবেই আমি এ কুরআনকে আরবি ভাষায় নির্দেশরূপে অবতীর্ণ করেছি।" [সূরা আর-রাদ, ১৩:৩৭]

"আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।" [সূরা আর-রাদ, ১৩:৪১]

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত কোরো না।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৪০]

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার অধিকার নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি।" [সূরা ইউসুফ, ১২:৬৭]

"তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।" [সূরা আল-কাহফ, ১৮:২৬]

"আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূল ﷺ -এর কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী? মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা

Scanned by CamScanner

শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।” [সূরা আন-নুর, ৫২-২৪:৪৬]

“রাসূল ﷺ -এর আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” [সূরা আন-নুর, ২৪:৬৩]

“আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে, তা থেকে ঊর্ধ্বে। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ (উপাস্য) নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আল- কাসাস, ৭০-২৮:৬৮]

“কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে (উপাস্যকে) আহ্বান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো (সত্য) ইলাহ (উপাস্য) নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আল-কাসাস, ৮৮-২৮:৮৭]

“বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ করো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ? আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কী ধারণা কিয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।” [সূরা ইউনুস, ৬০-১০:৫৯]

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিনাহ নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।” [সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৬]

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ, আমার পালনকর্তা আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী

Scanned by CamScanner

হই।" [সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০]

"আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও মিযান (ইনসাফের মানদণ্ড) নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী।"[সূরা আশ-শূরা, ৪২:১৭]

"এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়াহর ওপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোনো উপকারে আসবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ মুত্তাকিদের (ধার্মিক, পরহেজগারদের) বন্ধু।" [সূরা আল-জাসিয়াহ, ১৯-৪৫:১৮]

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সামনে (কোনো বিষয়ে) অগ্রসর হোয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" [সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১]

"এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০:১০]

এখানেই শেষ নয়। তবে বাকি আয়াতগুলো আমরা বইয়ের পরবর্তী অংশগুলোতে প্রসঙ্গ অনুযায়ী উল্লেখ করব ইন শা আল্লাহ।

কিছু আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন

১। প্রথম আয়াত:

"যাদেরকে কিছু আসমানি কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের অবস্থা দেখুন! তাদের আহ্বান করা হচ্ছে যেন আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করে। অথচ তাদের একাংশ বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:২৩]

এখানে আসমানি কিতাব বলতে কি কুরআন বোঝানো হয়েছে না তাওরাত, এ ব্যাপারে আলিমদের কিছু মতপার্থক্য আছে। ইবনু জারীরের মতে তাওরাত বোঝানো হচ্ছে।[৭২]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কেও আছে বিভিন্ন মত। ইমাম আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

"আল-মিদরাসের ঘরে অবস্থানরত একদল ইহুদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেন।

জবাবে নাঈম ইবনু আমর ও আল-হারিস ইবনু যাইদ বলে, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি

[৭২] তাফসিরুত তাবারি, ৬/২৯২, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির; ইবনু কাসীর শুধু এ মতটিই উল্লেখ করেছেন, ২/২২, আশ-শাব সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

কোন ধর্ম অনুসরণ করেন?'

তিনি বললেন, 'আমি ইবরাহীমের সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরই ধর্মও অনুসরণ করি।'

তারা বলল, 'ইবরাহীম তো ইহুদি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বেশ। এ ব্যাপারে তাওরাত কী বলে দেখা যাক। এটি তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেবে।'

ইহুদিরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহ্ নাযিল করেন এ আয়াত :

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি? যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে। অতঃপর তাদের একদল ফিরে যাচ্ছে বিমুখ হয়ে। এর কারণ হলো, তারা বলে, 'দিন কতক ছাড়া জাহান্নামের আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' আর তারা যা মিথ্যা রচনা করত, তা তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে প্রতারিত করেছে।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:২৩, ২৪][৭৩]

এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আয়াতে তাওরাতের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আত-তাবারী আরও বলেন যে, এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"এখানে আল্লাহর শত্রু ইহুদিদের কথা বলা হচ্ছে। মতভেদ নিরসনের জন্য তাদের আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছিল। যে নবীর কথা তারা তাওরাত ও ইনজিলে পড়েছে। কিন্তু তারা নবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ছিল বিরূপ।"[৭৪]

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জুরাইজ বলেছেন,

"আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে শাস্তি সংক্রান্ত মতভেদের যথাযথ সুরাহা করতে। নবী ﷺ তাদেরকে ইসলামের দিকে

---

[৭৩] আত-তাবারি এটি দুটি সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন (তাফসিরুত তাবারি, ৬/২৮৯)। ইকরিমা থেকে ইবনু আবি হাতিম হয়ে আরেকটি মুরসাল বর্ণনাও আছে (তবে আত-তাবারি একে মাওসুল বলেছেন)। দেখুন তাফসীর ইবনু আবি হাতিম-এর (প্রকাশিত অংশ) তাফসীর সূরা আলে ইমরান, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৬।

এ ছাড়া আদ্দুররুল মানসুর গ্রন্থে আস-সুয়ুতি, শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে আল-বাগাওয়ি, এবং আসবাবুন নুযুল (পৃ. ৯৯, সম্পাদনা : আল-হুমাইদান) গ্রন্থে আল-ওয়াহিদি এই বর্ণনাটি এনেছেন। তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম ও আসবাবুন নুযুল-এর সম্পাদকদ্বয় বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন।

[৭৪] তাফসিরুত তাবারি, ৬/২৯০, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির। আরও দেখুন তাফসিরুল কাসিমি, ৪/৮১৮।

Scanned by CamScanner

আহ্বানও করেন। কিন্তু তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে।"[৭৫]

এখান থেকে আবার জানা যাচ্ছে যে, আয়াতে উল্লেখিত আসমানি কিতাবটি কুরআন। "*শাস্তি সংক্রান্ত মতভেদ*", কথাটি থেকে এই আয়াত নাযিল হবার প্রেক্ষাপটের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুইজন ইহুদির ব্যভিচারের প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয় বলে উল্লেখ করেছেন আলিমদের একাংশ। সূরা আল-মায়িদাহর আয়াতগুলো আলোচনা করার সময় আমরা পুরো ঘটনাটি উল্লেখ করব। সহিহুল বুখারি ও সহিহ্ মুসলিমসহ বেশ কিছু গ্রন্থে ঘটনাটি এসেছে।

ওপরের মত ও বর্ণনাগুলো উল্লেখের পর আত-তাবারী বলেন,

> "আমার মতে, (আয়াতে উদ্দেশ্য) তাওরাত হবার মতটি সঠিক। সে সময়কার মদীনাবাসী একদল ইহুদির কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে। তাদের তাওরাতের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, এবং তাওরাতকে তারা আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করত। তাই রাসূল ﷺ -এর সাথে তাদের কোনো একটি মতভেদ নিরসন করতে এই কিতাবের শরণাপন্ন হতে বলা হয়। হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী হওয়া নিয়ে, আর নয়তো ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্ম নিয়ে, আর নয়তো শাস্তির ব্যাপারটি নিয়ে তর্ক করছিল তারা। অথবা তর্কটি ছিল দ্বীন ইসলাম নিয়ে। এ সবগুলো বিষয়ে তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তাই রাসূল ﷺ তাওরাত অনুযায়ী বিচার করার আহ্বান করেন। কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কেউ কেউ গোপনও করে ফেলে সেসব তথ্য। এখন ঠিক কোন বিষয়টির নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে, তা আলোচ্য আয়াতে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে তা জানারও প্রয়োজন নেই। বিষয় যা-ই হোক না কেন, তাদের ধর্ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে তাওরাত অনুযায়ী বিচার করার দাবিতে সাড়া দেয়া তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, নিজেদের কিতাবে যা আছে তা প্রত্যাখ্যানের কারণে, এবং মহান আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার অস্বীকারের কারণে তারা মুরতাদ। মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর আনীত বার্তার প্রতি তাঁদের প্রত্যাখ্যান মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যানের মতোই গুরুতর। এবং তারা মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর আনীত বার্তাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল অথচ তারা ঠিকই মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে পছন্দ করত এবং তাঁর ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করত।

'*বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া*', বলতে বোঝানো হচ্ছে আল্লাহর কিতাব প্রত্যাখ্যান করাকে। যখন মতপার্থক্যের ফায়সালার জন্য কিতাবের দিকে আহ্বান করা হলো,

---

[৭৫] প্রাগুক্ত।

Scanned by CamScanner

তখন এর সত্যতা ও প্রমাণের স্পষ্টতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও তারা এভাবে বিমুখ হয়েছে।"[৭৬]

ইমাম আত-তাবারীর বক্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি ব্যাপার লক্ষণীয় :

ক। কুরআন বা তাওরাত, যে কিতাবের কথাই এ আয়াতে বলা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রে হুকুম এক। কারণ তাদেরকে এমন এক কিতাবের অনুসরণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছিল যার অনুসরণ ছিল তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। ইহুদিরা সত্যিকার অর্থেই তাওরাতে বিশ্বাস করলে অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করত।

খ। যদিও এ আয়াতে আহলে কিতাবদের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আয়াতের হুকুম শুধু আহলে কিতাবদের জন্য সীমাবদ্ধ না। এটা আমাদের ওপরও প্রযোজ্য। সূরা মায়িদাহর আয়াতের আলোচনায় এ নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা আসবে।

গ। যে কারণে ও যে বিধান নিয়ে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তার প্রযোজ্যতা ব্যাপক—যেমনটি ইমাম আত-তাবারী বললেন। ইহুদিরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়্যাত নিয়ে তর্ক করুক, বা ইসলাম নিয়ে করুক, বা শাস্তি নিয়ে—মোদ্দাকথা হলো তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হচ্ছে। তাই এ আয়াতে আল্লাহর দেয়া ধমকির প্রাপক তারা।

ঘ। এ আয়াতে বর্ণিত লোকদের ব্যাপারে হুকুম হলো, তারা মুরতাদ। যেমনটা আত-তাবারী উল্লেখ করেছেন। তাদের কিতাবে যা আছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, যেখানে কিতাব মানার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ঙ। পরিশেষে ইমাম আত-তাবারীর এ কথাটি বিশেষ মনোযোগের দাবিদার,

"মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর আনীত বার্তার প্রতি তাঁদের প্রত্যাখ্যান মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যানের মতোই গুরুতর। এবং তারা মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর আনীত বার্তাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল; অথচ তারা ঠিকই মুসাকে (আলাইহিস সালাম) পছন্দ করত এবং তাঁর ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করত।"

অর্থাৎ, তাওরাতে যা ছিল তা থেকে বিমুখ হওয়া মানে মুসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর আনীত বার্তাকেই অস্বীকার করা। তাওরাতে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে ভালোবাসার ও তাঁকে নবী বলে স্বীকার করার দাবি মিথ্যে প্রমাণিত হয়। এ কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ থেকে

---

[৭৬] তাফসিরুত তাবারি, ৬/২৯০-২৯১, সম্পাদনা : মাহমুদ শাকির।

Scanned by CamScanner

সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন; অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯-৬৫]

এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে। নিজেদেরকে মুমিন দাবি করলেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করত। আমরা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। কিন্তু তিনটি আয়াত এখানে বিশেষ মনোযোগের দাবিদার :

- "কোনো কিছু নিয়ে তোমাদের মাঝে মতপার্থক্য হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছে সমর্পণ করো।"
- "এদেরকে দেখুন। তারা ঈমান আনার দাবি করে ঠিকই..."
- "কিন্তু না! আপনার প্রতিপালকের কসম, নিজেদের সকল বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তারা মুমিন বলে গণ্য হবে না।"

ক) প্রথম আয়াতটির ব্যাপারে আত-তাবারীর ব্যাখ্যা:

"এখানে আল্লাহ বলছেন, 'মুমিনরা, দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, সেটা জনগণের মধ্যে হোক বা কর্তৃত্বশীলদের ব্যাপারে হয়, তাহলে সে ব্যাপারে আল্লাহর বিধানটি খুঁজে নিয়ো। প্রথমে দেখবে আল্লাহর কিতাবে তা নিয়ে কী বলা আছে। সেখানে না পেলে যাবে রাসূল ﷺ -এর কাছে। তিনি জীবিত থাকলে তো সরাসরিই জিজ্ঞেস করতে পারবে। আর প্রয়াত হয়ে গেলে দেখবে তাঁর সুন্নাহ। আল্লাহ ও বিচারদিবসের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস থাকলে এমনটিই করা উচিত।'"[৮১]

খেয়াল করুন। আয়াতের শুরুতে মুমিনদের বলা হয়েছিল দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করতে। আত-তাবারী তাঁর ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গও টেনেছেন। মতভেদ শুধু সাধারণ জনতার মধ্যেই হয় না। নেতৃবৃন্দের সাথেও জনগণের মতভেদ হতে পারে। তাই নেতা-জনতা নির্বিশেষে সকলেই মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করতে আদিষ্ট।

দায়িত্বশীলদের আনুগত্য সংক্রান্ত আয়াতটির ব্যাপারে মুফাসসিরগণের একটি সুন্দর

---

[৮১] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫০৪, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা আছে। "আনুগত্য করো" কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর ক্ষেত্রে দুইবার আলাদা করে বলা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে আর তৃতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ নেতার প্রতি আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যের শর্তাধীন।

"*...কোনো বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতপার্থক্য হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে সমর্পণ করো...*", আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর লিখেছেন,

> "মুজাহিদ সহ একাধিক সালাফের মতে, এখানে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল' বলতে কিতাব ও সুন্নাহ বোঝানো হয়েছে। দ্বীনের ছোট-বড় যেকোনো বিষয়ে যত মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়েছে ও হবে, সবই কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধা করতে হবে। এটি আল্লাহর নির্দেশ। যেমন এ আয়াতেও আছে, *'যা নিয়েই মতভেদ করবে, তার সিদ্ধান্ত আল্লাহর এখতিয়ারে...' (সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০)*
>
> কুরআন ও সুন্নাহ যেটাকে সত্যায়ন করে, তা সত্য। আর সত্যের বাইরে মিথ্যে ছাড়া আর কীই-বা আছে? তাই আল্লাহ বলেন, '...আল্লাহ ও বিচারদিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকলে...' সকল বিতর্কিত ও অজানা বিষয়ের সমাধান ও ফায়সালা নিতে হবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ থেকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এর অন্যথাকারী আসলে আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসীই নয়।"[৮২]

শাইখ ইবনু সা'দি বলেন,

> "দ্বীনের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ। এগুলো ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হয় না। এ দুটির শরণাপন্ন হওয়া ঈমানের শর্ত। তাই আল্লাহ বলেন, '...আল্লাহ ও বিচারদিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকলে...'। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এর অন্যথাকারী প্রকৃত মুমিন নয়। বরং পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী সে তাগূতের অনুসারী।"[৮৩]

ইবনুল কায়্যিম এ আয়াতের আলোচনা থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে এনে মন্তব্য করেছেন। যেমন:

♦ মুমিনদের মাঝে মতভেদ হতেই পারে। কিন্তু এর অর্থ এই না যে, কোনো একটি পক্ষ বেদ্বীন হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর শরণাপন্ন হওয়া।

---

[৮২] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ১/৫১৮, আল-ইস্তিকামাহ সংস্করণ।
[৮৩] তাফসিরু ইবনি সাদি, ১/৩৬২।

Scanned by CamScanner

♦ "...কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে..." এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি (শাইয়িন—যেকোনো কিছু) অনির্দিষ্টতাবাচক। তার মানে দ্বীনের ছোট-বড়, স্পষ্ট-অস্পষ্ট সকল বিষয়ই এখানে অন্তর্ভুক্ত।

♦ বিচারের জন্য আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া মানে তাঁর কিতাবের দ্বারস্থ হওয়া। আর রাসূল ﷺ -এর শরণাপন্ন হওয়া মানে জীবদ্দশায় সরাসরি তাঁর কাছে যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর সুন্নাহর অনুসরণ। এই ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

♦ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়া ঈমানের আবশ্যক শর্ত। এই শর্ত অপূর্ণ থাকলে ঈমান চলে যায়। এই আন্তঃসম্পর্কটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি না থাকলে অপরটিও থাকবে না।[৮৪]

অতএব, এ আয়াত থেকে বোঝা যায় কুরআন-সুন্নাহর সিদ্ধান্তের বিরোধী কিছু মেনে নেওয়া বৈধ না।[৮৫]

খ) পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

> "তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়..." [সূরা আন-নিসা, ৪:৬০]

তাগূতের অর্থ পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থীদের বিধান সম্পর্কে আত-তাবারীর মত উল্লেখ করা হয়েছে একাধিক জায়গায়। আর উল্লিখিত আয়াতটিতে যে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, তা তো জানা কথা। তাই এখন আয়াতটির শানে নুযুল সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

আত-তাবারানি থেকে বর্ণিত আছে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

> "আবু বারযাহ আল-আসলামি নামে এক জ্যোতিষী ছিল। ইহুদিরা তার কাছে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে গেলে ফায়সালা করে দিত সে। কিছু মুসলিমও তার কাছে বিচারের জন্য যায়। তাই আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাযিল করেন (সূরা আন-নিসার ৬০-৬২ আয়াত)।"[৮৬]

এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদার মত উল্লেখ করেছেন আত-তাবারী। তিনি বলেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয় দুই ব্যক্তির ব্যাপারে। বিশর নামক একজন আনসারি এবং এক ইহুদির মাঝে কোনো ঋণ বা সম্পত্তি নিয়ে কলহ হয়। রাসূল ﷺ -এর বদলে

---

[৮৪] ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ১/৫১-৫৩, আল-ওয়াকীল সম্পাদিত।

[৮৫] আদ্বওয়াউল বায়ান, ১/২৯২।

[৮৬] আল-মুজামুল কাবীর, আত-তাবারানি, ১১/৩৭৩, হাদীস নং ১২০৪৫। মাজমাউয

Scanned by CamScanner

তারা সেই মামলা নিয়ে যায় মদীনার এক গণকের কাছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর সমালোচনা করেন। বর্ণিত আছে, ইহুদির ইচ্ছে ছিল মামলাটি রাসূল ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করার। কারণ সে তো জানেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিচার করবেন না। কিন্তু বেঁকে বসে মুসলিম দাবিদার সেই আনসারি। সে বিষয়টি টেনে নিয়ে যায় জ্যোতিষী পর্যন্ত। তাই একজন মুসলিম দাবিদার এবং আরেকজন আহলে কিতাবের (ইহুদি) এই আচরণের সমালোচনা করে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "এদের অবস্থা দেখুন! তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ বার্তায় বিশ্বাস করার দাবি করে... দেখবেন তারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"[৮৭]

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী,

> "আত-তাগূত হচ্ছে কাব ইবনুল আশরাফ নামক এক ইহুদি। রাসূল ﷺ -এর কাছে বিচার-ফায়সালা চাইতে বলা হলে তারা বলে, 'না, আমরা কাবের কাছে যাব।' এ ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন, 'তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।'"[৮৮]

মুজাহিদের তাফসীরে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী,

> "এক মুনাফিকের সাথে এক ইহুদির বিবাদ হয়। ইহুদি বলে, 'চলুন বিষয়টি মুহাম্মাদের কাছে উত্থাপন করি।' মুনাফিকটি জবাব দেয়, 'না, বরং কাব ইবনুল আশরাফের কাছে যাওয়া যাক।' এরপর আল্লাহ নাযিল করেন, 'আর তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে...'। এখানে কাব ইবনুল আশরাফের কথা বলা হয়েছে।"[৮৯]

এ বর্ণনাগুলো থেকে কোন ধরনের বিচার চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সমালোচনা করেছেন তা নিয়ে ধারণা পাওয়া যায়। শানে নুযুল সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখের পর ইবনু কাসীর বলেন,

> "আয়াতটির প্রযোজ্যতা আরও ব্যাপক। কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে যেকোনো বাতিলের কাছে বিচার চাওয়াকেই অভিযুক্ত করা হচ্ছে এখানে। তাগূতের

যাওয়ায়িদ, ৭/৬; তিনি বলেছেন, 'এটি আত-তাবারানি থেকে বর্ণিত এবং বর্ণনাসূত্রের ব্যক্তিরা সহীহ গ্রন্থেরও বর্ণনাকারী। আসবাবুন নুযূল, আল-ওয়াহিদি, পৃ. ১৬০ (আবু বারযা একজন বিখ্যাত সাহাবি। এটি তিনি মুসলিম হওয়ার আগের ঘটনা)। ফাতহুল বারি, ৫/৩৭, সালাফিয়্যাহ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ।

[৮৭] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫০৯; আসবাবুন নুযূল, পৃ. ১৬১, আল-হুমাইদান সম্পাদিত। এখানে ওই মুসলিম দাবিদারের নাম বলা হয়েছে কাইস। ফাতহুল বারি গ্রন্থে ইবনু হাজার এটিকে সহীহ বলেছেন (৫/৩৮)।

[৮৮] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫১১; ফাতহুল বারি, ৫/৩৭-৩৮।

[৮৯] তাফসিরু মুজাহিদ, ১/১৬৩-১৬৪; তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫১১।

Scanned by CamScanner

অর্থ এটাই।”[৯০]

আরও দ্রষ্টব্য যে, আল্লাহ্ এখানে বলছেন, ‘তারা দাবি করে।’ অর্থাৎ, তারা প্রকৃত ঈমানদার হলে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছেই বিচার চাইত। তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের ঈমান আনার দাবি মিথ্যে।[৯১]

পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন,

> “যখন তাদের বলা হয়, ‘আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, সেদিকে এসো।’ তখন দেখবেন তারা ঘৃণাভরে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।” [সূরা আন-নিসা, ৪:৬১]

ইবনুল কায়্যিম বলেন,

> “এ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, রাসূল ﷺ -এর আনীত বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছুর দিকে ফেরাটাই মুনাফিকির সারনির্যাস।”[৯২]

তাইসীরুল আযীযিল হামীদ গ্রন্থে আছে,

> “ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, তার মানে কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে বিচারের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারীরা মুনাফিক। ইয়াসুদ্দুন (‘মুখ ফিরিয়ে নেয়’ হিসেবে অনূদিত) শব্দটি অকর্মক ক্রিয়াপদ। অর্থাৎ, তারা নিজেরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, অন্যদের সেটা করতে বাধ্য করে না। নিজে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে মুনাফিক হতে হয়, তাহলে যারা অন্যদেরকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করতে বাধা দেয়, তারা কত বড় অপরাধী! অথচ অনেকেই আজকাল বক্তৃতা ও বই লেখার মাধ্যমে তাগূতের দিকে আহ্বান করছে। আবার দাবি করে যে, ওদের নাকি কোনো অসদুদ্দেশ্য নেই।”[৯৩]

আয়াতগুলোর আলোচনা থেকে যা পাওয়া গেল, তার সারমর্ম :

- তাগূতের অর্থ ব্যাপক। এমন একজন মানুষ বোঝানো হয়ে থাকতে পারে যার কাছে বিচার চাওয়া হয়, একাধিকও হতে পারে।
- তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য।

---

[৯০] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ১/৫১৯, আল-ইস্তিকামাহ সংস্করণ। ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ১/৫৩, আল-ওয়াকীল সম্পাদিত।

[৯১] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৫৫৬।

[৯২] মুখতাসারুস সাওয়ায়িক, ২/৩৫৩।

[৯৩] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৫৫৭।

Scanned by CamScanner

◆ কুরআন-সুন্নাহর বিচার থেকে নিজে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ মুনাফিক বলেছেন। আর যারা এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে অন্যদেরকে কুরআন-সুন্নাহর ফায়সালা গ্রহণে বাধা দেয়, তারা আরও বড় কাফির-মুনাফিক।

গ) তৃতীয় আয়াত,

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]

আলিমগণ এ আয়াত নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। আমরা শুধু দুটো বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখছি:

- আয়াতের শানে নুযুল
- আয়াতের অর্থ সম্পর্কে কতিপয় আলিমের বক্তব্য

আয-যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে আরেক আনসারের একটি ঘটনার ইঙ্গিত আমরা আগে দিয়েছিলাম। বুখারিসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন এটি। এখন তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

একজন আনসারী হাররার নালার পানি নিয়ে যুবাইরের সাথে ঝগড়া করল, যে পানি দিয়ে তিনি খেজুর বাগান সেচ দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে যুবাইর, সেচ দিতে থাকো। তারপর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুপাতো ভাই তাই। এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, সেচ দাও, পানি খেতের বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বন্ধ করে দাও। যুবাইরকে তিনি তার পুরা হক দিলেন।

আয-যুবাইর বলেছেন, "আল্লাহর কসম! এ ঘটনার ব্যাপারেই আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।"

অন্য কিছু বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় এ ঘটনার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।"[৯৪]

---

[৯৪] সহিহুল বুখারির বিভিন্ন স্থানে এটি এসেছে। এখানে উল্লিখিত বর্ণনাটি হাদীস নং ২৩৬২, কিতাবুল মুসাকাহ, সাকরুল আনহার, শুরবুল আলা কাবলাল আসফাল, এবং শিরবুল আলা ইলাল-কাবাইন অধ্যায়ে বর্ণিত (ফাতহুল বারি, হাদীস নং ২৩৫৯-২৩৬২)। এ ছাড়া কিতাবুস সুলহ , ইযা

Scanned by CamScanner

আরেকটি মত আছে যে, যেই মুনাফিক ও ইহুদির ব্যাপারে তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপটও সেটিই।[৯৫] এটি মুজাহিদের মত।[৯৬]

ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ তাঁর তাফসীরে আরেকটি বর্ণনা এনেছেন। আশ-শাবি বলেন,

> "এক ইহুদির সাথে এক মুনাফিকের কলহ বাধে। ইহুদিটি রাসূল ﷺ -এর কাছে নালিশ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে। কারণ সে জানে যে, নবীজি ঘুষ নেন না। কিন্তু মুনাফিকটি প্রস্তাব দেয় এক ঘুষখোর ইহুদি বিচারকের কাছে যাওয়ার। তাই আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন... (৪:৬৫)।"

বর্ণনাসূত্রটিকে ফাতহুল বারি গ্রন্থে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ইবনু হাজার।

এখন এতগুলো বর্ণনার মাঝে কোনটি আসলে উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট?

আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) এই বর্ণনাগুলো উল্লেখের পর দ্বিতীয় মতটিকে (মুনাফিক ও ইহুদির ঘটনা) সঠিক বলে রায় দেন। বলেন,

> "(সূরা নিসার) ৬০ নং আয়াতটি যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল, ৬৫ নং আয়াতটি সে আলোচনারই অংশ। দুটি দুই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করার কোনো প্রমাণ এখানে নেই। কোনো বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত নেই; বরং আয়াতগুলো একই ধারাবাহিকতায় এসেছে। কাজেই কোনো বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত না থাকার কারণে সঠিকতর মত হলো, আয়াতগুলোতে একই ঘটনার কথাই বলা হচ্ছে।"[৯৭]

এরপর আত-তাবারী উল্লেখ করেন,

> "কেউ এমন মনে করতে পারে যে, আয-যুবাইরের ঘটনাটি থেকে বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অথবা কেউ বলতে পারে পরের আয়াতে আসা বক্তব্য আগের আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত না। এটা অসম্ভব না যে এই আয়াতটি ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বিচারের জন্য তাগূতের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা আয-যুবাইর এবং তার সাথে কলহে লিপ্ত আনসারী ব্যক্তি যে বিষয়ে বিচার চেয়েছিল, তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এমন হওয়া অসম্ভব না। তবে যতক্ষণ আয়াতের অর্থ সুসংলগ্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, আয়াতগুলো পরস্পর সংযুক্ত ধরে

আশারাল ইমাম বিস-সুলহ অধ্যায়, হাদীস নং ২৭০৮ (ফাতহুল বারি, ৫/৩০৯); এবং তাফসিরু সূরা আন-নিসা, ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইয়ুমিনূনা... অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫৮৫ (ফাতহুল বারি, ৮/২৫৪)। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫৭।

[৯৫] মুজাহিদ থেকে আত-তাবারি বর্ণনা করেছেন, ৮/৫২৩, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

[৯৬] তাফসিরু মুজাহিদ, ১/১৬৪।

[৯৭] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫২৪।

Scanned by CamScanner

নেয়াই অধিকতর উপযুক্ত।"[৯৮]

আত-তাবারীর কথার প্রতিধ্বনিই পাওয়া যায় ইবনু হাজারের ব্যাখ্যায়, আয-যুবাইরের ঘটনার বর্ণনার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "এখানে অধিকাংশের মতটিই সঠিক (অর্থাৎ ৬০ ও ৬৫ নং আয়াত একই প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে)। পক্ষান্তরে আয-যুবাইর ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না যে, এ আয়াতটি তাঁর ওই ঘটনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ কি না...। তবে উম্মু সালামাহ থেকে যে বর্ণনাটি তাবারী ও তাবারানী উল্লেখ করেছেন, সেখান থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চিত এ আয়াত আয-যুবাইর এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে যে বর্ণনা আছে, সেখান থেকেও একই কথা পাওয়া যায়। অন্যদিকে মুজাহিদ এবং আশ-শাবি নিশ্চিত যে, ৬০ ও ৬৫ নং আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গ একই।"[৯৯]

তারপর ইবনু হাজার, আত-তাবারী যে মতটি সঠিক মনে করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, আলোচ্য সবগুলো আয়াত একই ঘটনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। কিন্তু আয-যুবাইরের ঘটনাটিও একই সময়ে ঘটে থাকলে তা এসব আয়াতের সাধারণ বিধানের আওতায় পড়ে যায়। সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।[১০০]

আত-তাবারীর বক্তব্য সঠিক, বিশেষ করে মুনাফিক ও ইহুদির ঘটনা আয়াতের প্রেক্ষাপটের সাথে বেশি মেলে। কারণ আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে এখানে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছেন (৪:৬১)। কিন্তু আয-যুবাইরের ঘটনায় তার সাথে বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন আনসারদের একজন।

ঘটনা যা-ই হোক, আয়াতের মূল বক্তব্য একদম স্পষ্ট। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীরা মুমিন নয়। এই বৈশিষ্ট্য যার মাঝেই আছে, তার ব্যাপারেই এ আয়াত প্রযোজ্য। কারণ বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আয-যুবাইরের প্রতিপক্ষ মারাত্মক এক কাজ করেছিলেন। এটা নবীজি ﷺ-কে অপমান করা ও তাঁর ন্যায়বিচারকে সন্দেহ করার শামিল। তাই এ ব্যাপারে ইমাম নববি বলেছেন,

> "সেই আনসারি যা বলেছে, যা থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নবীজি তাঁর খেয়ালখুশির অনুসরণ করেছেন, তা আজ কেউ বললে কুফরি হবে। যে এমন কথা বলবে তার ওপর যথাযথ শর্তসাপেক্ষে মুরতাদের বিধান বাস্তবায়ন করা হবে।

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, ৮/৫২৪-৫২৫।

[৯৯] প্রাগুক্ত।

[১০০] ফাতহুল বারি, ৫/৩৮। আরও দেখুন : শারহুন নাবাবি আলা মুসলিম, ১৫/১০৯।

Scanned by CamScanner

এটাই আলিমগণের মত। ওই ঘটনায় আনসারিকে ছেড়ে দেয়ার কারণ হলো এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগ। এ পর্যায়ে মানুষের সাথে শিথিল আচরণ করা হতো। মুনাফিক ও রোগাক্রান্ত অন্তরধারীদের সব অপমান রাসূল ﷺ সহ্য করে নিতেন। বলতেন, "সহজ করো, কঠিন কোরো না। মানুষকে তাড়িয়ে না দিয়ে সুসংবাদ দাও।" এবং তিনি বলতেন "আমি চাই না লোকে বলুক যে, মুহাম্মাদ তার নিজের সঙ্গীদের হত্যা করছে।"

আর আল্লাহ্ বলেন,

> "...গুটিকয়েকজন ছাড়া তাদের সবার কাছ থেকেই প্রতারণা পেতে থাকবেন। থাকুক। ক্ষমা করে দিন, অগ্রাহ্য করুন। নিশ্চই আল্লাহ আল-মুহসিনুনকে (সৎকর্মশীলদের) ভালোবাসেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ্, ৫:১৩][১০১]

এরপর কয়েকজন আলিমের মত উল্লেখ করেন তিনি, যাদের মতে আয-যুবাইরের প্রতিপক্ষ মুনাফিক ছিল। ফাতহুল বারিতে ইবনু হাজার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এটি।[১০২]

শানে নুযুলের আলোচনা গেল। এবার আয়াতটির (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৫) ব্যাপারে আলিমগণের কিছু ব্যাখ্যা দেখব। বিচার-ফায়সালা চাওয়ার সাথে এই ব্যাখ্যাগুলোর সম্পর্কও এতে স্পষ্ট হবে।

আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) লেখেন,

> "আয়াতের 'কিন্তু না!' অংশটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আপনার ওপর এবং যা আপনার ওপর নাযিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস আনার দাবি করে। কিন্তু বিচারের জন্য যায় তাগূতের কাছে। আর যখন বিচারের জন্য আপনার কাছে আসার আহ্বান করা হয় তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই তাদের ঈমানের দাবি মিথ্যে।
>
> 'তারা ঈমানদার হতে পারবে না' মানে, তারা আল্লাহ্, তাঁর নবী এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারবে না, 'যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার সকল মতপার্থক্যের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বানায়।' এটিই সেই শর্ত। যেসব বিধানের ব্যাপারে তারা অনিশ্চিত, সেসব ব্যাপারে নবীজি ﷺ-এর কাছ থেকেই ফায়সালা জানতে হবে..."[১০৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচার চাওয়ার ফরযিয়তের (আবশ্যকতা) ব্যাপারে আল-

---

[১০১] শারহুন নাবাবি, ১৫/১০৮; আরও দেখুন : ফাতহুল বারি, ৫/৪০।

[১০২] ফাতহুল বারি, ৫/৩৫-৩৬।

[১০৩] তাফসিরুত তাবারি, ৮/৫১৮, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

জাসসাস কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেন। তারপর, *'কিন্তু না! আপনার প্রতিপালকের কসম। আপনাকে বিচারক হিসেবে...'',* আয়াতটি উদ্ধৃত করেন। তারপর বলেন,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য যে বাধ্যতামূলক, তা এ আয়াতগুলোতে সুনিশ্চিত করেছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য, রাসূল ﷺ -এর অবাধ্যতা আল্লাহরই অবাধ্যতা। আল্লাহ বলেন,

আর যারা রাসূল ﷺ -এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন নিজেদের ওপর আচমকা কোনো ফিতনা বা মারাত্মক শাস্তি চলে আসার ব্যাপারে সাবধান হয়। [সূরা আন-নূর, ২৪:৬৩]

আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন, রাসূল ﷺ -এর আদেশের বিরুদ্ধে গেলে, তাঁর আনীত বার্তাকে প্রত্যাখ্যান বা সন্দেহ করলে মানুষ ঈমানহারা হয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন,

কিন্তু না! আপনার প্রতিপালকের কসম। নিজেদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব নিরসনে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত তারা ঈমান এনেছে বলা যাবে না।

মুজাহিদ বলেছেন, হারাজ (এখানে 'দ্বিধা' হিসেবে অনূদিত) শব্দের অর্থ সন্দেহ। শব্দটির মূল অর্থ অস্বস্তি। অর্থাৎ, নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করার ফরযিয়ত পালন করতে গিয়ে অন্তরে কোনো ইতস্তত ভাব থাকতে পারবে না। অন্তর্দৃষ্টি ও নিশ্চয়তা সহকারে মেনে নিতে হবে। এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর যেকোনো নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলেই ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সেটা ওই আদেশের প্রতি সন্দেহের কারণেই হোক, বা অস্বীকৃতির কারণে হোক।

তার মানে যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সাহাবিদের সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে সাহাবিরা এদের হত্যা করেন ও তাদের নারী-শিশুদের পরিণত করেন দাস-দাসীতে। কারণ আল্লাহই ঘোষণা দিয়েছেন যে, নবীজি ﷺ-এর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীরা ঈমানদার নয়।"[১০৪]

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"নবীজি ﷺ-এর মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর কাছে বিচার চাওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়নি। তাঁর জীবদ্দশায় এ হুকুম যেমন বহাল ছিল, এখনো তা-ই আছে। ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলো দাবি করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালা চাইতে হবে শুধু বাস্তবে উদ্ভূত ব্যাপারে,

---

[১০৪] আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস, ১/২১৩-২১৪, দারুল ফকির সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে না। কিন্তু আল্লাহ্ কসম করে বলছেন যে, সকল ব্যাপারেই রাসূল ﷺ -এর সিদ্ধান্ত মানতে হবে। হোক তা দ্বীনের ছোট, বড়, মৌলিক, উদ্ভূত যেকোনো বিষয়। এতেই শেষ না। ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো দোটানাও থাকা চলবে না মনে। পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে...।"[১০৫]

ইবনু কাসীর বলেন,

"আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার কসম করে বলছেন যে, রাসূল ﷺ-কে সব ব্যাপারে বিচারক না মানলে কেউ মুমিন হতে পারে না। তাই তাঁর সকল ফায়সালা সত্য। বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে মানতে হবে সেগুলো। তাই আল্লাহ্ বলেন, 'আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত তারা ঈমান এনেছে বলা যাবে না।' শুধু কাজেকর্মে মানলেই হবে না, অন্তরও এর প্রতি নিঃশঙ্ক হতে হবে। হাদীসে এসেছে,

'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। আমার আনীত বার্তার সাথে যার আকাঙ্ক্ষা-কামনা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে সত্যিকারের মুমিন নয়।'"[১০৬]

ইবনু কাসীরের ব্যাখ্যাটি দীর্ঘ পর্যালোচনা করেন শাইখ আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)। ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত শব্দ দ্ব্যর্থহীন, অর্থ একেবারেই স্পষ্ট, দীর্ঘ ব্যাখ্যার অমুখাপেক্ষী, ভুল ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য ঈমানের একটি শর্ত। কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কারও কাছে বিধান-বিচার চাইলে মুনাফিক হয়ে যায়। নিফাক হলো কুফরের নিকৃষ্টতম স্তর। তারপর আহমাদ শাকির বলেন,

"তারপর মহান রব তাঁর ঐশী ও পবিত্র সত্তার কসম করে বলেছেন, সব ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কাছে বিচার প্রার্থনা না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। সেই সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সিদ্ধান্তকে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে মেনে নিতে হবে। তা মানতে গিয়ে যত বিপদ আর কষ্টই ভোগ করতে হোক না কেন। তবে মুনাফিকদের মতো শুধু লোক দেখানো আনুগত্য যথেষ্ট নয়। অন্তরেও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকতে পারবে না। সমাজের চোখে ভালো দেখাতে বা শাসকের ক্ষমতার ভয়ে আনুগত্য করলে হবে না। এই শর্তগুলো যারা পূরণ করবে না, তারা গণ্য হবে

---

[১০৫] মুখতাসারুস সাওয়ায়িক, ২/৩৫২; আরও দেখুন ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ১/৫৪; তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৫৬২-৫৬৩, এখানে তিনি এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।

[১০৬] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ১/৫২০। এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল। জামিয়ুল উলূমি ওয়াল-হিকাম গ্রন্থে ইবনু রজব এ মত দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

কুফফার ও মুনাফিকীন হিসেবে...।”[১০৭]

তারপর বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর (মানবরচিত) আইনের প্রসঙ্গ এনে শাইখ আহমাদ শাকির বলেছেন, ইসলামের বদলে এসব আইনকেই তারা ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। এগুলোকে পবিত্র গণ্য করেছে। আলিমগণ শরীয়াহ বোঝাতে যেসব শব্দ ব্যবহার করেন, এসব সংবিধানকেও সেসব শব্দে অভিহিত করা হয়। যেমন: ফিকহ, তাশরী।

আহমাদ শাকির বলেন,

“এই নতুন ধর্ম ওই মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে যার ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলো বিচার-শাসন করে থাকে। এসব আইনের কিছু কিছু ধারা শরীয়াহর সাথে আংশিক মিলে গেলেও এ সবগুলোই বাতিল ও ইসলাম-বহির্ভূত। কারণ ওইসব মিল নিতান্ত কাকতাল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যের নিয়তে এগুলো তৈরি হয়নি। তাই মিল-অমিল থাকা সকল অংশই পথভ্রষ্টতা এবং জাহান্নামের পথ প্রশস্তকারী। মুসলিমদের জন্য এসব আইনের প্রতি আনুগত্য করা বা এগুলো মেনে নেওয়া জায়েয নেই।”[১০৮]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“আল্লাহ বলেছেন, সকল মতপার্থক্যের ফায়সালা যারা নবীজি ﷺ-এর কাছে অর্পণ করে না তাদের ঈমান নেই। না-বোধক শব্দের পুনরাবৃত্তি এবং শপথের দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে শর্তটিকে।

আল্লাহ বলেছেন, *কিন্তু না...*

কেবল বাহ্যিকভাবে বিচারের জন্য নবীজি ﷺ-এর কাছে এলে হবে না। যুক্ত করতে হবে অন্তরে কোনো ধরনের দ্বিধা বা প্রতিরোধের অনুপস্থিতিও। অর্থাৎ বাহ্যিক আনুগত্যই যথেষ্ট না, তার সাথে যোগ হতে হবে আন্তরিকতাও।

আল্লাহ বলেন,

‘কিন্তু না! আপনার প্রতিপালকের কসম। নিজেদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব নিরসনে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত তারা ঈমান এনেছে বলা যাবে না।’

আয়াতে উল্লেখিত হারাজ (এখানে ‘দ্বিধা’ হিসেবে অনূদিত) অর্থ অস্বস্তি। তাই রাসূল ﷺ -এর ফায়সালার প্রতি অন্তরকে দ্বিধাহীন ও অস্বস্তিমুক্ত রাখা চাই।

---

[১০৭] উমদাতুত তাফসীর, ৩/২১৪।

[১০৮] প্রাগুক্ত, ৩/২১৫।

Scanned by CamScanner

আবার এ দুটো শর্তেই শেষ নয়। এর সাথে যোগ করা হয়েছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের (তাসলীম) কথা। তাসলীম অর্থ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং যে বিষয়ে দ্বন্দ্ব তার প্রতি অন্তরের সব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে নবী ﷺ-এর ফায়সালার কাছে আত্মসমপর্ণ করা। এটিই হলো প্রকৃত বিচারের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পণ।

ক্রিয়া-বিশেষ্য 'তাসলীম' ব্যবহার করে এ বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এর প্রতি থাকতে হবে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ..."

শাইখ আরও বলেন,

"দ্বিতীয় আয়াতটির সার্বিক অর্থ নিয়েও ভাবুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিজেদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব নিরসনে...', আলিমদের মতে এর অর্থটি সার্বিক ও ব্যাপক। এখানে ছোট-বড় বিষয়ের কোনো পার্থক্য করা হয়নি।"[১০৯]

তাই এই আয়াত, এর শানে নুযূল ও আলিমদের ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এটি স্রেফ মনে মনে বিশ্বাস করার ব্যাপার নয়। কাজের ক্ষেত্রেও এর দাবি আছে। এই আয়াতের সতর্কতাবাণী শুধু তাদের জন্য না যাদের অন্তরের শরীয়াহর প্রতি কোনো সন্দেহ বা অপছন্দ আছে। যে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর আনীত বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে না, এই আয়াতের কঠিন হুমকির আওতায় সে পড়ে যাবে; অর্থাৎ সে মুমিন না।

৪। চতুর্থ আয়াত:

আল্লাহ্ বলেন,

"তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে; সেই সাথে মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল অদ্বিতীয় ইলাহ্ ছাড়া আর কারও উপাসনা না করতে। লা ইলাহা ইল্লা হু (তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসিত হওয়ার যোগ্য নয়)। তারা তাঁর যেসব অংশীদারের কথা বলে, তিনি সেসবের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে প্রশংসিত ও মহামহিম।" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩১]

সব মুফাসসির একটি ঘটনার আলোকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা নবী ﷺ-এর হাদীসে এসেছে এবং সালাফদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আত-তাবারী বলেন,

"'...আল্লাহর পাশাপাশি রব...' অর্থ এমনসব প্রভু, যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা সেগুলো হালাল

---

[১০৯] তাহকীমুল কাওয়ানীন, পৃ. ১-২; আরও দ্রষ্টব্য আদ্বওয়াউল বায়ান, ১/২৯৪।

Scanned by CamScanner

বানায়। আর হালালকে বানায় হারাম। মানুষ সেগুলো মেনেও চলে।”[১১০]

যে হাদীসের আলোকে এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে তা হলো আদি ইবনু হাতিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

> “একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন আমার গলায় একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, ‘আদি, এই প্রতিমা তোমার নিকট থেকে খুলে ফেলো।’ শুনলাম তিনি সূরা তাওবাহর এই আয়াত পাঠ করলেন,
>
> *‘তারা আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে...।’*
>
> আমি নবী ﷺ-এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আরজ করলাম যে, ইহুদি-নাসারারা তো নিজেদের আলিমদের কখনো ইবাদাত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে ‘রব’ বানিয়ে নিয়েছে?
>
> তিনি বললেন, এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদাত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলিমরা যা হালাল করেছে তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হলো তাদের ইবাদাত করা।”[১১১]

একাধিক সালাফের কাছ থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন আত-তাবারী, আল-খতীব আল-বাগদাদি, আস-সুয়ূতি প্রমুখ। এর মাঝে রয়েছে :

- হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা। তাঁকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, “ওরা কি তাদের পুজো করে?” তিনি বললেন, “না। কিন্তু

---

[১১০] তাফসিরুত তাবারি, ১৪/২০৯, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

[১১১] তিরমিযি, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আত-তাওবাহ অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৯৫। তিনি বলেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাসূত্র গরিব। শুধু আব্দুস সালাম ইবনু হারব এটি বর্ণনা করেছেন। আর গুতাইফ ইবনু আয়ুনের পরিচয় অজানা। ‘আতওয়া এবং আদ-দাআস সংস্করণে কথাটি আছে। আর ভারতীয় সংস্করণে (তুহফাতুল আহওয়াযির সাথে প্রকাশিত) হাদীসটিকে বলা হয়েছে হাসান গরিব, ৪/১১৭। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতে হাদীসটি হাসান। মাজমুউল ফাতাওয়ার আল-ঈমান অংশে তিনি এ রায় দেন (৭/৬৭)। আরও বলেন, “তিরমিযি ও অন্যরা এটি আদি থেকে বর্ণনা করেছেন।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৪৮)। এ ছাড়া আল-আলবানিও গায়াতুল মারাম গ্রন্থে হাসান বলেছেন এটিকে, হাদীস নং ৬। সহিহুত তিরমিযির মাকতাবুত তারবিয়াহ আল-আরাবি সংস্করণেও এটি আছে, হাদীস নং ৪৭১।

আদির হাদীসটির আরও কয়েকজন উল্লেখকারী ও গ্রন্থের নাম : আল-বাইহাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ১০/১১৬; আল-খতীব, আল-ফাকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ, ১/৬৬-৬৭; আত-তাবারি (একাধিক সূত্রে) ১৪/২০৯-২১১; আস-সুয়ূতি, আদ্দুররুল মানসূর, ৪/১৭৪, দারুল ফিকর সংস্করণ। বর্ণনাসূত্রটিকে অনেকেই হাসান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো হুযাইফা ও অন্যান্যদের থেকে আসা বর্ণনা, যা এই বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করে। এখানে ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই।

Scanned by CamScanner

তারা কিছুকে হালাল বানালে তারা সেটাকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করত, কিছুকে হারাম বানালে সেটাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করত।"

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "ওরা তাদের জন্য সিয়াম পালন করত না এবং তাদের কাছে দুআ করত না বটে। কিন্তু তারা কিছুকে হালাল বানালে তারা সেটাকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করত, কিছুকে হারাম বানালে সেটাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করত। আর এভাবেই ওরা তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।"[১১২]

- আর-রাবী ইবনু আনাস উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেন, "আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বনী ইসরাঈল যে তাদের পণ্ডিতদের রব বানিয়ে নিয়েছে, এটা কী রকম?' তিনি বললেন, 'তারা আসমানি কিতাবের আদেশ-নিষেধ জানার পরও বলত যে, পুরোহিতরা না বলা পর্যন্ত আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসব না। তারা যে আদেশ করবে তা মানবো, যা থেকে নিষেধ করবে তা মেনে চলব। এভাবে তারা আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ছুড়ে মেরে অনুসরণ করে মানুষের কথা।'"[১১৩]

এসব বর্ণনা সাহাবিগণের ব্যক্তিগত মত নয়। আদি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবীজি ﷺ-এর হাদীস অনুসারেই এগুলো উক্ত আয়াতের তাফসীর।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট হবে যদি এই নিচের আয়াতের ব্যাখ্যাও পাশাপাশি আলোচনা করা হয় :

"বলুন, 'হে আহলে কিতাব, এসো সেই বিষয়ের দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করি না, এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব মানি না।' এরপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে বলে দিন, 'সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম।'" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৬৪]

এখানে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু হলো '*..এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব মানি না...*'। সূরা আত-তাওবাহর ওই আয়াতটির মতো করেই এ আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

আত-তাবারী বলেন,

"রব মানার ব্যাপারটির অর্থ এখানে হলো অনুসারীরা নেতার নির্দেশ মেনে আল্লাহর অবাধ্যতা করা। এবং নেতাদের নিষেধাজ্ঞা মেনে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা। ঠিক আরেক আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, '...তারা আল্লাহর পাশাপাশি

---

[১১২] তাফসিরুত তাবারি, ১৪/২১১-২১৩; তাফসিরু আব্দির রাযযাক, ২/২৭২; সুনানুল বাইহাকি, ১০/১১৬; শুআবুল ঈমান, ৭/৪৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ; আল-খতীব, আল-ফাকীহ ওয়া-মুতাফাক্কিহ, ২/৬৭।

[১১৩] ইবনু তাইমিয়্যাহ, আল-ঈমান, পৃ. ৬৪; আত-তাবারি, ১৪/২১২।

Scanned by CamScanner

তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে...।'"[১১৪]

তারপর তিনি ইবনু জুরাইজের বক্তব্য উল্লেখ করেন,

> "আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব না মানার অর্থ আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের আনুগত্য করব না। বলা হয়ে থাকে, ইবাদাত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (আল্লাহর আদেশের বিপরীতে) তাদের নেতাদের আনুগত্য করাই তাদেরকে রব মানা। তাদেরকে পুজো করা এখানে কোনো শর্ত না।"[১১৫]

এ প্রসঙ্গে কুরতুবি বলেছেন,

> "আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব না মানা অর্থ, আল্লাহর দেয়া হারাম-হালাল পরিবর্তনে আমরা তাদের মানবো না। এটি এই আয়াতের মতোই '...তারা আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে...।' এই পণ্ডিতরা আল্লাহর দেয়া হালাল-হারামের বিধান পালটে ভিন্ন বিধান দিত। আর তাদের এসব কথার আনুগত্য করার মাধ্যমেই এদেরকে রবের মর্যাদা দিয়েছে অনুসারীরা।"[১১৬]

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশে লেখা নবীজি ﷺ-এর চিঠিতে এ আয়াতটির উদ্ধৃতি আছে, *"...এসো সেই বিষয়ের দিকে, যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে একই...।"* চিঠিটি সহিহুল বুখারিতে উল্লেখিত হয়েছে। আল-কাস্তাল্লানি তাঁর বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "অর্থাৎ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বলা হচ্ছে, 'এসো আমরা উযাইরকে (আলাইহিস সালাম) বা ঈসাকে (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর পুত্র না বলি; এসো পুরোহিতদের আবিষ্কৃত নতুন হালাল-হারামের বিধান না মানি। কারণ এরা সকলেই আমাদের মতো মানুষ।'"[১১৭]

এরপর দলিল হিসেবে তিনি আদি ইবনু হাতিমের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আল-আলুসি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "অর্থাৎ, আল্লাহর অবাধ্যতা করে একে অপরের আনুগত্য কোরো না।"[১১৮] তারপর তিরমিযি থেকে আদি ইবনু হাতিমের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বর্ণনাটিকে হাসান বলে রায় দেন তিনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সূরা আলে ইমরান ও আত-তাওবাহ থেকে উদ্ধৃত আয়াত দুটির

---

[১১৪] তাফসিরুত তাবারি, ৬/৪৮৮, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

[১১৫] প্রাগুক্ত। ইবনু আবি হাতিমও এটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, জুযয়ু আলি ইমরান, পৃ. ৩১৮, বর্ণনা নং, ৬৯৮।

[১১৬] তাফসিরুল কুরতুবি, ৪/১০৬।

[১১৭] ইরশাদুস সারি, ১/৮০।

[১১৮] রূহুল মাআনি, ৩/১৯৩, ২য় সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

সারকথা একই। রব হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সিজদাহ করা বা দুআ করা জরুরি না। অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে তাকে মান্য করা। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যে তাদের পুরোহিতদের প্রতি সিজদাহ করত না, তাদের কাছে দুআও করত না, সালাফগণ এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাযম তাই এ ব্যাপারে একটি সম্ভাব্য অভিযোগের খণ্ডন করেছেন এভাবে,

> "আপত্তি উঠতে পারে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তো নিজ মুখেই বলছে যে, তারা তাদের পুরোহিত-সন্ন্যাসীদের রব বলে মানে না। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের ব্যাপারে এটা বলতে পারি?
>
> সকল শক্তির মালিক আল্লাহর সাহায্যে এর জবাব এই:
>
> কোনটাকে কী নাম দেয়া হবে, তা আল্লাহর অধিকার। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যখন পুরোহিতরা যেটাকে হালাল-হারাম করল সেটাকে হালাল-হারাম হিসেবে গ্রহণ করল, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাদের ইবাদাত করল। একেই আল্লাহ নাম দিয়েছেন 'আল্লাহ ব্যতীত পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করা ও ইবাদাত করা'। এবং নিঃসন্দেহে তাদের এ কাজটি শিরক।"[১১৯]

ইবনু হাযমের কথাটিরই প্রতিধ্বনি করেছেন ইবনু কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে,

> "যাতে (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার। শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" [সূরা আল-আনআম, ৬:১২১]

তিরমিযি, আবু দাঊদ ও ইবনু মাজাহর সুনান গ্রন্থসমূহে এ আয়াতের শানে নুযূল সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং বর্ণনাসূত্র সহীহ। জবাই ছাড়া মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম ঘোষিত হলে মুশরিকরা হৈ হৈ করে ওঠে, "বাহ! নিজ হাতে মারলে খাওয়া যাবে। আর আল্লাহ যেটাকে মেরে ফেলেছেন, সেটা খাওয়া যাবে না?"[১২০]

আয়াতটির শানে নুযূল ও তাফসীর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর ইবনু কাসীর বলেন,

> "বলা হয়েছে, তাদের আনুগত্য করলে মুশরিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আল্লাহর দেয়া

---

[১১৯] ইবনু হাযম, আল-ফাসল, ৩/২৬৬, সম্পাদিত সংস্করণ।

[১২০] বিস্তারিত জানতে দেখুন : তাফসিরুত তাবারি, ১২/৭৬-৮৮, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত; তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/৩১৬-৩২২, আশ-শাব সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

আইন-বিধান ছেড়ে অন্যদের কথা মানা এবং অন্যদের আল্লাহর ওপর প্রাধান্য দেয়া শিরক। আরেক আয়াতে যেমন আছে '...তারা আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে...'।"[১২১]

এরপর যথারীতি আদি ইবনু হাতিমের সেই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তিনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলে ইমরান, আল-আনআম ও আত-তাওবাহ্ সূরাত্রয়ের তিনটি আয়াত পরস্পরের ব্যাখ্যা। গায়রুল্লাহর বিধান মানাকে তিন তিনটি আয়াতে শিরক বলা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

এ থেকেই বোঝা যায় বিষয়টির গুরুত্ব কেমন। আলিমগণ যে এ বিষয়টি এত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? এ আয়াতগুলোতে বর্ণিত পরিস্থিতির বিধান নিয়ে আলিমদের কিছু উক্তি আমরা এখন উল্লেখ করব।

আশ-শানকীতি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

"কুরআনের প্রদর্শিত পথই সঠিকতম পথ। আর এই কুরআনের নির্দেশ থেকেই জানা যায় যে, মানবজাতির সর্দার মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর আনীত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানের অনুসারীরা ভ্রান্ত। তাদের কাজটি মারাত্মক কুফর, যা তাদের ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কাফিররা একবার এসে নবীজি ﷺ-কে বলে, 'যখন সকালে উঠে দেখেন একটি ভেড়া মরে পড়ে আছে, তখন কে হত্যা করেছে একে?' নবীজি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ।' তারা বলে, 'তো আপনি নিজ হাতে জবাই করা গোশতকে বলেন হালাল, আর আল্লাহর হত্যা করা প্রাণীর গোশত হারাম। তার মানে কি আপনি আল্লাহর চেয়ে উত্তম?' তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন,

'(হে মুমিনগণ) যা কিছুর (মাংসের) ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি (জবাইয়ের সময়), তা খেয়ো না। নিশ্চই এ কাজটি ফিসক (পাপাচার ও আল্লাহর অবাধ্যতা)। আর শয়তানেরা (মানবজাতির মধ্যে) তাদের বন্ধুদের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠায় তোমাদের সাথে তর্ক করতে। তাদের আনুগত্য করলে (মৃত জীবের গোশত খাওয়াকে বৈধ করায়) অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে তোমরা।'[১২২]

'এটা করলে সেটা হবে', এ ধরনের বাক্যগুলো শর্তমূলক। আরবি বাক্যরীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশটি 'ফা' দিয়ে শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু '...করলে অবশ্যই

---

[১২১] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/৩২২, আশ-শাব সংস্করণ।

[১২২] দেখুন তাফসিরুত তাবারি এবং তাফসিরু ইবনি কাসীর থেকে এ আয়াত সংক্রান্ত অংশটুকু। আরও দ্রষ্টব্য সহিহুত তিরমিযি, মাকতাবুত তারবিয়াহ সংস্করণ, হাদীস নং ২৪৫৪; সহিহু সুনানি আবি দাউদ, হাদীস নং ২৪৪৪, ২৪৪৫।

Scanned by CamScanner

মুশরিক হয়ে যাবে...' আয়াতাংশে 'ফা' নেই। এ থেকে বোঝা যাছে যে, এটি শপথ। পূর্বে বর্ণিত শর্তের পূর্ণতা নয়, বরং নতুন আরেকটি বাক্য।

আল্লাহ্ শপথ করে বলছেন যে, শয়তানদের দেয়া হালাল-হারামের বিধান মান্যকারী মুশরিক। আর এই শিরক তাদের ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার করে দেয়...।"[১২৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ ব্যাপারে বলেন,

"কোনো শাসক হয়তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান জারি করে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যদি ওই শাসকের আইন মানে, তাহলে সে কাফির। সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির যোগ্য।"[১২৪]

পুরোহিত-সন্ন্যাসীর বিধান মান্যকারীদের ব্যাপারে বিধান আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ অন্যত্র বলেন,

"এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন,

'যখনই তাদের বলা হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন নিশ্চয় তারা অহংকার করত।' [সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:৩৫]

নিঃসন্দেহে এখানে ছোট-বড় উভয় প্রকার শিরকের কথা বলা হচ্ছে। এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া লোকেরাও এর অন্তর্ভুক্ত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সত্যিকার অর্থের একটি অংশ এটি। ইলাহ হলেন তিনি যিনি উপাসনার যোগ্য সত্তা। যত প্রকারে আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, সবগুলোই ইলাহ হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো না কোনো উপায়। তাই যারা কোনো একটি প্রকারে ইবাদাত করতে অস্বীকার করে, অন্য কারও আদেশ শোনে-মানে, তারা আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থও পুরোপুরি বোঝেনি, এর ওপর ঠিকমতো আমলও করেনি।

পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণকারীরা দুই প্রকার :

ক) একদল জানে যে, পুরোহিতরা রাসূল ﷺ -এর বার্তাকে বিকৃত করেছে। এবং তারা এই বিকৃতিতে তাদের অনুসরণ করেছে। তাদের ধর্মীয় নেতারা আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছে, জেনেও নবীদের আনীত দ্বীনের বিপরীতে তারা সেটা অনুসরণ করেছে, আনুগত্য করেছে। এটি কুফর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ একে শিরক বলেছেন। যদিও তারা পুরোহিতদের

[১২৩] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৩/৪৩৯-৪৪০।
[১২৪] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩৫/৩৭২।

Scanned by CamScanner

উপাসনা করেনি, তাদেরকে সিজদা করেনি। জেনেশুনে যারা এভাবে দ্বীনের বিরুদ্ধে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আদেশের বদলে অন্যথা বিশ্বাস করে, তারা সূরা তাওবাহর আয়াতে বর্ণিত লোকদের মতো মুশরিক।

খ) আরেকদল স্পষ্টভাবে বুঝত যে, তাদের পুরোহিতরা আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করছে।[১২৫] কিন্তু আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তারা পুরোহিতদের আনুগত্য করল। এদের অবস্থা ওই মুসলিমদের মতো যারা জেনেবুঝে গুনাহ করে। অতএব তারা গুনাহগার গণ্য হবে। যেমন সহিহুল বুখারিতে আছে যে, নবী ﷺ বলেন, 'আনুগত্য হবে শুধু যথাযথ ও সঠিক বিষয়ে...।'"[১২৬]

ইবনু তাইমিয়্যাহর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে। নিচে আমরা সেগুলো উল্লেখ করব। তবে তার আগে দুটি ব্যাপার বিশেষ আলোকপাতের দাবিদার :

প্রথমত, শাইখুল ইসলাম কিন্তু এখানে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা পুরোহিতদের কথা বলছেন না। বলছেন তাদের অনুসারীদের কথা।

আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী পুরোহিতরা নিঃসন্দেহে কুফফার। অনুসারীদের চেয়েও এদের কুফর মারাত্মক। তবে উল্লেখ্য যে, নিষ্ঠাবান আলিমের ভুল ইজতিহাদ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইবনু তাইমিয়্যাহ নিজেই বলছেন,

"আল্লাহভীতি ও রাসূল ﷺ -এর অনুসরণের নিয়ত নিয়ে কোনো মুজতাহিদ আলিম যদি হালাল-হারামের ব্যাপারে ভুল ফাতওয়া দেন, তাহলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দেবেন না। বরং রবের আনুগত্যের নিয়তের জন্য পুরস্কৃত করবেন তাঁকে।"[১২৭]

তারপর ওই মুজতাহিদের অনুসরণকারীদের ব্যাপারে তিনি বলেন,

"কিন্তু মুজতাহিদের ফাতওয়াটি রাসূল ﷺ -এর আদেশের বিপরীত, এটা জেনেও ভুল ফাতওয়াটির অনুসরণ করলে শিরকের দায় চলে আসবে। বিশেষত ওই অনুসারী যদি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণের সুবিধার্থে এমনটি করে। এটা শিরক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই আলিমগণ একমত যে, সত্য (সঠিক ফাতওয়া) জানা

---

[১২৫] কিতাবুল ঈমানের সংস্করণগুলোতে এভাবেই এসেছে। তাইসীরুল আযীযিল হাকীমেও রয়েছে ইবনু তাইমিয়্যাহর এই উদ্ধৃতি। অর্থাৎ, আল্লাহর দেওয়া বিধানকে আল্লাহর দেওয়া বলেই বিশ্বাস করে তারা। ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থে (আল-ওয়ালীদ আল-ফিরইয়ান সম্পাদিত) বলা হয়েছে, "হালাল-হারামের বিশ্বাস তাদের কাছে স্পষ্ট।" (১/২১৩)।

[১২৬] আল-ঈমান, পৃ. ৬৭, আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণ; মাজমুল ফাতাওয়া, ৭/৭০।

[১২৭] আল-ঈমান, পৃ. ৬৭; মাজমূউল ফাতাওয়া, ৭/৭১।

Scanned by CamScanner

থাকলে এর বিরুদ্ধাচরণে কারও অনুসরণ নাজায়েয..."[১২৮]

দলিল জেনেও ভুল ফাতওয়া অনুসরণ করা প্রসঙ্গে আলিমগণ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। যেমন: ইলামুল মুয়াক্কিয়িন গ্রন্থে ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ গ্রন্থে আল-খাতীব প্রমুখ। সূরা আত-তাওবাহর সেই আয়াত (পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ) ও আদি ইবনু হাতিমের বর্ণনাটি তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, পুরোহিতদের বাদ দিয়ে শাইখুল ইসলাম শুধু তাদের অনুসারীদের বিধান আলোচনা করেছেন। কারণ আল্লাহর বিধান বিকৃতিকারী পুরোহিতদের কুফর এতই স্পষ্ট যে, এ নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ইবনু তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতিতে পয়েন্ট খ-তে উল্লেখিত ব্যক্তিরা আল্লাহর দেয়া হালাল-হারামের বিধান জানে। অর্থাৎ, পুরোহিতদের বিধানকে তারা ভুল মনে করে এবং আল্লাহর বিধানকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে। পুরোহিতরা যখন হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে তখন তারা তাদের অনুসরণ করে না। বরং আল্লাহর বিধানকেই গ্রহণ করে। তবে বিশ্বাসের দিক থেকে সঠিক অবস্থানে থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে তারা এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। কাজেই আল্লাহর অবাধ্যতায় তারা পুরোহিতদের অনুসরণ করে। এরা কাফির নয়, শুধু পাপাচারী। যেমন : অনেক মুসলিম ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদ খাওয়াকে হারাম বলে বিশ্বাস করেও এসব পাপে লিপ্ত হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর স্পষ্ট আকীদাহ হলো, এরা কবীরা গুনাহগার; কাফির নয়। দুটোর মাঝে ব্যাপক পার্থক্য আছে।

ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্য, *'তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় পুরোহিতদের আনুগত্য করে...'*, এর অর্থ হলো, এটা একজন গুনাহগার মুসলিমের অবাধ্যতার মতো।

পুরোহিতরা আল্লাহর দ্বীনকে বদলে ফেলে। প্রথম শ্রেণির অনুসারীরা এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে। তাদের কথা গ্রহণ করে। তাই পুরোহিতদের মতোই তাদের ব্যাপারে হুকুম। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির অনুসারীরা আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে পুরোহিতরা যে পরিবর্তন আনে, সেটা গ্রহণ করে না। কিন্তু গুনাহ করার ক্ষেত্রে তারা অনুসরণ করে। কাজেই তা শিরক গণ্য হবে না।

---

[১২৮] প্রাগুক্ত।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

সূরা মায়িদাহ : প্রাসঙ্গিক আয়াত বিশ্লেষণ

আয়াতের উদ্ধৃতি

সূরা মায়িদাহর ৪১ থেকে ৫০ তম আয়াত আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক। এর সব ক'টিই একই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন-বিচার, এর বিরুদ্ধে সতর্কতা, ভ্রান্ত আহলে কিতাবদের আসমানি কিতাব বিকৃতি, কিতাব অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদেরকে অনুকরণ-অনুসরণের ফিতনা আলোচিত হয়েছে আয়াতগুলোতে।

আল্লাহ বলেছেন,

> "হে রাসূল, কুফরির ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। আর যারা ইহুদি, তারা মিথ্যা কথা শুনতে বিশেষ পারদর্শী, তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কান পেতে শোনে যারা তোমার নিকট (কখনো) আসেনি, এরা আল্লাহর কিতাবের শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থ হতে বিকৃত করে। তারা বলে, তোমরা এ রকম নির্দেশপ্রাপ্ত হলে মানবে, আর তা না হলে বর্জন করবে। বস্তুত আল্লাহই যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে তোমার কিছুই করার নেই। ওরা হলো সেসমস্ত লোক, যাদের অন্তরাত্মাকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখিরাতে আছে মহাশাস্তি।
>
> তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত। অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকো। আর যদি তুমি তাদের থেকে নির্লিপ্তই থাকো, তাহলে তাদের সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর যদি তুমি বিচার-মীমাংসা করো, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।
>
> এরা তোমাকে কীভাবে বিচারক মানতে পারে যখন তাদের মাঝেই তাওরাত

Scanned by CamScanner

বিদ্যমান আছে, তার ভেতর আল্লাহর বিধান আছে, এর পরেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত তারা মুমিনই নয়।

নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইহুদিদের জন্য ফায়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ এবং রব্বানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় কোরো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।

আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমের বদলে অনুরূপ জখম। কেউ ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই যালিম।

আর আমি তাদের পেছনে মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং (তা ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

ইনজিলের অনুসারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করা। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক।

আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে, আর তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াহ ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মাত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফায়সালা করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি

Scanned by CamScanner

তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক।

তারা কি জাহিলি যুগের বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী কওমের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানপ্রণেতা আর কে আছে?” [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪১-৫০]

উল্লিখিত আয়াতগুলোর কিছু অংশ বিশেষভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন :

আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]

যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই যালিম। [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৫]

যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক। [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৭]

এ আয়াতগুলো সম্পর্কে আলিমদের মন্তব্য আমরা এখানে আলোচনা করব। বিস্তারিত জানতে তাফসীরের গ্রন্থাদি দেখতে পারেন। দীর্ঘ এ আলোচনাটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

শানে নুযূল

আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে অনেকগুলো মত রয়েছে। এর মাঝে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য দুটি :

প্রথম মত

এই আয়াত নাযিল হয়েছে যিনাকারী দুই ইহুদির ব্যাপারে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

“ইহুদিরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বিচার দিলো, তাদের মধ্যকার দুজন নারী-পুরুষ ব্যভিচার করেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বললেন, ‘তাওরাতে রজমের ব্যাপারে কী বলা আছে?’

তারা জবাব দিলো, তাওরাতের বিধানমতে ব্যভিচারীদের অপমান করতে ও দোররা মারতে হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, ‘মিথ্যে কথা! তাওরাতের বিধান হলো রজম (পাথর মেরে হত্যা)।’

তারা তাওরাত এনে খুলে দেখাল। কিন্তু পাথর নিক্ষেপ সংক্রান্ত অংশটি এক ইহুদি হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। পড়ার সময়ও ওই অংশটি বাদ দিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, 'হাত ওঠাও।'

সে হাত সরাতেই দেখা গেল পাথর মারা সংক্রান্ত আয়াত।

তারা তখন বলল, 'উনি ঠিকই বলেছিলেন। হে মুহাম্মাদ, এই যে পাথর মারার বিধান।'

রাসূল ﷺ ওই দুই ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। লোকটাকে দেখলাম মহিলাটাকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোরও চেষ্টা করছিল।"

সহিহুল বুখারি, সহিহু মুসলিমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনাটি এসেছে।[১২৯] সহিহু মুসলিমের এক বর্ণনায় আল-বারা ইবনু আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"নবীজি ﷺ-এর কাছে দুজন ইহুদিকে আনা হলো। দুজনের চেহারায় কালি মাখা; চাবকানোও হয়েছে এদের।

তিনি ﷺ বললেন, 'তোমাদের কিতাবে কি এটাই ব্যভিচারের শাস্তি?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

নবী ﷺ তাদের এক আলিমকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'মুসার প্রতি তাওরাত অবতীর্ণকারীর কসম, আপনাদের কিতাবে এটাই কি ব্যভিচারের শাস্তি?'

তিনি বললেন, 'না। আপনি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস না করলে বলতাম না। তাওরাত অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা। কিন্তু একসময় আমাদের নেতারা ব্যাপকহারে ব্যভিচার শুরু করে। তাই নেতা পর্যায়ের কেউ এ অপরাধ করে ধরা পড়লে আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম। আর দুর্বল কেউ ধরা পড়লে ঠিকই শাস্তি দিতাম। একদিন কথা উঠল, এমন একটি শাস্তি ঠিক করা যাক, সবল-দুর্বল সবার ওপর যা প্রয়োগ করা যাবে। ঠিক হলো ব্যভিচারীদের দোররা মারা হবে এবং চেহারা কালো করে দেয়া হবে। এটিই পাথর নিক্ষেপের বিকল্প।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার যে বিধান তারা ছেড়ে দিয়েছে আমিই প্রথম তা পুনর্জীবিত করছি।' তিনি ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর মারার আদেশ দিলেন।

আর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

'হে রাসূল, কুফরির ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়...

---

[১২৯] সহীহ বুখারির বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, আল-জানায়িয, হাদীস নং ১৩২৯; আল-মানাকিব, হাদীস নং ৩৬৩৫; তাফসিরু সূরাতি আলি ইমরান, কুল ফাতু বিত-তাওরাতি ফাতলুহা অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫৫৬; আল-হুদুদ, রজম ফিল বালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৮১৯; আহকামু আহলিয যিম্মা, হাদীস নং ৬৮৪০, ৭৩৩২, ৭৪৫৩। মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, রাজমুল ইয়াহুদ অধ্যায়, হাদীস নং ১৬৯৯।

Scanned by CamScanner

তারা বলে, তোমরা এ রকম নির্দেশপ্রাপ্ত হলে মানবে, আর তা না হলে বর্জন করবে।'

ইহুদিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ দোররা মারা ও মুখে কালি মাখানোর আদেশ দিলে তারা মেনে নেবে, আর পাথর মারতে বললে মানবে না। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন,

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'

'যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই যালিম।'

'যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক।'

এগুলো সবই কাফিরদের ব্যাপারে নাযিলকৃত।"[১৩০]

এ হাদীসের আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এর অনেকগুলো আত-তাবারী ও ইবনু কাসীর তাঁদের তাফসীরদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন। ওপরে উল্লেখিত বর্ণনাগুলো থেকে আয়াতগুলোর শানে নুযূল স্পষ্টভাবে জানা যায়।

দ্বিতীয় মত

এই আয়াতগুলোর শানে নুযূল নিয়ে দ্বিতীয় মত হলো, দুই দল ইহুদির মাঝে রক্তপণ (দিয়াত) নিয়ে কলহ বাধে। বিজয়ী দল দুটি দাবি উত্থাপন করে এর যেকোনো একটি অপরপক্ষকে মানতে বলে। একেকজন মৃতের বদলে পরাজিত দল যে পরিমাণ অর্থ পাবে, বিজয়ী দল পাবে তার দ্বিগুণ হারে। অথবা বিজয়ী দলের প্রত্যেক নিহতের বিনিময়ে পরাজিত দলের একজন করে হত্যা করা হবে, আর পরাজিত দলটি তাদের নিহতদের বিনিময়ে শুধু রক্তপণ পাবে।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

"এই ঝগড়া হয় কুরাইযা আর নাযির গোত্রের মাঝে। নাযির গোত্রকে কুরাইযার চেয়ে উঁচু সামাজিক মর্যাদার ধরা হয়। তাই কুরাইযার কোনো সদস্য নাযিরের কোনো সদস্যকে হত্যা করলে বিনিময়ে সেও মৃত্যুদণ্ড পাবে। কিন্তু নাযির গোত্রের কোনো সদস্য কুরাইযা গোত্রের কাউকে হত্যা করলে রক্তপণ পরিশোধ করেই ছাড়া পেয়ে যাবে। রক্তপণের পরিমাণ এক শ ওয়াসক (মাপবিশেষ : ষাট সা) খেজুর। নবীজি

[১৩০] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, রাজমুল ইয়াহুদ অধ্যায়, হাদীস নং ১৭০০ ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

ﷺ-এর হিজরতের পর এ রকম এক রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। নাযিরের এক সদস্য হত্যা করে একজন কুরাইযিকে। কুরাইযা গোত্র দাবি করে, 'খুনিকে আমাদের হাতে তুলে দাও। তার মৃত্যুদণ্ড হবে।' নাযির সদস্যরা বলল, 'নবী এই মামলার বিচার করুক।' তারা মামলাটি নিয়ে নবীজি ﷺ-এর কাছে এল। তখন নাযিল হলো, 'আর যদি ফায়সালা করেন, তবে ন্যায়ানুগভাবে করুন।' ন্যায়বিচার মানে প্রাণের বদলে প্রাণ। তারপর এই আয়াতটি নাযিল হয়, 'তারা কি জাহিলি যুগের বিধান চায়?'"[১৩১]

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর আরেকটি বর্ণনা পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ থেকে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দিয়াতের পার্থক্যের কথাও এখানে এসেছে। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

"(সূরা মায়িদাহর এই) আয়াতগুলো (৪৪, ৪৫, ৪৭) আল্লাহ নাযিল করেছেন দুই দল ইহুদির ব্যাপারে। সেই জাহিলি যুগে এদের একটি দল অপরটিকে অধীনস্থ করেছিল। নিয়ম করা হয়, দুর্বল দলের কেউ শক্তিশালী দলের কাউকে হত্যা করলে এক শ ওয়াসক খেজুর রক্তপণ দেবে। আর এর উল্টোটা হলে রক্তপণের পরিমাণ পঞ্চাশ ওয়াসক।

নবীজি ﷺ-এর মদীনায় আগমনের আগ পর্যন্ত এ আইন বহাল থাকে। তিনি আসার পর উভয় দলই আগের সেই মর্যাদা হারানোর অনুভূতি বোধ করতে থাকে। এমন সময় দুর্বল দলের একজনের হাতে নিহত হয় সবল দলের এক ব্যক্তি। সবল দলটি যথারীতি বার্তা পাঠায় এক শ ওয়াসক পরিশোধ করার।

দুর্বল দল বলল, 'একই ধর্ম, একই বংশ, একই দেশ—এমন দুটি গোত্রের রক্তপণ কি একে অপরের অর্ধেক হওয়া সম্ভব কখনো? দুর্বল বলে তখন আমরা তোমাদের চাপিয়ে দেয়া ওই আইন মেনে নিয়েছিলাম। মুহাম্মাদ যখন চলে এসেছেন, তাই সেই পুরাতন চুক্তি আমরা আর মানছি না।'

বচসা হতে হতে প্রায় যুদ্ধ বেধে যাওয়ার জোগাড়। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধ্যস্থতাকারী মানতে রাজি হয়।

কিন্তু সবল দলের কিছু ব্যক্তি বেঁকে বসে। তারা বলে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ কিছুতেই এই আমাদের এই অসম আইনকে সমর্থন দেবেন না। আর ওদের কথা তো ঠিকই। দুর্বল ছিল বলেই আমাদের করা নিয়মটা তারা মেনে নিয়েছিল। এক

---

[১৩১] সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, আন-নাফস বিন নাফস অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪৯৪; সহিহু সুনানি আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭২; সুনানুন নাসায়ি, কিতাবুল কাসামাহ, তাওয়ীলু কাওলিহি তাআলা 'ওয়া ইন হাকামতা ফাহকুম বাইনাহুম বিল-কিস্ত' অধ্যায়, ৮/১৮; সহিহু সুনানিন নাসায়ি, হাদীস নং ৪৪১০।

Scanned by CamScanner

কাজ করুন। মুহাম্মাদের কাছে ছদ্মবেশী কাউকে পাঠিয়ে আগে তার মতামতটা জেনে নিন। তাঁর মতামত যদি আমাদের চাহিদার অনুরূপ হয়, তাহলে মানবো। আর ভিন্ন রকম হলে সাবধান হয়ে যেতে হবে।' এই কাজের জন্য তারা কিছু মুনাফিককে নিয়োগ দেয়।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের আসল উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন। আর আয়াত নাযিল করেন,

'হে রাসূল, কুফরির ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়... যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক।'

আল্লাহর কসম, এখানে ওই দুদলের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি।"[১৩২]

ওপরে উল্লেখিত দুটি মতই যদি সঠিক হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, এই দুই ঘটনা একই সময়কালে সংঘটিত হয়েছিল। আয়াতগুলো এই দুই প্রেক্ষাপটের জন্যই অবতীর্ণ। এটি ইবনু কাসীরের মত।[১৩৩] আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূল সম্পর্কে আরও কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু সেগুলোর সূত্র হয় যইফ (দুর্বল), নয়তো ওপরের দুটি মতের মতোই প্রায়।

যেমন আবু লুবাবা ও বনু কুরাইযা সংক্রান্ত একটি যইফ বর্ণনা আছে। আবার মুরতাদ ইহুদি আব্দুল্লাহ ইবনু সূরাইয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনার বর্ণনা আছে যা আগের দুটি মতের কাছাকাছি। আরেকটি মত আছে যে, আয়াতগুলো মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

ওপরের পর্যালোচনা থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায়, তা হলো :

১। ইহুদিদের কলহের ঘটনার সাথে আয়াতের মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা একদমই স্পষ্ট। তারা তাওরাতের বাক্য এদিক-সেদিক করেছিল, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচারের জন্যও এসেছিল। তাই শানে নুযূল সংক্রান্ত যেসব বর্ণনায় ইহুদিদের উল্লেখ নেই, সেগুলো সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

২। আয়াতগুলোতে ইহুদি এবং তাদের মুনাফিক মিত্রদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর নাযিল করা শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যারা বিচার করে তারা কুফর, ফিসকের এবং যুলুমের দোষে দোষী। পাশাপাশি

---

[১৩২] মুসনাদু আহমাদ, ১/২৪৬, আহমাদ শাকিরের মতে সহীহ, হাদীস নং ২২১২; সহীহ সুনানিন নাসায়ি, হাদীস নং ৪৪১১; ইবনু জারীর, ১০/৩২৬, আহমাদ শাকির সম্পাদিত, বর্ণনা নং ১১৯৭৪।

[১৩৩] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/১১০, আশ-শাব সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করার জন্য। ইহুদিরা আল্লাহর একটি বিধানের বদলে নিজেদের বানানো বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করছিল। ঠিক এই বিষয়টিকেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উন্মোচিত করেছেন।

এখন তারা ব্যভিচারের শাস্তি বা রক্তপণ সংক্রান্ত বিধান বদলাক—মূল কথা একই, আর তা হলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার। স্থানকাল-নির্বিশেষে এই আয়াতগুলো তাই এমন যেকোনো প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যা ইহুদিদের এ আচরণের সাথে মেলে।

৩। আল্লাহর আইনবিরোধী কোনো বিষয়ে একাধিক পক্ষ একমত হলেই সেটা জায়েয হয়ে যায় না। অনেকেই এ ব্যাপারটিতে ভুল করে থাকেন।

৪। ইহুদি ও মুনাফিকদের আঁতাত বড় গভীর। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নানা কূটবুদ্ধি দিয়ে ইসলামের আইন লঙ্ঘনে দুদলই সেয়ানে সেয়ান। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, তাদের মাঝে এ বৈশিষ্ট্য ছিল সকল যুগে সকল সময়ে।

৫। আল-বারা ইবনু আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "আয়াতগুলো সকল কাফিরের ব্যাপারে নাযিলকৃত।" পরবর্তী পরিচ্ছেদে এটি বিস্তারিত আলোচিত হবে ইন শা আল্লাহ।

আয়াতে কাদের কথা বলা হচ্ছে? আয়াতের প্রসঙ্গ ও অর্থ কি সাধারণ নাকি নির্দিষ্ট?

এখানে আমাদের মূল আলোচনা ৪৪ থেকে ৪৭তম আয়াত নিয়ে :

"আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফির... যালিম... ফাসিক।"

এ ব্যাপারে সালাফগণের (রাহিমাহুমুল্লাহ) অসংখ্য মত আছে। কয়েকজনের মত উল্লেখ করে আমরা মতপার্থক্যগুলোর পর্যালোচনা করব। আল্লাহ আমাদের সামর্থ্য দিন।

সালাফগণের মত

এ ব্যাপারে সালাফদের কাছ থেকে পাওয়া মতগুলো নিম্নরূপ :

১। একটি মত হলো আয়াতগুলোতে শুধু ইহুদিদের কথা বলা হচ্ছে। কারণ তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছিল এবং তার পরিবর্তন করেছিল।

আল-বারা ইবনু আযিবের উক্তি থেকে এ মত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

Scanned by CamScanner

"আয়াতগুলো কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।"[১৩৪]

আবু সালিহ বলেন,

"সূরা আল-মায়িদাহর ওই তিনটি আয়াতে (৪৪, ৪৫, ৪৭) মুসলিমদের কথা বলাই হয়নি, সব ক'টিই কাফিরদের ব্যাপারে।"[১৩৫]

আয-যাহহাক বলেছেন,

"আয়াতগুলো আহলে কিতাব সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ।"[১৩৬]

আবু মিজলায বলেন,

"এগুলো ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত।"[১৩৭]

'ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে,

"আয়াতগুলো আহলে কিতাবের ব্যাপারে।"[১৩৮]

কাতাদা বলেন,

"আমাদের বলা হয়েছে যে, এ আয়াতগুলো এক নিহত ইহুদির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ।"[১৩৯]

নিহত এক ইহুদিকে নিয়ে কুরাইযা ও নাযির গোত্রের কলহের কথা আমরা ওপরে বলেছি। এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি উতবা ইবনি মাসঊদ। তারপর বলেন,

এখানে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। আয়াতগুলো তাদের ব্যাপারেই নাযিলকৃত।[১৪০]

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও একই বর্ণনা আছে।[১৪১] প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। বর্ণিত আছে যে, "...*তারাই কাফির।*" আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"বনী ইসরাঈল তোমাদের ভাই হিসেবে কতই-না ভালো! সব মিষ্টি জিনিসগুলো

---

[১৩৪] ওপরে উল্লেখিত। আরও দেখুন তাফসিরুত তাবারি, ১/৩৪৬, ৩৫১, ৩৫২, বর্ণনা নং ১২০২২, ১২০৩৪, ১২০৩৬।

[১৩৫] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৪৬, বর্ণনা নং ১২০২৩।

[১৩৬] প্রাগুক্ত, ১০/৩৪৭, বর্ণনা নং ১২০২৮।

[১৩৭] প্রাগুক্ত, ১০/৩৪৭, বর্ণনা নং ১২০২৫, ১২০২৬।

[১৩৮] প্রাগুক্ত, ১০/৩৫১, বর্ণনা নং ১২০৩১, ১২০৩৩।

[১৩৯] প্রাগুক্ত, ১০/৩৫১, বর্ণনা নং ১২০৩২।

[১৪০] প্রাগুক্ত, ১০/৩৫২, বর্ণনা নং ১২০৩৭।

[১৪১] আদ্দুররুল মানসুর, ৩/৮৭-৮৮, এখানে তাঁর দুটি বর্ণনা আছে। একটাতে বলা হয়েছে যে, আয়াতগুলো বিশেষত ইহুদিদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ।

Scanned by CamScanner

(প্রশংসাবাক্য) তোমাদের জন্য, তো তিক্তগুলো (অভিযোগ) তাদের জন্য। একদিন ঠিকই তোমরা পদে পদে ওদের অনুকরণ শুরু করবে।"[১৪২]

এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আয়াতগুলো শুধু বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে অবতীর্ণ। এ মতের সমর্থকগণ দলিল পেশ করেন,

"পবিত্র কুরআন থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটি ইহুদিদের ব্যাপারে। কারণ আগের আয়াতে তাদের কিতাব-বিকৃতি আর সেই বিকৃত বিধান মানার আগ্রহের কথা এসেছে। ইহুদিরা বলেছিল যদি (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) বিচারে তাদের তৈরি বিকৃত বিধানের ফায়সালা পাওয়া যায়, তাহলে যেন মেনে নেয়া হয়। কিন্তু যদি আল্লাহর নাযিল করা প্রকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা হয়, তাহলে তারা মানবে না। আল্লাহর দেয়া সত্য বিধান কোনটা, তা জেনেশুনেই তা মানার ব্যাপারে পরস্পরকে তারা সতর্ক করছিল। তারপর আল্লাহ বলেছেন, 'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।' এ থেকেও বোঝা যায় যে, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে।"[১৪৩]

আয-যাজ্জাজ এই মতের সমর্থনে বলেন,

"এ সম্পর্কে আশ-শাবির মতটি শ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'এটি বিশেষভাবে ইহুদিদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ।'[১৪৪] তাঁর কথার প্রমাণ তিনটি।

প্রথমত, একটু আগেই আয়াতে ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে '*লিল্লাযিনা হাদু*' (ইহুদিদের জন্য)। তাই সর্বনামটি দিয়ে তাদেরই বোঝানোর কথা।

দ্বিতীয়ত, আয়াতটির প্রসঙ্গ ইহুদি সংক্রান্ত। কারণ পরের আয়াতে আছে, 'আমি তাদের জন্য লিখে দিয়েছি...' এই সর্বনামটিও আলিমদের ঐকমত্যে ইহুদিদের বোঝাচ্ছে।

আর রজম (পাথর নিক্ষেপ) ও কিসাসের বিধান অস্বীকারকারীও এই ইহুদিরাই।"[১৪৫]

এরপর কিছু আপত্তি উদ্ধৃত করে আয-যাজ্জাজ সেগুলোর জবাব দেন।

এই আয়াতগুলো আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কুফফারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আত-তাবারীও এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর বলেছেন,

---

[১৪২] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৪৯-৩৫০, বর্ণনা নং ১২০২৭, ১২০২৯, ১২০৩০; তাফসিরু আব্দির-রাযযাক, ১/১৯১।

[১৪৩] আদ্বওয়াউলবায়ান, ২/৯০।

[১৪৪] আশ-শাবির মত হিসেবে আয-যাজ্জাজের উদ্ধৃতি এটি। নিচে আশ-শাবির আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিপরীত।

[১৪৫] ইরাবুল কুরআন, ২/২১-২২, বৈরুত সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

আয়াতের অর্থ সার্বিক ও ব্যাপক। (আল্লাহর বিধান) অস্বীকারকারী প্রত্যেকের ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য।[১৪৬]

২। সালাফগণের আরেক অংশের মতে 'কাফিরূন' বলতে মুসলিমদের, 'যালিমূন' বলতে ইহুদিদের এবং 'ফাসিকূন' বলতে খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে।

এ মতের একজন সমর্থক আশ-শাবি। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

"একটি আয়াত আমাদের উদ্দেশ্যে, বাকি দুটি আহলে কিতাবের ব্যাপারে। যালিমূন ও ফাসিকূন উল্লেখ করা আয়াত দুটি আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে।"

তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি ব্যাখ্যায় এসেছে,

"প্রথম আয়াতটি মুসলিমদের উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়টি ইহুদিদের, এবং তৃতীয়টি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে।"[১৪৭]

আবু বকর ইবনুল আরাবি এ মতের সমর্থনে বলেন,

"কারও মতে 'কাফিরূন' অর্থ মুশরিক, 'যালিমূন' অর্থ ইহুদি এবং 'ফাসিকূন' অর্থ খ্রিষ্টান। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বিবেচনায় আমার মতও এটিই। ইবনু আব্বাস, জাবির, ইবনু আবি যাইদা, এবং ইবনু শুবরুমাহও এ মত দিয়েছেন।"[১৪৮]

আশ-শানকীতিও এ মতটিকে সঠিকতর মানেন। তিনি বলেছেন,

"আয়াতের আপাত অর্থ থেকে মনে হয়, 'তারাই কাফির' বলতে মুসলিমদের বোঝানো হচ্ছে। কারণ এর আগে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন,

'সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় কোরো না।'

এর পরই বলা হয়েছে,

'যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'

তাই এখানে উদ্দিষ্ট শ্রোতা মুসলিমরা। আয়াতের প্রেক্ষাপট ও আপাত অর্থ থেকে তা-ই মনে হয়। আর উল্লেখিত কুফরের ধরন ছোট বা বড় উভয়ই হতে পারে। কেউ যদি জেনেশুনে আল্লাহর বিধান অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা একে হালাল মনে করে, তাহলে তা বড় কুফর। আর আল্লাহর বিধান স্বীকার করেও কামনা-

---

[১৪৬] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৫৮।

[১৪৭] প্রাগুক্ত, ১০/৩৫৩-৩৫৫, বর্ণনা নং ১২০৩৮-১২০৪৬।

[১৪৮] আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি, ২/৬২১।

Scanned by CamScanner

বাসনার চাপে এর বিরোধী কাজকর্ম করলে গুনাহগার মুসলিম।

আয়াতের প্রসঙ্গ থেকেও এটাও বোঝা যায় যে, যালিমূন বলতে ইহুদিদের বোঝানো হচ্ছে। কারণ এর আগেই আল্লাহ বলেছেন,

'আমি তাদের জন্য তাতে (এই গ্রন্থে) বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমের বদলে অনুরূপ জখম। কেউ ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।'

আর ফাসিকূন বলতে খ্রিষ্টানরা উদ্দেশ্য। কারণ এর আগের আয়াতাংশ, 'ইনজিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করা।'"[১৪৯]

এরপর কুফর, যুলম ও ফিসকের ব্যাখ্যায় আশ-শানকীতি বলেছেন, এর প্রত্যেকটিই দুই প্রকারের : ছোট ও বড়। তারপর বলেন,

"এখানে শব্দগুলোর সাধারণ অর্থ বিবেচ্য, আয়াত নাযিলের বিশেষ প্রেক্ষাপট নয়। ওপরে আমি নিজের মত দিয়েছি। আল্লাহই ভালো জানেন।"[১৫০]

৩। আরেকটি মত হলো, আয়াতে ছোট কুফর, ছোট যুলম ও ছোট ফিসকের কথা বলা হয়েছে।

এই মতের ভিত্তি হচ্ছে আয়াতটিকে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বলে ধরে নেয়া। উম্মাহর মহান আলিম ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে কয়েকটি বর্ণনাসূত্রে এই মতটি বর্ণিত। এই সূত্রগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে, সবগুলো একত্রে বিবেচনা করলে বর্ণনাটি সহীহ।[১৫১]

---

[১৪৯] আদ্বওয়াউল বায়ান, ২/৯২।

[১৫০] প্রাগুক্ত, ২/৯৩।

[১৫১] আমাদের মতে এটি সঠিকতম মত। কেউ কেউ এই বর্ণনাসূত্রকে যইফ আখ্যা দেন, তা জানা আছে। এ সকল সমালোচনার প্রতি আমাদের জবাব :

১. ইবনু আবি তালহা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় অস্বীকারকারী কাফির। আর যে তা স্বীকার করেও সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, সে যালিম ও ফাসিক।" এই বর্ণনাসূত্রে থাকা আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ হলেন আল-লাইসের অনুলেখক। তাঁকে কেউ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), কেউ যইফ (দুর্বল) বর্ণনাকারী বলেছেন। ইবনু হাজার এ ব্যাপারে বলেন, "তিনি সাদূক, তবে প্রচুর ভুল করেন। বই থেকে পড়ার সময় তিনি সাবিত। কিন্তু মাঝে মাঝে

Scanned by CamScanner

আবার অনিশ্চিতও থাকেন।"

২. সুফইয়ান এক ব্যক্তি থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "এমন কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না।" এই বর্ণনাসূত্রে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী থাকায় এটি যইফ। একই শব্দে বর্ণনাটি তাউস থেকেও এসেছে। সায়িদ আল-মাক্কি থেকে সবলতর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন তিনি।

৩. আরেকটি বর্ণনা : "তারা যে কুফর ভাবছে, এটি সেটি নয়।" আরেক সংস্করণে আছে, "তারা যে কুফর ভাবছে, এটি তা নয়। এই কুফর মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসন করে না, তারাই কাফির' আয়াতটিতে ছোট কুফরের কথা বলা হচ্ছে।"

হিশাম ইবনু হুজাইরের মাধ্যমে বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস থেকে এসেছে। তিনি সিকাহ, না যইফ তা নিয়ে মতভেদ আছে। সিকাহ বলে গণ্যকারী কয়েকজন হলেন আল-ইজলি, ইবনু হিব্বান (আস-সিকাত গ্রন্থে) ও ইবনু শাহীন।

আর যইফ গণ্যকারীদের একজন ইমাম আহমাদ। তিনি বলেন, "ইনি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন যে, তিনি খুবই যইফ ।" ইয়াহইয়া আল-কাত্তানও তাঁকে যইফ বলেছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, যইফ গণ্যকারীরা ইলমের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। তাই ইবনু হাজার বলেন, "তিনি সাদূক (নিষ্ঠাবান) কিন্তু তার অনেক ভুল আছে।" সহিহুল বুখারির যেসব রাবিকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়েছে হাদয়ুস সারি'তে ইবনু হাজার তাদের মধ্যে তাঁরও নাম নিয়ে এসে বলেন, "আল-ইজলি ও ইবনু সাদ তাঁকে সিকাহ বলেছেন। অপরদিকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন যইফ।" আবু জাফার আল-উকাইলি তাঁকে যইফের তালিকায় রেখেছেন এবং সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, "অন্য কোথাও পাওয়া যায়, এমন তথ্য তাঁর কাছ থেকে নিই না আমরা।" (হাদয়ুস সারি, ৪৪৭-৪৪৮, সালাফিয়্যাহ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ।)

দেখুন : তাহযীবুল কামাল, ৬৫৭১ (৩০/১৭৯, সম্পাদক : বাশশার আওয়াদ মারুফ)

হিশাম ইবনু হুজাইর কিন্তু বুখারি-মুসলিমের বর্ণনাকারী। তারপরও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা হয় শুধু অন্য বর্ণনার নিশ্চিতকরণ হিসেবে।

৪. সুফইয়ান ইবনু মুআম্মার ইবনি রাশিদ বর্ণনা করেন ইবনু তাউস থেকে, তিনি তাঁর বাবার থেকে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার না করা সম্পর্কে ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এটি কুফর।"

ইবনু তাউস বলেন, "তবে এটি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করার মতো কুফর নয়।" আরেক বর্ণনায় ইবনু তাউসের এ কথাটি ইবনু আব্বাসের উক্তি হিসেবে সংযুক্ত আছে। বলা হয়ে থাকে যে, প্রথম বর্ণনাটিই বিশুদ্ধতর। পরের কথাটি ইবনু তাউসের মন্তব্য হয়ে থাকবে।

এ বর্ণনাগুলোর খণ্ডনের সারাংশ এটিই। কিন্তু আমাদের মতে ইবনু আব্বাসের সূত্রে আসা এ বর্ণনাগুলো তিনটি কারণে নির্ভরযোগ্য :

ক) সুফইয়ান, মা'মার, ইবনু তাউস ও তাঁর বাবার সমন্বয়ে গঠিত বর্ণনাসূত্রটি সহীহ। এ নিয়ে কেউ অভিযোগ তোলেননি।

খ) যতগুলো সূত্রে বর্ণনাটি এসেছে, সবগুলোকে একসাথে ধরলেও অন্তত সহীহ হয় বর্ণনাটি।

গ) প্রায় সকল আলিম এ আয়াতগুলো আলোচনার সময় ইবনু আব্বাসের উক্তিটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

Scanned by CamScanner

কয়েকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি:

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

> "'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' এটি কুফর। তবে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করার মতো কুফর নয়।"

তিনি বলেন,

> "...এমন কুফর, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না।"

ইবনু তাঊস তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন,

> "এক লোক ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে (আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে 'এ রকম যারা করে, তারা কি কুফরে লিপ্ত?' ইবনু আব্বাস বললেন, 'এমনটা করা কুফর। কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাত অস্বীকারকারীদের মতো নয়।'"

ইবনু তাঊস থেকে বর্ণিত আছে তাঁর বাবা বলেন,

> "ইবনু আব্বাসকে (আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এটি কুফর।'"

ইবনু তাঊস বলেন,

> "তবে এটি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করার মতো কুফর নয়।"

তাঊস থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনু আব্বাস আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন,

> "তারা যে কুফরের কথা ভাবছে, এটি সেটি নয়।"

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তিটি এভাবেও বর্ণিত আছে,

> "তারা যে কুফরের কথা ভাবছে, এটি সেটি নয়। এটি ওই কুফর নয় যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। (আলোচ্য আয়াতটি উদ্ধৃত করার পর বলেন) এটি ছোট কুফর।"

কোনো কোনো বর্ণনায় আরও আছে,

> "...ছোট যুলম এবং ছোট ফিসক।"[১৫২]

তাই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, ইবনু আব্বাস থেকে আসা বর্ণনাটি শুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

[১৫২] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৫৫-৩৫৬; তাযীমু কাদরিস সালাহ, ২/২৫১, বর্ণনা নং ৫৬৯-৫৭৫। আরও দেখুন আদ্দুররুল মানসূর, ৩/৮৭-৮৮, দারুল ফিকর বৈরুত সংস্করণ। দেখুন আল-

Scanned by CamScanner

'আতা থেকেও এ মতটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

"ছোট কুফর, ছোট যুলম এবং ছোট ফিসক।"[১৫৩]

আরও বর্ণিত আছে যে, তাঊস বলেছেন,

"এটি সেই কুফর নয়, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।"[১৫৪]

৪। আরেকটি মত হলো, আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে যারা এ দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির। আর যারা শরীয়াহ (ইসলামী আইন) বিশ্বাস করে কিন্তু সে অনুযায়ী শাসন করে না, তারা যালিমূন ও ফাসিকূন।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যানকারী কাফির। আর যে তা স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী শাসন-বিচার করে না, সে যালিম ও ফাসিক।"[১৫৫]

অনেক মুফাসসির এ মতটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহর আইন অস্বীকার করলেই কেবল ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে; অন্যথায় না।

৫। আরেকটি মত হলো, আয়াতটি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হলেও এর উদ্দেশ্য মুসলিম-কুফফার নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফার এই উক্তি থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়, "বনী ইসরাঈল তোমাদের ভাই হিসেবে কতই-না ভালো! সব মিষ্টি জিনিসগুলো (প্রশংসাবাক্য) তোমাদের জন্য, তো তিক্তগুলো (অভিযোগ) তাদের জন্য। একদিন ঠিকই তোমরা পদে পদে ওদের অনুকরণ শুরু করবে।"[১৫৬]

ইবরাহীম আন-নাখায়ির মতও এ রকম। তিনি বলেন,

"এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে। তবে আল্লাহ এতে

কাওলুল মামুন ফি তাখরীজি মা ওয়ারাদা আন ইবনি আব্বাস ফি তাফসিরি 'ওয়ামাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফা উলাইকা হুমুল কাফিরূন', আলি হাসান আব্দুল হামীদ। এ বইয়ে ও তাযীমু কাদরিস সালাহ বইয়ের পাদটীকায় বর্ণনাসূত্রগুলোর শুদ্ধতা যাচাইয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

[১৫৩] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৫৫।

[১৫৪] প্রাগুক্ত, ১০/৩৫৬; তাফসিরু আব্দির-রায্যাক, ১/১৯১।

[১৫৫] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬৩। ইকরিমা থেকেও বর্ণিত আছে এটি, দেখুন তাফসিরুল বাগাওয়ি, ৩/৬১।

[১৫৬] তাফসিরুত তাবারি, ১০/৩৪৯-৩৫০, বর্ণনা নং ১২০২৭, ১২০২৯, ১২০৩০; তাফসিরু আব্দির রাযযাক, ১/১৯১। এ ছাড়াও আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৩১২-৩১৩, তিনি বলেন, "বুখারি-মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।" ইমাম আয-যাহাবি একমত।

Scanned by CamScanner

মুসলিম উম্মাহকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।”[১৫৭]

আল-হাসান থেকেও বর্ণিত আছে,

“এটি ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য।”[১৫৮]

ইবনু মাসঊদের মাধ্যমে আসা (সাহাবিগণের) কিছু বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় যে, আয়াতগুলোর অর্থ সার্বিকভাবে প্রযোজ্য।

আলক্বামাহ এবং মাসরুক থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ইবনু মাসঊদকে ঘুষের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন, “এটি হারাম।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৬২-৬৩ অনুযায়ী)

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, “আর বিচারককে ঘুষ দেয়া?” ইবনু মাস’ঊদ জবাব দেন, “সেটা কুফর।” এরপর তিলাওয়াত করেন, *“আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।”*[১৫৯]

আস-সুদ্দি বলেছেন,

“(আয়াতটি উদ্ধৃত করার পর...) আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানমতে যে ফায়সালা দেয় না, স্বেচ্ছায় একে অবহেলা করে, জেনেশুনে অন্যায্য রায় দেয়, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।”[১৬০]

৬। আরেকটি মত হলো, আয়াতটিকে এর আপাত অর্থের চেয়ে ভিন্নভাবে একে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে *‘আল্লাহর নাযিলকৃত...’* বলতে তাওহীদসহ ইসলামের সব বিধানকে একসাথে বোঝানো হচ্ছে। এ মতটি বর্ণিত হয়েছে ‘আব্দু আযীয আল-কিনানি থেকে। আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

“এখানে কিছু নির্দিষ্ট আইন নয়, বরং আল্লাহর নাযিল করা সবকিছুর কথা বলা হচ্ছে। যে-ই এগুলো দিয়ে বিচার করে না, সে-ই কাফির, যালিম, ফাসিক। আর যে তাওহীদ ও শিরকের ব্যাপারে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার করে, কিন্তু আল্লাহর অন্যান্য আইন দিয়ে বিচার করে না, তার ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য

---

[১৫৭] তাফসিরু আব্দির রায্যাক, ১/১৯১; আত-তাবারি, ১০/৩৫৬-৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৫৮, ১২০৫৯; আদ্দুররুল মানসূর, ৩/৮৭, দারুল ফিকর সংস্করণ।

[১৫৮] আত-তাবারি, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬০; আদ্দুররুল মানসূর, ৩/৮৮।

[১৫৯] আত-তাবারি, ১০/৩২১, বর্ণনা নং ১১৯৬০, ১১৯৬৩, এ ছাড়াও ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬১।

[১৬০] আত-তাবারি, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬২।

Scanned by CamScanner

নয়।"[১৬১]

৭। আরেকটি মত অনুযায়ী, নুসুসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আল্লাহর কোনো আইন ইচ্ছেকৃতভাবে যে অস্বীকার করে, আয়াতগুলো তার ব্যাপারে প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট কোনো বিধানের ব্যাপারে অনিশ্চিত বা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভুল করা ব্যক্তিরা এর আওতার বাইরে।[১৬২]

আয-যাজ্জাজ বলেছেন,

> "(আয়াতের উদ্ধৃতির পর...) এর অর্থ, নবীগণের আনীত আল্লাহর কোনো বিধানকে অকার্যকর দাবিকারী ব্যক্তি কাফির। যে বলবে স্বাধীন বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মারতে হবে না, ফকীহগণের ঐকমত্যে সে কাফির। এটা হলো নবীর কোনো বিধানকে অস্বীকার করার কুফর, নবীর বিধানকে অস্বীকার করা নবীকে অস্বীকার করার শামিল। আর নবীকে অস্বীকার করা কুফর।"[১৬৩]

৮। খারিজিরা বলে, এটি এমন কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। তারা সাধারণভাবে সকল বিধানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য মনে করে।

এটি হারুরিয়্যাহদের মতো প্রাচীন খারিজি এবং ইবাদিয়্যাহদের মতো পরবর্তী খারিজিদের বেলায় সত্য। 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে তাদের অভিমত তাদের এই অবস্থানের উদাহরণ। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুজন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় তারা মনে করে, এটি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধাচার তথা কুফর।

আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতার ব্যাপারে বিভিন্ন মত আমরা দেখলাম। এখন মতগুলোর পর্যালোচনা করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, কোনটি সঠিকতম।

পর্যালোচনা

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসন-বিচার করা ছোট কুফর নাকি বড় কুফর, তা নিয়ে এই অংশের আলোচনা না। সেই আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে থাকবে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এই আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতা নির্ণয় করা। অর্থাৎ, আয়াতগুলো কি শুধু আহলে কিতাবের জন্য প্রযোজ্য, নাকি শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, নাকি প্রযোজ্য সার্বিকভাবে সকলের ওপর।

আয়াতের সঠিক শানে নুযূল নির্ণয় করাও এখানে উদ্দেশ্য না। কারণ আমরা আগেই

---

[১৬১] তাফসিরুল বাগাওয়ী, ৩/৬১। আরও দেখুন : তাফসিরুল কুরতুবি, ৬/১৯০।

[১৬২] তাফসিরুল বাগাওয়ি, ৩/৬১।

[১৬৩] মাআনিল কুরআন ওয়া ইরাবুহ, আয-যাজ্জাজ, ২/১৭৮, 'আলামুল কুতুব, বৈরুত।

Scanned by CamScanner

দেখিয়েছি, এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

খেয়াল করলে দেখবেন ওপরের ৮টি মতের সারাংশ ঘুরেফিরে দুটি :

ক) আয়াতগুলো বিশেষভাবে আহলে কিতাবের জন্য প্রযোজ্য, মুসলিমদের জন্য নয়। অথবা,

খ) আয়াতগুলো উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আহলে কিতাবদের ওপরও আর যেসব মুসলিম তাদের অনুরূপ কাজ করে তাদের ওপরও।

যে আটটি মত উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে শুধু প্রথমটি 'ক'-তে বর্ণিত শ্রেণিতে পড়ে। বাকি সব 'খ' এর অন্তর্ভুক্ত।

আপত্তি আসতে পারে যে, তৃতীয় আরেকটি মতও তো আছে। যেমন একটি মত অনুযায়ী, কিছু আয়াত মুসলিমদের ওপর, কিছু ইহুদিদের, কিছু খ্রিষ্টানদের ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু এটাও আসলে 'খ'-এর ভেতর পড়ে যায়। কারণ আমাদের আলোচনা মূলত প্রথম আয়াতটিকে কেন্দ্র করে,

"আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।"

প্রথম আয়াতটি (অর্থাৎ ৪৪ নং আয়াত) মুসলিমদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়টি ইহুদিদের ব্যাপারে আর তৃতীয়টি খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে—যদি এ মত গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতা সার্বিক। কারণ যে ধরনের যুলম এবং ফিসক আহলে কিতাব করেছিল তা ব্যক্তিকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। তার মানে আহলে কিতাব সম্প্রদায় 'কাফিরূন' এর মাঝে এমনিতেই পড়ে যায়।

কাজেই প্রথম মতটি ছাড়া বাকি সকল মত কার্যত 'খ' এর ভেতরেই পড়ে। অর্থাৎ আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতা সার্বিক হবার দিকে ইঙ্গিত করে।

তিন নং মত হলো, আয়াতে ছোট কুফরের কথা বলা হচ্ছে। আয়াতগুলো হয় মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ, আর নয়তো আহলে কিতাবের সাথে মুসলিমরাও এখানে উদ্দেশ্য—এই ধারণার ভিত্তিতে এ মত গড়ে উঠেছে। কাজেই এ মতেই ধরে নেয়া হচ্ছে যে এই আয়াতের বক্তব্য মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য।

একই কথা প্রযোজ্য চার নং মতের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেক অস্বীকারকারীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে এখানে।

পাঁচ নং মতানুযায়ী আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতা সার্বিক।

ছয় নং মতে আয়াতগুলো মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য।

সাত নং মতটি চার নম্বরের অনুরূপ।

Scanned by CamScanner

আর খারিজিদের মতে আয়াতগুলোতে শুধু মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে। এই মতটি ভুল। সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এটি।

তাই ঘুরেফিরে সবগুলো মতকে দুটি মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ

ক) হয় আয়াতগুলো শুধু আহলে কিতাবের প্রতি প্রযোজ্য।

খ) নয়তো আহলে কিতাব ও মুসলিম উভয়ের ওপর প্রযোজ্য। কার ওপর কীভাবে প্রযুক্ত হবে, সেখানে শুধু পার্থক্য।

আমাদের মতে, 'খ' মতটি সঠিকতর। অর্থাৎ এই আয়াতগুলো আহলে কিতাব এবং মুসলিম, উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এর প্রমাণ:

১. আলিমগণের মত হলো, কোনো আয়াতের শানে নুযূল এবং আয়াতে যা বলা হচ্ছে তা পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারে, না-ও হতে পারে। এটি স্পষ্ট যে আলোচ্য আয়াতগুলো ইহুদিদের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যিনার শাস্তি এবং/অথবা হত্যার ক্বিসাসের আসমানি বিধানকে পরিবর্তন করছিল। আয়াতের প্রেক্ষাপট থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায়। আয়াতগুলো থেকে আমরা পাচ্ছি,

- এরা আল্লাহর কিতাবের শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থ হতে বিকৃত করে...

- ইহুদিরা...

- এরা আল্লাহর কিতাবের শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থ হতে বিকৃত করে...

- ইনজিলের অনুসারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করা...

তাই শানে নুযূল আহলে কিতাব সংক্রান্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ ভিন্নও হতে পারে। সম্ভাব্য শানে নুযূল হিসেবে একাধিক ঘটনার উল্লেখ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন : কাতাদার বর্ণনামতে, এক ইহুদির হাতে আরেকজন খুন হওয়ার নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ আছে। আবার আয-যাহ্হাক সহ কেউ কেউ কোনো বিশেষ ঘটনার উল্লেখ ছাড়া সাধারণভাবে বলেছেন যে, এগুলো আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আয়াতগুলোকে মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য বললেও শানে নুযূলের সাথে এর কোনো সাংঘর্ষিকতা থাকে না। মোটকথা, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা হলেও এর শব্দগুলো সার্বিক ও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। সামনে এর ওপর আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

২. এমনকি 'ক' মতের সমর্থকদের কারও কারও কথা থেকেও আয়াতগুলোর সার্বিক প্রযোজ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

Scanned by CamScanner

> “বনী ইসরাঈল তোমাদের ভাই হিসেবে কতই-না ভালো! সব মিষ্টি জিনিসগুলো (প্রশংসাবাক্য) তোমাদের জন্য, তো তিক্তগুলো (অভিযোগ) তাদের জন্য। একদিন ঠিকই তোমরা পদে পদে ওদের অনুকরণ শুরু করবে।”

একইভাবে ইবনু আব্বাসও (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

> “তোমরা কতই-না ভালো জাতি! মিষ্টি কথাগুলো তোমাদের প্রতি, আর তিক্তগুলো আহলে কিতাবের প্রতি।”[১৬৪]

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে যেন ‘কাফিরূন’ এর আয়াতটিকে তিনি মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য বলে মানেন। অথচ তাঁরই অন্য উক্তিতে একে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যে অথবা ছোট কুফর অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলেই যে উপযুক্ত ক্ষেত্রেও তা মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য হবে না এমনটা তিনি মনে করতেন না। হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

৩. আবু মিজলাযের মতে, *“এ আয়াতগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।”* আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, *“এগুলো ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত।”*

মনে রাখতে হবে, আবু মিজলায এ কথাগুলো বলেছেন ইবাদিয়্যাহ খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনার সময়। আলোচনার শেষে তিনি মুশরিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আয়াতে মুশরিকদের কথা নেই, আছে ইহুদি-খ্রিষ্টান তথা আহলে কিতাবের কথা। এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, আহলে কিতাবের ওইসব কাজের অনুরূপ করলে কাজ যে-ই করবে সে এই বিধানের আওতায় পড়ে যাবে।

৪. আবু সালিহ বলেন, *“সূরা আল-মায়িদাহর ওই তিনটি আয়াতে মুসলিমদের কথা বলাই হয়নি, সব ক’টিই কুফফারের ব্যাপারে।”* আল-বারা ইবনু আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাষায়, “আয়াতগুলো সবই কুফফারের ব্যাপারে অবতীর্ণ।”

এ উদ্ধৃতিগুলো থেকে আয়াতগুলো কেবল আহলে কিতাবের জন্য প্রযোজ্য এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কাফেরদের ক্ষেত্রেও যেহেতু তা প্রযোজ্য হতে পারে।

তাই বলা যায় যে,

- আবু মিজলায ও আবু সালিহর উক্তি থেকে বোঝা যায় আয়াতগুলোতে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মধ্যকার কুফফারদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হচ্ছে।

---

[১৬৪] আদ্দুররুল মানসুর, ৩/৮৮।

Scanned by CamScanner

কিন্তু এতে এগুলোর সার্বিক ও ব্যাপক প্রযোজ্যতার বিষয়টি নাকচ হয়ে যায় না। তাদের মতো কাজ করলে অন্য যে কারও ওপর এই বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।

♦ আবু সালিহর বক্তব্য থেকে মনে হয়, যেন তিনি আয়াতগুলোর প্রযোজ্যতাকেও কেবল কাফিরদের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে এ আয়াত মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য না। কিন্তু এখানে বোঝার বিষয় হলো খারিজিদের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলে থাকতে পারেন, কারণ খারিজিরা অত্যাচারী মুসলিম শাসককেও কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে। ইবনু আব্বাস থেকে আসা সহীহ বর্ণনাটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করে।

তাই উভয়ের সারকথা একই। আয়াতের প্রযোজ্যতা শুধু আহলে কিতাবের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

৫. আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থ সার্বিক ও ব্যাপক। আয়াতে ব্যবহৃত আরবি 'মান' (যারা) শব্দটি অর্থের প্রযোজ্যতার দিক দিয়ে বিশেষ বা নির্দিষ্ট নয়; সাধারণ (ব্যাপক)।

তাই আয়াতগুলো কেবল আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়ার মতটি উল্লেখ করার পরপরই ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, *"এমনটি হওয়ার কথা নয়। কারণ এটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। অতএব এটি সঠিক না।"*[১৬৫]

৬. যদি ধরেও নিই যে কেউ কেউ 'ক' মতটি দিয়েছেন, অর্থাৎ এ আয়াতগুলোকে কেবল আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারপরও দেখা যায় যে অধিকাংশ সালাফ ও খালাফ 'খ' মতের সমর্থক। অর্থাৎ অধিকাংশ সালাফ ও খালাফের মত হলো এ আয়াতগুলো আহলে কিতাব এবং মুসলিম, দুদলের জন্যই প্রযোজ্য। কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও এ মতের পক্ষে সমর্থন মেলে । যেমন : আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করা, কুরআন-সুন্নাহর বিচার অমান্যকারীকে মুমিনের তালিকা থেকে বহিষ্কার করা, তাগূতের কাছে বিচার চাওয়ার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সংক্রান্ত আয়াতসমূহ থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

[১৬৫] মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩৩৬। বুখারি তাঁর সহীহতে একটি অধ্যায়ে এ আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যায়টির শিরোনাম "যে আল্লাহ তাআলার এ আয়াতের (৫:৪৪) হিকমাহ অনুযায়ী বিচার করে, তার প্রতিদান অধ্যায়"। ইবনু হাজার (৩১/১২০) বলেন, "বুখারির এই শিরোনাম থেকে মনে হয় যে, তিনি এর অর্থকে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য বলে মানতেন।" এরপর ইসমাঈল আল-কাযির একটি উক্তি বর্ণনা করেন, "আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, যে কেউ তাদের মতো কাজ করে এবং আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান আবিষ্কার করে তার অনুসরণ করতে বলে, সে-ই এ আয়াতের আওতায় পড়ে যাবে। চাই সে বিচারক হোক বা না হোক।" (ফাতহুল বারি, ১৩/১২০, সালাফিয়্যাহ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ)।

Scanned by CamScanner

৭. ব্যাপার যা-ই হোক, এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলো সার্বিক ও ব্যাপক। ভিন্ন মত পোষণকারীরা বলতে পারে, যেহেতু এই আয়াত ইহুদিদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তাই এটা শুধু তাদের জন্যই প্রযোজ্য। এর জবাব হলো :

কোনো আয়াত বা হাদীস নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এলেও মূল বিবেচ্য বিষয় হলো আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ কি ব্যাপক নাকি নির্দিষ্ট। সে অনুযায়ীই আয়াত বা হাদীসের প্রযোজ্যতা নির্ধারিত হবে।

এই মূলনীতি সর্বজনবিদিত। আর ব্যাপক বা সুনির্দিষ্ট হবার বিষয়টি যদি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে বোঝা না যায়, তাহলে সঠিকতর মত হলো, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ (ব্যাপক) অর্থ গ্রহণ করা হবে; আয়াত নাযিল হবার সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বা কারণ না। এটি অধিকাংশ আলিমের মত। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থাদিতে এ মতের পক্ষের প্রমাণ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।[১৬৬]

বিষয়টি স্পষ্টতর হবে নিচের পয়েন্টগুলো থেকে :

ক) সূরা আল-মায়িদাহর আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলোর অর্থ সার্বিক; শুধুই আহলে কিতাবের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। যেমন :

- বাক্যাংশটি শুরু হচ্ছে এভাবে "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না..." [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪] আয়াতের অর্থ যে সর্বজনীন, তার স্পষ্টতম প্রমাণ এখানে ব্যবহৃত শর্তযুক্ত সর্বনাম 'মান' (যারা)। তাই সাহাবি ও মুফাসসিরগণের একাংশ এর অর্থকে সার্বিক ও ব্যাপক বলেছেন।

- আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে, "হয় তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন, না হয় নির্লিপ্ত থাকুন।" [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪২] এবং "তাই আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে মিটমাট করুন।" এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূল ও তাঁর উম্মাহকে।

খ) বর্ণিত আছে, মুসলিমদের সাথে বিতর্ক করার সময়ও নবী ﷺ ও সাহাবিগণ দলিল হিসেবে সেসব আয়াত ব্যবহার করতেন, যেগুলো আদতে আহলে কিতাব অথবা মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এ ধরনের আয়াতের প্রযোজ্যতা সার্বিক।

---

[১৬৬] আল-মুস্তাসফা, আল-গাযালি, ২/২০ (বুলাক সংস্করণ); শারহুল কাওকাবিল মুনীর, ৩/১৭৭; আল-মুওয়াফাকাত, ৩/২৮১, দাররাযের ব্যাখ্যাসহ, মুস্তাফা মুহাম্মাদ সংস্করণ। দারু ইবনি আফফান থেকেও মাশহুর হাসান সালমানের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে, ৪/৩৪।

Scanned by CamScanner

আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থে আশ-শাতিবি বলেছেন,

> "শরীয়াহর মাকসাদ সম্পর্কে সালাফে সালিহীন ভালো করেই জানতেন। পাশাপাশি তাঁরা ছিলেন আরব। তাদের বুঝ ছিল এই যে, কুরআনের আয়াতগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা ব্যাপক (আম)। যদিও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ভিন্ন কিছু নির্দেশ করে। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের অবস্থান ছিল, আয়াতের শব্দের আপাত অর্থের সার্বিক প্রয়োগকে প্রাধান্য দিতে হবে।"[১৬৭]

এরপর আশ-শাতিবি কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেন। একটু পরই সেগুলো আনা হবে। তিনি এরপর বলেছেন,

> "যেমন এই আয়াতটির কথাই ধরুন, 'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই 'কাফিরূন'।' নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায় যে, এটি ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ। কিন্তু আলিমগণ এর প্রযোজ্যতাকে কুফফারদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বিকভাবে বিবেচনা করেছেন। বলেছেন যে, এটি ছোট কুফর।"[১৬৮]

> "তোমরা কি ভেবেছ যে, হাজিদের পানি পান করানো ও মাসজিদুল হারামের দেখাশোনা করার প্রতিদান ওই ব্যক্তির প্রতিদানের সমান, যে কি না আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে?..." [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১৯]

এ আয়াতের তাফসীরে কুরতুবি একটি হাদীস উল্লেখ করেন। আন-নুমান ইবনু বাশীর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

> "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক বলল, 'হাজিদের পানি পান করানো ছাড়া আর কোনো নেক আমল করতে না পারলেও আমার কোনো আফসোস থাকবে না।' আরেকজন বলল, 'মাসজিদুল হারামের দেখাশোনা করা ছাড়া আর কোনো নেক আমল করতে না পারলেও আমার কোনো আফসোস থাকবে না।' তৃতীয় আরেকজন বলল, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এগুলোর চেয়েও ভালো।' উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ধমকে উঠলেন, 'তোমরা জুমুআর দিনে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর মিম্বারের কাছে বসে এত গলা চড়াচ্ছ কেন? সালাত শেষেই বরং তাঁর সাথে আলোচনা করে সঠিক ব্যাপার জেনে নিয়ো।' এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন... (উপরোক্ত আয়াত)।"[১৬৯]

---

[১৬৭] আল-মুওয়াফাকাত, ৪/৩৪, দারু ইবনি আফফান সংস্করণ।

[১৬৮] *প্রাগুক্ত*, ৪/৩৯।

[১৬৯] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের ফযিলত অধ্যায়, হাদীস নং

Scanned by CamScanner

এটি আলোচনার পর কুরতুবি বলেন,

> 'কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হওয়া কোনো আয়াত মুসলিমদের সাথে বিতর্কে ব্যবহার করলে অনেকে বলে, 'এটার বিধান তো আলাদা'। অথচ এ ধরনের আয়াত থেকে মুসলিমদের ব্যাপারে বিধান চয়ন করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্বয়ং উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি করেছেন। তিনি বলেন, 'থালার পর থালা সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে। কিন্তু আল্লাহ সতর্ক করেছেন, (*...পার্থিব জীবনে তোমরা যথেষ্ট আরাম-আয়েশ পেয়ে গেছ...*(৪৬:২০))'
>
> এ আয়াতে কুফফারদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উমার বুঝেছেন যে, কাফিরদের সাদৃশ্য ধারণ করলে মুসলিমরাও এই সতর্কবার্তার আওতায় পড়ে যাবে। কোনো সাহাবি এই অর্থের বিরোধিতা করেননি। তাই বলা যায় যে, এ আয়াতটিও (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪) এ ধরনের। এ পয়েন্টটি মূল্যবান এবং এ-সংক্রান্ত সংশয় ও মতবিরোধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহই ভালো জানেন।[১৭০]

সূরা আল-আহকাফের আয়াতটির ব্যাপারে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মন্তব্যটি আশ-শাতিবিও বর্ণনা করেছেন।[১৭১] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "কুরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠ প্রধানত সর্বজনীন বার্তা প্রদান করে, যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে বা শুধু অর্থের দিক থেকে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির ওপর প্রযোজ্য। মহান আল্লাহর সাথে কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লেখিত অঙ্গীকার সাহাবিদের ওপর যেমন প্রযোজ্য ছিল, উম্মাহর পরবর্তী সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রেও তা-ই। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেন আমরা এগুলো থেকে শিক্ষা নিই। মুমিনরা পূর্ববর্তী মুমিনদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে। কাফির-মুনাফিকরা আগেকার কাফির-মুনাফিকদের পরিণতি শুনে সতর্ক হবে।"[১৭২]

১৮৭৯।

[১৭০] তাফসিরুল কুরতুবি, ৮/৯২, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ সংস্করণ।

[১৭১] আল-মুওয়াফাকাত, ৪/৩৪-৩৫। মাশহুর হাসান সালমান সংস্করণে উক্ত বর্ণনার পাদটীকায় উল্লিখিত ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

[১৭২] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৪২৫। উল্লেখ্য, মুসলিম-তাতার যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রিসালায় ইবনু তাইমিয়্যাহর এই কথাগুলো এসেছে। সে যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করে, যাতে ইবনু তাইমিয়্যাহর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এর আগে মুসলিমরা কীভাবে দুর্ভোগ পোহাত, কীভাবে কিছু মুনাফিক যুদ্ধের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে—এগুলো নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধাভিযানের সাদৃশ্যগুলো অসাধারণভাবে এতে ফুটে উঠেছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর রচনাটি শুরু করেন এভাবে, "আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন, বিজয় দিলেন তাঁর দাসদের, নিজের বাহিনীকে বিজয়ী করে পরাজিত করলেন শত্রুজোটকে। "আল্লাহ কাফিরদের তাদের ক্রোধ নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ পায়নি...।" [সূরা আল-

Scanned by CamScanner

এ রকম আরও উদাহরণ :

ক) উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপরে উল্লেখিত বর্ণনা।

খ) *"...কিন্তু মানুষ অত্যন্ত কলহপ্রবণ।" [সূরা আল-কাহফ, ১৮:৫৪]*, নবী ﷺ এ আয়াতটি আলী ও ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দাম্পত্যকলহ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। অথচ শানে নুযূল বিবেচনায় এটি কুফফারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ। হাদীসটি আছে বুখারিতে।[১৭৩]

গ) *"আমার অবতীর্ণ করা স্পষ্ট প্রমাণ ও পথনির্দেশ যারা গোপন করে..." [সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৯]*, একটি হাদীস বর্ণনা করার পর এর কারণ হিসেবে আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন। আয়াতে কিন্তু বলা হয়েছে কাফিরদের কথা। কিন্তু আবু হুরাইরাহ নিজেকেও এই সতর্কবার্তার আওতাধীন বিবেচনা করেছেন। এ বর্ণনাটিও বুখারিতে আছে।[১৭৪]

ঘ) রাসূল ﷺ মূলত কুফফারদের ব্যাপারে বলেছিলেন, *"নারী শাসক নিয়োগকারী জাতি কখনো সফল হবে না"*[১৭৫], কিন্তু আবু বাকরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এটি উদ্ধৃত করেন একদল মুসলিমের সাথে বিতর্ককালে।

এ রকম আরও প্রচুর উদাহরণ আছে। তাহলে এতে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হওয়া আয়াত বা বর্ণিত হাদীসের প্রযোজ্যতার দিক দিয়ে সার্বিক হওয়া সম্ভব। সূরা আল- মায়িদাহর আলোচ্য আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে।

৮। আলোচ্য আয়াতকে শুধু আহলে কিতাবদের ওপর প্রযোজ্য মনে করার মতটি কম সঠিক। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কিছু ব্যক্তি এখান থেকে আরেকটি ভুল উপসংহারে পৌঁছেছে। তারা বলে, সূরা মায়িদাহর আয়াতে ইহুদিদের কাফির আখ্যায়িত করার কারণ হলো, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত বার্তাকে অস্বীকার করে এবং বড় শিরক করার মাধ্যমে কাফির হয়ে গেছে।

এটা একেবারেই ভুল মত। কারণ, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নির্দিষ্ট একটি ঘটনার

আহযাব, ৩৩:২৫] ... ইসলামী শরীয়াহর বিরোধিতাকারী শত্রুদের মাধ্যমে আজ মুসলিমদের যেভাবে পরীক্ষা (ফিতনা) করা হলো, এর সাথে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচালিত সামরিক অভিযানের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে...।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৪২৪-৪৬৭)। ইবনু তাইমিয়্যাহর এই অনন্য রচনায় আমাদের আলোচ্য বিষয়টির বাস্তব উদাহরণ বিদ্যমান।

[১৭৩] সহিহুল বুখারি, কিতাবুত-তাহাজ্জুদ, রাতের সালাতের ব্যাপারে নবীজির উৎসাহদান অধ্যায়, হাদীস নং ১১২৭।

[১৭৪] সহীহ বুখারি, কিতাবুল-ইলম, জ্ঞানের সংরক্ষণ অধ্যায়, হাদীস নং ১১৮।

[১৭৫] সহীহ বুখারি, কিতাবুল-ফিতান, অধ্যায় ১৮, হাদীস নং ৭০৯৯।

Scanned by CamScanner

প্রেক্ষাপটে। ইহুদিদের কাফির ঘোষণা করা উদ্দেশ্য হলে কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা ঘটনার সাথে যুক্ত করা ছাড়াই উক্ত আখ্যা দেয়া হতো।

এ আয়াতে, ইহুদিদের কাফির বলার ভিত্তি হলো, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করেনি। যদি বলা হয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত বার্তা অস্বীকার করে এবং বড় শিরক করার কারণে ইহুদিরা কাফির এটাই আয়াতে বোঝানো হচ্ছে, তাহলে এই আয়াতের বক্তব্য অর্থহীন হয়ে যায়। অনেক আয়াত ও হাদীসই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এটিই এ মতকে ভুল প্রমাণ করতে যথেষ্ট।

অনুরূপ মতাবলম্বী আরেকদল লোক ইবনু কাসীরের ব্যাপারে একটি ভুল কথা বলে। ইবনু কাসীর তাতারদের কাফির আখ্যা দিয়েছেন, এটা স্বীকৃত। কিন্তু সেটার কারণ কী?

ভুল মতাবলম্বীরা বলে, তাতাররা সার্বিকভাবে শিরক-কুফরে লিপ্ত থাকার কারণে ইবনু কাসীর তাদের কাফির বলেছেন। এটি আসলে আলিমদের বক্তব্য বিকৃত করা। তাতাররা কুরআনের বদলে ইয়াসিক নামক একটি সংবিধান অনুযায়ী বিচার-শাসন করত। এ কারণেই ইবনু কাসীর তাদেরকে কাফির ঘোষণা করেছেন; অন্য কোনো কারণে নয়। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য একদমই স্পষ্ট।

ওপরের পুরো আলোচনা থেকে তাই বলা যায় যে, সঠিকতর মত হলো, মুসলিমরা আলোচ্য আয়াতের আওতায় পড়ে। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও এ আয়াতগুলো প্রযোজ্য।

মানবরচিত আইনের শাসন যখন বড় কুফর

আল্লাহ নাযিলকৃত আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে শাসন কখন বড় কুফর

আলোচ্য আয়াতের প্রযোজ্যতা ব্যাপক হবার সম্ভাবনা যেহেতু বেশি তাই প্রশ্ন হলো, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কি ছোট কুফর, না বড় কুফর?

আমরা সে অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব, যা অধিকাংশ আলিমের মতে সঠিক। এই যাত্রা শুরু করার আগে প্রাসঙ্গিক দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে চাচ্ছি। একটি ইবনুল কায়্যিমের, অপরটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর। কারণ, ঠিক আমাদের আলোচ্য বিষয়টি নিয়েই তাঁরা এই উক্তিগুলো করেছেন। সূরা আল-মায়িদাহর "কাফিরূন" সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে মতভেদগুলো নিয়ে আলোচনা করে এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের মূল কারণ তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কোন ক্ষেত্রে এটি বড় কুফর এবং কোন ক্ষেত্রে ছোট। পাঠকদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা এখানে প্রাসঙ্গিক পয়েন্টগুলোই কেবল এনেছি।

১। ছোট কুফরের আলোচনায় সূরা মায়িদাহর ৪৪ নং আয়াতটি উল্লেখ করার পর

Scanned by CamScanner

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস সহ বেশির ভাগ সাহাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মত এটিই। ইবনু আব্বাস বলেছেন, 'এটি ওই কুফর নয়, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এটি কুফর বটে, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতে অবিশ্বাস করার সমপর্যায়ের নয়।' তাউসেরও একই মত। 'আতা বলেছেন, 'এখানে ছোট কুফর, ছোট যুলম, আর ছোট ফিসকের কথা বলা হয়েছে।'

কেউ কেউ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আয়াতে ওই ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে। কারণ সে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে। এটি ইকরিমা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মত। এটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ বিধান অস্বীকার করার কাজটিই তো স্বতন্ত্রভাবে কুফর। এখন কেউ সেই বিধান দিয়ে বিচার করুক বা না করুক, তাতে কোনো ফারাক পড়ে না।

কারও মতে এখানে আল্লাহর নাযিল করা কোনো কিছু দিয়েই বিচার না করার কথা বলা হচ্ছে। তাওহীদ ও ইসলামের ভিত্তিতে ফায়সালা না করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আব্দুল আযীয আল-কিনানির মত। এটিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার না করার কথা বলা হচ্ছে। যা থেকে বোঝা যায়, এর অর্থ বিচার করার ক্ষেত্রে পূর্ণ শরীয়াহ অমান্য করাও হতে পারে আবার এর কিছু অংশ অমান্য করাও হতে পারে।

আবার কারও মতে এখানে বলা হয়েছে ইচ্ছেকৃতভাবে ওয়াহির বিধানের বিপরীত করার কথা। অজ্ঞতা বা ভুল বোঝার কারণে এমনটি করা হলে এ আয়াতের আওতায় পড়বে না। কিছু আলিমের সূত্রে আল-বাগাওয়ি এই মতটি উল্লেখ করেছেন।

কিছু ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। কাতাদা, আয-যাহ্হাক সহ অন্যদের মত এটি। এই ব্যাখ্যাটি আসলে আয়াতের আপাত অর্থের বিপরীতে যায়। তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

কেউ আবার এর অর্থ করেছেন ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, এমন কুফর।

সঠিক মত হলো, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা ক্ষেত্রবিশেষে বড়-ছোট যেকোনো প্রকার কুফরই হতে পারে। এটা বিচারকের অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে।

ধরা যাক একজন বিচারক বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করা ফরয। এর অন্যথা করলে শাস্তি পেতে হবে, তাও মানেন। কিন্তু অবাধ্যতাবশত আল্লাহর বিধান থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এ ক্ষেত্রে ছোট কুফর হবে।

কিন্তু আরেক বিচারক মনে করে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার কোনো

Scanned by CamScanner

বাধ্যবাধকতা নেই, বরং তার নিজের কথাই শেষ কথা। এমনকি অমুক বিধানটি যে আল্লাহর দেয়া বিধান, তাও সে জানে। এ ক্ষেত্রে হবে বড় কুফর। আর যদি না জানে যে, এটা আল্লাহর বিধান, অথবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভুল করে, তাহলে সেটা অনিচ্ছাকৃত ভুল করার আওতায় পড়বে।"[১৭৬]

ইবনুল কায়্যিমের আলোচনা থেকে নিচের বিষয়গুলো লক্ষণীয় :

- আয়াতের প্রযোজ্যতাকে সরাসরি আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে তিনি নারাজ। কারণ অস্বীকার করার কাজটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর, এবার ওই বিধান দিয়ে সে বিচার করুক বা না করুক।

- শুধু পূর্ণ শরীয়াহ অনুসরণ না করা কুফর হবে, অন্যথায় না—এ মতটিও তাঁর মতে দুর্বল।

- আল-বাগাওয়ির মতটি উল্লেখ করলেও এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

- আয়াতগুলো কেবল আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবার মতটিকেও তিনি দুর্বল বলেছেন।

- এ ধরনের কাজ কখন ছোট কুফর সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন।

২। রাসূল ﷺ সহ সবাইকে আল্লাহর বিধান দিয়ে ফায়সালা করতে আদেশ করা হয়েছে, এমন কিছু আয়াত নিয়ে আলোচনা করার পর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"নবীজি ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে শাসন-বিচারের আদেশ তো দিয়েছেনই, সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন কিছুতেই এ থেকে সরে না যান। আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান কামনাকারীকে বলা হয়েছে জাহিলিয়ার বিধান কামনাকারী। আল্লাহ আরও বলেছেন, "আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দিয়ে যারা ফায়সালা করে না, তারাই 'কাফিরূন'।"

আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করাকে যারা ফরয বলে মানে না, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। যে মনে করে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মতামত অনুযায়ী বিচার করা বৈধ, সেও কাফির।

ন্যায়বিচার করতে হবে, এটা দুনিয়ার কোনো জাতিই অস্বীকার করে না। কিন্তু ন্যায়ের সংজ্ঞা একেক জায়গায় একেক রকম। সাধারণত নেতা যেটাকে ন্যায় মনে করে, জনগণও সেটাই মানে।

---

[১৭৬] মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩৩৬-৩৩৭।

Scanned by CamScanner

এমনকি মুসলিম দাবিদার অনেক জাতিও নিজেদের প্রথা অনুযায়ী বিচার করে, যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান নয়। যেমন : বেদুঈন জাতি। তারা কুরআন-সুন্নাহর বদলে নেতার নির্দেশ বা তাদের প্রথাপ্রচলন মানাকেই যথেষ্ট মনে করে। এটি কুফর।

মুসলিম হওয়ার পরও কিছু জাতি বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে তাদের নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী আগেকার বিধি-বিধান আর প্রথা-প্রচলনই মানে। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা হারাম, এটি জেনেও যদি তারা এমনটি করতে থাকে, তাহলে তারা কাফির। অন্যথায় অজ্ঞ।

মুসলিমদের মাঝে কিছু নিয়ে মতপার্থক্য হলেই তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছে ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

'হে বিশ্বাসীরা, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূল ﷺ -এর ও তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের। যদি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে কোনো কিছু নিয়ে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছে সমর্পণ করবে। এটি যেমন কল্যাণকর, তেমনি পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।' [সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯]

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' [সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫]

মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিচারের শরণাপন্ন হওয়াকে যে ব্যক্তি মানে না, তার ঈমানের দাবিকে আল্লাহ তা'আলা আপন সত্তার কসম দিয়ে নাকচ করেছেন। তবে কেউ যদি ভেতরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর বিচারের প্রতি আনুগত্য মেনে নেয়, কিন্তু প্রবৃত্তির কারণে অবাধ্য হয়, তাহলে সে অন্যান্য গুনাহগারদের মতোই।

খারিজিরা যেসব আয়াত ব্যবহার করে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার না করা শাসকদেরকে তাকফির করে, তার মাঝে একটি হলো এই (সূরা মায়িদাহ, ৫:৪৪) আয়াত। নিজেদের বিশ্বাসকেই তারা (খারিজিরা) আল্লাহর বিধান বলে দাবি করে বসে। এখন এ ব্যাপারে এত মত রয়েছে যে, তালিকা করে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আয়াতের প্রসঙ্গ থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, তা আমি এখানে উল্লেখ করলাম।

মোটকথা সর্বকালে, সর্বস্থানে, প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করা পুরোপুরি ফরয। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করাটা ন্যায়বিচারের এক বিশেষ প্রকার, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিখুঁততম। নবী ﷺ ও তাঁর

Scanned by CamScanner

সকল অনুসারীর জন্য এ অনুযায়ী শাসন-বিচার করা ফরয। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধান অমান্যকারীরা কাফির।

বিশ্বাস ও কর্ম সংক্রান্ত সব ব্যাপারে এটি মান্য করা উম্মাহর প্রতি বাধ্যতামূলক। আল্লাহ বলেন,

'একসময় সমগ্র মানবজাতি ছিল একটি মাত্র সম্প্রদায়। আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদ ও সতর্কতা সহকারে। আর তাদের সাথে করে অবতীর্ণ করলেন এমন সত্য কিতাব, যা দিয়ে মানুষের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সুরাহা করা হবে...।' [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১৩]

তাই যেসব বিষয় সামগ্রিকভাবে উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য, সেসব ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা হারাম। কোনো আলিম, নেতা, শাইখ বা রাজার কথা মুসলিমদের মানতে বাধ্য করার অধিকার কারও নেই। কুরআন-সুন্নাহর বদলে এসব দিয়ে বিচার করাকে যারা জায়েয মনে করে, তারা কাফির।

মুসলিম বিচারকগণ বিচার করেন সুনির্দিষ্ট মামলা-মোকদ্দমার; সামগ্রিক বিষয়ে না। ওই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথমত অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহয় এর কী সমাধান আছে। তাও না পেলে নিজে থেকে সঠিক মত (ইজতিহাদ) দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।"[১৭৭]

ইবনু তাইমিয়্যাহর উক্তি থেকে এই বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য :

- আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করাকে যারা জায়েয মনে করে, তাদেরকে তিনি কাফির আখ্যা দিয়েছেন।
- নিজেদের রসম-রেওয়াজ বা প্রথা অনুযায়ী অথবা নেতার নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করা এবং মনে করা এর দ্বারাই বিচার করা উচিত, কুফর। যেমনটি বেদুঈনরা করে থাকে।
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিচারের শরণাপন্ন হবার বিষয়টি যারা মানে না, আল্লাহ আপন সত্তার কসম দিয়ে তাদের ঈমানকে অস্বীকার করেছেন।
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিচার অস্বীকারকারী কাফির।
- যারা বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়ভাবে এই বিচার মানে, কিন্তু অবাধ্যতাবশত আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে গুনাহগার অন্যান্য গুনাহগারদের মতোই। উল্লেখ্য, তিনি বলেছেন 'বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়ভাবে'।

---

[১৭৭] মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/১৩০-১৩২।

Scanned by CamScanner

♦ যেসব বিষয় সামগ্রিকভাবে পুরো উম্মাহ সংক্রান্ত, সেসব ব্যাপারে কোনো আলিম, শাইখ, নেতা বা শাসকের মত মানা যাবে না। সেটা হবে শুধুই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী। এখানে মূলত শরীয়াহর কথা বলা হচ্ছে, যা সবার ওপর প্রযোজ্য।

এখানে আলোচ্য পরিচ্ছেদের ভূমিকা শেষ। এবার আমরা বিস্তারিত দেখব, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা কোন কোন ক্ষেত্রে বড় কুফর।

বড় কুফরের ক্ষেত্র

এখানে তিন রকমের পরিস্থিতি হতে পারে :

ক) আদর্শিক অস্বীকার; হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম মনে করা।

খ) আল্লাহর আইন-বিরোধী আইন প্রণয়ন।

গ) জেনেশুনে আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তনকারীদের আনুগত্য করা।

ক) আদর্শিক

ইসলামের কিছু বিষয় সর্বজনবিদিত ও সুস্পষ্ট। এগুলো না জানার ব্যাপারে কোনো মুসলিম কোনো অজুহাত দিতে পারবে না। চাই সেটা ইসলামের মৌলিক কোনো নীতি (উসূলুদ্দীন) হোক বা গৌণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত এ রকম বিষয়গুলোর একটি বর্ণ অস্বীকার করাও বড় কুফর। সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত। এ বিষয়ে কোথাও কোনো দ্বিমত নেই। হালাল-হারামের বিধান অস্বীকার করাও এর মাঝে পড়ে। এ ধরনের কুফর মানুষকে ইসলামের সীমা থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

ফরয বিধানকে ফরয মেনেও পালন না করা এবং হারামকে হারাম মেনেও তাতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি অনেকেই ভালো করে বোঝে না। অতীতের খারিজিরা এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আজও কিছু ত্বরাপ্রবণ মানুষ একই ভুল করে থাকে।

আলিমগণের মতও উল্লেখ করা হলো, পুরো ব্যাপারটির সংজ্ঞাও স্পষ্ট করা হয়েছে। এবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা বড় কুফর, তার একটি তালিকা দেয়া যাক:

১। আল-মুগনি গ্রন্থে এসেছে,

> "যেসব জিনিস ঐকমত্যে হারাম, যেগুলোর বিধান মুসলিমদের মাঝে সুবিদিত, স্পষ্ট দলিলের কারণে যেখানে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই, সেগুলোর কোনোটিকে হালাল গণ্যকারী কাফির। যেমন : শূকরের মাংস খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি যেগুলোর ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। সালাত আদায় না করা ব্যক্তির ব্যাপারে

Scanned by CamScanner

আমরা যে কারণ উল্লেখ করেছি, সেই একই কারণে (এমন ব্যক্তিও কাফির)...।"[১৭৮]

২। আল-ফুরুক গ্রন্থে আল-কাররাফি বলেন,

"কুফরের মূলকথা হলো রুবুবিয়্যাতের পবিত্রতার লঙ্ঘন—তা সেটা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারের মাধ্যমে হোক, অথবা ইসলামের কোনো সুবিদিত বিষয় (যেমন : সালাত-সিয়াম) অস্বীকার করার মাধ্যমে। এটি শুধু ফরয-নফল ইবাদাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। সুবিদিত হালালকে হারাম গণ্যকারীও কাফির। যেমন কেউ যদি বলে আল্লাহ আঙুর কিংবা কলাকে হারাম করেছেন, তাহলে সেটা কুফর।

তবে ইজমা আছে এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করা ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে কাফির, এমন মনে করা ঠিক হবে না। মোটকথা, ইসলামের ওই বিষয়টিতে ঐকমত্য থাকার পাশাপাশি তা এমন সুবিদিত হতে হবে, যাতে সেটি না জানার পক্ষে আর কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।"[১৭৯]

৩। রিদ্দার আলোচনায় নিহায়াতুল মুহতাজের লেখক বলেন,

"...কোনো রাসূলকে অস্বীকার করা... অথবা যে বিষয় হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা আছে সেটাকে হালাল করা, যেখানে তা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, যা না জানার ব্যাপারে কোনো অজুহাত নেই (এটি রিদ্দার কারণ)। যেমন : ব্যভিচার, সমকামিতা, মদ্যপান ইত্যাদি।

কারণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের অংশ হিসেবে সুপরিচিত ও সুপ্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করা মানে তাঁর নুবুওয়াতকেই অস্বীকার করা। একইভাবে হালালকে হারাম মনে করার ক্ষেত্রেও একই কথা। এমনকি মাকরুহ হলেও। যেমন: বিয়ে-শাদি, বেচা-কেনা সংক্রান্ত কোনো বিষয়।

ঐকমত্যে সুবিদিত কোনো ফরযকে ফরয না মনে করা অথবা এতে নতুন কোনো ফরয যুক্ত করাও এর মাঝে পড়ে। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের যেকোনো একটি সিজদা অস্বীকার করা, কিংবা ষষ্ঠ আরেক ওয়াক্ত সালাত যুক্ত করা।

আবার শরীয়াহর সুবিদিত ঐকমত্যের বিষয়টি নফল হলেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন : প্রতিদিনকার নফল সালাত বা ঈদের সালাত অস্বীকার করা। যেমনটা আল-বাগাওয়ি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।"[১৮০]

---

[১৭৮] আল-মুগনি, ১২/২৭৬, ব্যাখ্যাসহ, দারু হাজার থেকে প্রকাশিত।

[১৭৯] আল-ফুরুক, আল-কারাফি, ৪/১১৫-১১৭, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৬ হিজরি, দারু ইহয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, কায়রো।

[১৮০] নিহায়াতুল মুহতাজ শারহুল মিনহাজ, ৭/৪১১, আল-হালাবি সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

৪। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

"দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যাকাত, রমাদ্বানের সিয়াম ও হাজ্জকে যে ফরয বলে মানে না, সে কাফির ও মুরতাদ। একইভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নিষেধ করা বিভিন্ন অনৈতিকতা, অপরাধ, শিরক, মিথ্যাচার ইত্যাদিকে হারাম বলে না মানার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমন ব্যক্তিকে তাওবাহ করতে বলা হবে। তাওবাহ করলে তো ভালোই। আর না করলে মুসলিম ইমামগণের ঐকমত্যে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সে দুই কালেমার সাক্ষ্য দিলেও তাতে কিছু যায় আসে না।"[১৮১]

৫। বিষয়টির গুরুত্বের কারণে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে যুক্ত করছি। নিছক কোনো গুনাহ করা আর কোনো হারামকে হালাল মনে করার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটা গুনাহ, দ্বিতীয়টা কুফর। এ পার্থক্য বোঝা আমাদের আলোচনার জন্য জরুরি। আর ইবনু তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টির ব্যাখ্যাই উঠে এসেছে। শাইখুল ইসলাম বলেন,

"কিবলা-অভিমুখী (অর্থাৎ, মুসলিম) কাউকে নিছক গুনাহর কারণে আমরা কাফির মনে করি না। এটা কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান। যিনা, চুরি বা মদ্যপানের মতো হারামে লিপ্ত হলে কেউ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। যদি না সে ঈমানও ত্যাগ করে।

কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত ঈমানের কোনো অংশ কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসূল, আখিরাত এ রকম কোনো বিষয় অস্বীকার করে কাফির হয়ে যাবে। এ ছাড়া সুপরিচিত ও সুপ্রমাণিত ফরযকে ফরয ও হারামকে হারাম না মানলেও কাফির হয়ে যাবে।

বলা হতে পারে গুনাহ দুই রকম। আদেশ পালন না করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া। আমি বলব, ফরয আদেশ পালন না করার দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় সে সেটাকে ফরয বলে মানে না, আর নয়তো ফরয মানে ঠিকই কিন্তু পালন করতে ব্যর্থ হয়।

যদি সে ফরয হিসেবে মেনে নিয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে এর অর্থ সে এটা আংশিক পালন করছে, আর আংশিক উপেক্ষা করছে। তার মানে আদেশের একাংশ (বিশ্বাস) পালন করছে, অপর অংশে (বাস্তবায়ন) ব্যর্থ হচ্ছে।

নিষিদ্ধ হারামে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। হয় সে হারাম বলেই মানে না, আর নয়তো হারাম মানলেও তাতে লিপ্ত হয়। যদি হারাম মেনেও তাতে লিপ্ত হয়,

---

[১৮১] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩৫/১০৫।

Scanned by CamScanner

অন্তত বিশ্বাসটা তো সে করছে। তাই বিশ্বাস করার জন্য সাওয়াব সে পাবে, আবার হারাম কাজ করার কারণে তার গুনাহও হবে।

মোটকথা, ইসলামের সুপরিচিত ও সুবিদিত বিষয়—যেগুলো না জানার কোনো সুযোগ নেই—সেগুলো অস্বীকার করা কুফর। কিন্তু অস্বীকার না করে সঠিক বিশ্বাস রেখেও তা পালনে ব্যর্থ হওয়া গুনাহ; কুফর না।

আর যে ব্যক্তি সঠিক আকীদাহ না থাকার কারণে বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কোনো আমলে লিপ্ত হয় বা কোনো আমল থেকে বিরত থাকে, তাকে ওজর দেয়া যেতে পারে। যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখতে হবে তার ভুল আমল করার বা সঠিক আমল থেকে বিরত থাকার বিষয়টি ঠিক কোন কারণে হচ্ছে? এটা কি ভুল ব্যাখ্যার কারণে, নাকি অজ্ঞতার কারণে? নাকি অন্য কোনো কারণে? তারপর দেখতে হবে এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ছাড় দেয়া যায় কি না। আল্লাহর কিতাবের এই আয়াত দ্রষ্টব্য :

'কিন্তু যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১১]

(আল্লাহর আইন) স্বীকার ও বিশ্বাস করতে হবে, এ নিয়ে ইজমা আছে। আদেশকৃত বিষয় পালন করার ব্যাপারে হুকুম কী হবে তা নিয়ে রয়েছে কিছু ভিন্ন মত। এই আয়াতের ক্ষেত্রেও একই কথা:

"...হাজ্জ করা সামর্থ্যবান মুসলিমদের ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব। আর অস্বীকারকারী জেনে রাখুক যে, আল্লাহ এ জগতের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৭]

হাজ্জকে ফরয বলে মনে না করার কারণে তা পালন না করা কুফর। আয়াতের নির্দেশ হলো একে ফরয বলেও মানতে হবে, পালনও করতে হবে। সালাফগণের অনেকে বলেছেন এর অর্থ হলো, যে হাজ্জকে নেক আমল মনে করে না ও তা পালন না করাকে গুনাহ মনে করে না, সে কাফির। কিন্তু কেউ হাজ্জকে ফরয মনে করে কিন্তু পালন করে না, এমন ব্যক্তির হুকুম কী, তা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে।

আবু বুরদাহ ইবনু নাইয়ার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদীসও এখানে প্রণিধানযোগ্য। এক লোক তার বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করে বসে। নবী ﷺ আবু বুরদাহকে তার কাছে পাঠান এবং তার শিরশ্ছেদ করে তার সম্পত্তি নিয়ে আসার আদেশ দেন। এর এক-পঞ্চমাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতেও বলেন।

তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের হুকুম থেকে বোঝা যায়, ওই লোকটি নিতান্ত গুনাহগার ছিল না; বরং কাফির হয়ে

Scanned by CamScanner

গিয়েছিল। তাই তার সম্পত্তি গনিমত গণ্য করা হয়েছে। আর তার কুফরের কারণ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যেটা হারাম করেছেন, সেটাকে হারাম মনে না করা।"[১৮২]

ইবনু তাইমিয়্যাহ শেষ দিকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছে এ ব্যাপারে আত-তাবারী মন্তব্য করেছেন,

"লোকটি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত বার্তা এবং কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের প্রতি কুফরি করেছে, তার কাজই সেটার স্পষ্টতম প্রমাণ। তার এই কাজের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড তার প্রাপ্যই ছিল। রাসূল ﷺ তাকে হত্যা করার এবং শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদদের ব্যাপারে এই ছিল তাঁর পথ।"[১৮৩]

এরপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"উমার, আলীসহ অনেক সাহাবি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) কুদামা ইবনু আব্দিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মদ পান করার পর অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কুদামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন বদরী সাহাবি। তিনি ভুলবশত ভেবেছিলেন, সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য মদ্যপান বৈধ। তাঁর এই ধারণার উৎস এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা:

'সৎকর্মশীল ঈমানদাররা যা খেয়েছে (অতীতে), তাতে কোনো পাপ নেই, যদি তারা আল্লাহকে ভয় করে (হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে) ঈমান এনে সৎকর্ম করে থাকে...।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৯৩]

সাহাবিগণ একমত হন যে, কুদামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ কাজ অব্যাহত রাখলে মৃত্যুদণ্ডের আসামি হবেন। আর তাওবাহ করে নিলে শাস্তি হবে শুধু বেত্রাঘাত। তিনি তাওবাহ করে নেন।[১৮৪]

গুনাহর ব্যাপারে শাস্তির বিধান কুরআনে এসেছে। যেমন চোরের হাত কাটা এবং অবিবাহিত যিনাকারীকে দোররা মারার বিধান। কিন্তু কুরআনে তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা হয়নি। এ ছাড়াও মুসলিম দুই দলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

---

[১৮২] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৯০-৯২।

[১৮৩] তাহযীবুল আসার, ২/১৪৮, আর-রশীদ সংস্করণ।

[১৮৪] উল্লেখ্য, কুদামার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বুঝতে ভুল হয়েছে। সাহাবিগণ শাস্তির সিদ্ধান্ত নেন সঠিক ব্যাখ্যাটি তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর। কুদামা তাঁর আগের ভুল বুঝ থেকে তাওবাহ করেন, ফলে শুধু বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। ইবনু কুদামার আল-মুগনি দ্রষ্টব্য, ১২/২৭৬; আল-ইতিসাম, ২/৪৬। মূল ঘটনাটি রয়েছে মুসান্নাফু আব্দির-রায্যাক, ৯/২৪০; সুনানুল বাইহাকি আল-কুবরা, ৮/৩১৫-৩১৬; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১০/৩৯।

Scanned by CamScanner

যারা ভুল অবস্থান থাকবে, তারা অপরাধী। কিন্তু সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, তবুও তারা ঈমানদার ও পরস্পর ভাই...।”[১৮৫]

মোটকথা, কেউ যদি ব্যভিচারকে জায়েয মনে করে, অথচ এ-সংক্রান্ত ইসলামী বিধানটি না জানার কোনো কারণ নেই, সে কাফির। আর যে ব্যভিচারকে হারাম মেনেই তাতে লিপ্ত হয়, সে আদালতে শাস্তির রায় পাবে বটে, কিন্তু তাকে কাফির ঘোষণা করা হবে না।

ইসলামের সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা কিংবা এমন কোনো হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো।

এখন আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ফায়সালা করার ব্যাপারটি আলোচনায় আনা যাক। দেখা যাক কীভাবে এটি এই আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। আলিমগণ বেশ কিছু বিষয়কে এর অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। যেমন : আল্লাহর আইন অস্বীকার, অন্য বিধানকে আল্লাহর বিধানের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান, ধর্মকে জীবনের সাথে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা ইত্যাদি। এই সবগুলো বিষয়ই ঈমান ও শরীয়াহর কোনো না কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত অংশ অস্বীকার করার সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাই আলিমগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বড় কুফর আখ্যায়িত করেছেন:

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা বড় কুফর, যখন শাসক বা বিচারক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানকে অবশ্য-অনুসরণীয় বলে স্বীকার করে না। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণনাটির অর্থ এটিই।[১৮৬] শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম উল্লেখ করেছেন যে, আত-তাবারীর মতেও এটি আল্লাহর অবতীর্ণ শার'ঈ বিধান অস্বীকারের সমার্থক। এই বিষয়ে আলিমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। দ্বীনের কোনো মূলনীতি, ইজমা আছে এ রকম কোনো গৌণ বিষয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে নিশ্চিতরূপে বর্ণিত আছে এমন একটি বর্ণ অস্বীকারকারীও কাফির হয়ে যায়। এ ধরনের কুফর মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটি এক সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি, যার ব্যাপারে সকল আলিম একমত।[১৮৭]

ইবনু জারীরের যে উদ্ধৃতির ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইঙ্গিত করছেন, সেটি হলো:

“প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আয়াতে এমন ব্যক্তিদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর

---

[১৮৫] মাজমূউল ফাতাওয়া, ২০/৯২।

[১৮৬] ইবনু জারীর, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬৩।

[১৮৭] তাহকীমুল কাওয়ানীন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, পৃ. ৫, ১ম সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

যারা ভুল অবস্থান থাকবে, তারা অপরাধী। কিন্তু সাথে বলে দেয়া হয়েছে যে, তবুও তারা ঈমানদার ও পরস্পর ভাই...।"[১৮৫]

মোটকথা, কেউ যদি ব্যভিচারকে জায়েয মনে করে, অথচ এ-সংক্রান্ত ইসলামী বিধানটি না জানার কোনো কারণ নেই, সে কাফির। আর যে ব্যভিচারকে হারাম মেনেই তাতে লিপ্ত হয়, সে আদালতে শাস্তির রায় পাবে বটে, কিন্তু তাকে কাফির ঘোষণা করা হবে না।

ইসলামের সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা কিংবা এমন কোনো হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো।

এখন আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ফায়সালা করার ব্যাপারটি আলোচনায় আনা যাক। দেখা যাক কীভাবে এটি এই আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। আলিমগণ বেশ কিছু বিষয়কে এর অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। যেমন : আল্লাহর আইন অস্বীকার, অন্য বিধানকে আল্লাহর বিধানের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান, ধর্মকে জীবনের সাথে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা ইত্যাদি। এই সবগুলো বিষয়ই ঈমান ও শরীয়াহর কোনো না কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত অংশ অস্বীকার করার সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাই আলিমগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বড় কুফর আখ্যায়িত করেছেন:

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা বড় কুফর, যখন শাসক বা বিচারক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানকে অবশ্য-অনুসরণীয় বলে স্বীকার করে না। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণনাটির অর্থ এটিই।[১৮৬] শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম উল্লেখ করেছেন যে, আত-তাবারীর মতেও এটি আল্লাহর অবতীর্ণ শার'ঈ বিধান অস্বীকারের সমার্থক। এই বিষয়ে আলিমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। দ্বীনের কোনো মূলনীতি, ইজমা আছে এ রকম কোনো গৌণ বিষয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে নিশ্চিতরূপে বর্ণিত আছে এমন একটি বর্ণ অস্বীকারকারীও কাফির হয়ে যায়। এ ধরনের কুফর মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এটি এক সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি, যার ব্যাপারে সকল আলিম একমত।[১৮৭]

ইবনু জারীরের যে উদ্ধৃতির ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইঙ্গিত করছেন, সেটি হলো:

"প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আয়াতে এমন ব্যক্তিদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর

---

[১৮৫] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৯২।

[১৮৬] ইবনু জারীর, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং ১২০৬৩।

[১৮৭] তাহকীমুল কাওয়ানীন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, পৃ. ৫, ১ম সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করে না। তাহলে আপনি এর প্রযোজ্যতা সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কে?

এর উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ এখানে সাধারণভাবে তাঁর বিধান অস্বীকারকারীদের কথা বলছেন। এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহ তাদের কাফির হবার হুকুম দিয়েছেন। এ রকম যারাই আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না, তাদের সবার ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। তারা আল্লাহকে অস্বীকারকারী কাফির। ইবনু আব্বাস যেমনটি বললেন। কারণ নবীজিকে নবী হিসেবে জানার পর তাঁকে অস্বীকার করা যেই কথা, কোনো বিধানকে কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত বিধান জেনেও অস্বীকার করা একই কথা।"[১৮৮]

আত-তাবারীর উক্তিটি নিয়ে একটু ভাবুন। নবীজিকে জেনেশুনে অস্বীকার করার সাথে অস্বীকৃতি সম্পর্কে ওপরের আলোচনা এবং হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টির তুলনা করে দেখুন।

২। "আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করা শাসক বা বিচারক আল্লাহ-রাসূল ﷺ -এর বিধানকে সত্য বলে মানে। কিন্তু এও মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত বিধানের চেয়ে অন্য কোনো বিধান উত্তম। মামলা-মোকদ্দমার সুরাহা করার জন্য সেটাকেই জনগণের জন্য বেশি উপযোগী মনে করে। তার এই ধারণা সার্বিকভাবেও হতে পারে, কিংবা স্থান-কালের পরিবর্তনে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সাপেক্ষেও হতে পারে। এমন ধ্যান-ধারণাও নিঃসন্দেহে কুফর। এর মাধ্যমে সৃষ্টির সংকীর্ণ চিন্তার ফসলকে সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার মহান বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।"[১৮৯]

৩। কোনো শাসক বা বিচারক অন্য বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে না ঠিকই, কিন্তু সমান মনে করে। আগের দুটি ক্ষেত্রের মতো এটিও কুফর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। কারণ এখানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য ধরা হচ্ছে।

"...তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই..." [সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১]

এ রকম আরও অনেক আয়াতে আল্লাহর অনন্যতা, ত্রুটিহীনতা ও সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনাহীনতার সাক্ষ্য রয়েছে। সত্তা, বৈশিষ্ট্য, কর্ম ও বিচার—সব দিক দিয়ে তিনি অতুলনীয়।[১৯০]

৪। আবার কেউ হয়তো অন্য বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম বা সমান

---

[১৮৮] তাফসীরুত তাবারি, ১০/৩৫৮।

[১৮৯] তাহকীমুল কাওয়ানীন, পৃ. ৫। আরও দেখুন : মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২৭/৫৮।

[১৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

Scanned by CamScanner

মনে করে ইসলামী বিধান বিংশ শতাব্দীতে প্রয়োগযোগ্য নয়, এটি মুসলিমদের পশ্চাৎপদতার কারণ ইত্যাদি। কেউ ইসলামকে সামগ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুই ব্যক্তিমানুষ ও আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করে। কেউ কেউ চোরের হাত কাটা বা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মারার মতো বিধানগুলোকে বর্তমান যুগের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে। এরা সবাই চতুর্থ ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইসলামী শরীয়াহকে উত্তম মেনেও কেউ মানুষের বানানো আইনকে অন্তত বৈধ মনে করতে পারে। এটার ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ এর মাধ্যমে সে এমন কিছুকে বৈধ গণ্য করছে যেটাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন... এতটুকু মনে করাই কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[১৯৫]

বাতিনী সম্প্রদায় ইসলামী আইনগুলোর বাতিনী (গোপন) অর্থ বের করার নামে এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেয়। এদের কাফির হওয়া নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চরমপন্থী সুফি এবং তাদের কিছু অনুসারী গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করে। দলিলের নামে মুসা ও আল-খিযর (আলাইহিমাস সালাম) এর ঘটনা উল্লেখ করে। তারা দাবি করে, আউলিয়া শ্রেণির বিশেষ মানুষদের জন্য শরীয়াহ লঙ্ঘন বৈধ। এসকল বাতিনী ও চরমপন্থী সুফি গোষ্ঠীর মত খণ্ডন করার সময়ও সাধারণত আলিমগণ ওপরের কথাগুলো তুলে ধরেন।

যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

> "যে মনে করে অন্য কারও পথনির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশের চেয়ে উত্তম, অথবা খিযর আলাইহিস সালাম যেমন মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়াহর অধীনস্থ ছিলেন না তেমনিভাবে কিছু আউলিয়া ইসলামী শরীয়াহর ঊর্ধ্বে, সে কাফির। মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়াহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল না। তাই খিযর সেই শরীয়াহর অধীন ছিলেন না। এমনকি খিযরও মুসাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাকে এমন কিছু বিষয় শিখিয়েছে, যা আপনি জানেন না। আবার আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন, যা আমি জানি না।'

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল-মুত্তালিব ﷺ সমগ্র জিন ও মানব, আরব-অনারব, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, রাজা-প্রজা, বৈরাগী-সংসারী—সকলের প্রতি প্রেরিত। আল্লাহ বলেন,

> "আর আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য শুধুই এক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে...।" [সূরা আস-সাবা, ৩৪:২৮]

---

[১৯৫] মাজমুয়ু ফাতাওয়া ইবনি বায, ১/১৩৭।

Scanned by CamScanner

মনে করে ইসলামী বিধান বিংশ শতাব্দীতে প্রয়োগযোগ্য নয়, এটি মুসলিমদের পশ্চাৎপদতার কারণ ইত্যাদি। কেউ ইসলামকে সামগ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুই ব্যক্তিমানুষ ও আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করে। কেউ কেউ চোরের হাত কাটা বা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মারার মতো বিধানগুলোকে বর্তমান যুগের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে। এরা সবাই চতুর্থ ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইসলামী শরীয়াহকে উত্তম মেনেও কেউ মানুষের বানানো আইনকে অন্তত বৈধ মনে করতে পারে। এটার ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ এর মাধ্যমে সে এমন কিছুকে বৈধ গণ্য করছে যেটাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন... এতটুকু মনে করাই কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[১৯৫]

বাতিনী সম্প্রদায় ইসলামী আইনগুলোর বাতিনী (গোপন) অর্থ বের করার নামে এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেয়। এদের কাফির হওয়া নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চরমপন্থী সুফি এবং তাদের কিছু অনুসারী গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করে। দলিলের নামে মুসা ও আল-খিযর (আলাইহিমাস সালাম) এর ঘটনা উল্লেখ করে। তারা দাবি করে, আউলিয়া শ্রেণির বিশেষ মানুষদের জন্য শরীয়াহ লঙ্ঘন বৈধ। এসকল বাতিনী ও চরমপন্থী সুফি গোষ্ঠীর মত খণ্ডন করার সময়ও সাধারণত আলিমগণ ওপরের কথাগুলো তুলে ধরেন।

যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"যে মনে করে অন্য কারও পথনির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশের চেয়ে উত্তম, অথবা খিযর আলাইহিস সালাম যেমন মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়াহর অধীনস্থ ছিলেন না তেমনিভাবে কিছু আউলিয়া ইসলামী শরীয়াহর ঊর্ধ্বে, সে কাফির। মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়াহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল না। তাই খিযর সেই শরীয়াহর অধীন ছিলেন না। এমনকি খিযরও মুসাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাকে এমন কিছু বিষয় শিখিয়েছে, যা আপনি জানেন না। আবার আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন, যা আমি জানি না।'

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল-মুত্তালিব ﷺ সমগ্র জিন ও মানব, আরব-অনারব, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, রাজা-প্রজা, বৈরাগী-সংসারী—সকলের প্রতি প্রেরিত। আল্লাহ বলেন,

"আর আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য শুধুই এক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে...।" [সূরা আস-সাবা, ৩৪:২৮]

---

[১৯৫] মাজমুয়ু ফাতাওয়া ইবনি বায, ১/১৩৭।

Scanned by CamScanner

কোনো মানুষকে রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যের ঊর্ধ্বে গণ্যকারী কাফির। চাই সে আলেম, মূর্খ, দাস, বাদশাহ যে-ই হোক।"[১৯৬]

কাজেই উপরোক্ত সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে বিচার-শাসন করা বড় কুফর হবার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট এবং এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই।

খ) আল্লাহর আইন-বিরোধী আইন প্রণয়ন

বড় কুফরের আরেকটি প্রকার হলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে :

১। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার। সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় যে পর্যায়ই হোক না কেন। অসংখ্য দলিলের মধ্য থেকে অনেকগুলো উল্লেখও করা হয়েছে। আল্লাহ যাদের হিদায়াত দেন, তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

২। আল্লাহর বদলে মানুষের হাতে সর্বজনীন আইন প্রণীত হওয়া এবং আল্লাহর আইন-বিরোধী আলাদা কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলার দুটি অর্থ :

অ) আল্লাহর শরীয়াহকে কোনো না কোনো আঙ্গিকে অস্বীকার করা। অস্বীকার না করলে একে প্রতিস্থাপিত করবে কেন?

আ) আল্লাহর একটি একচ্ছত্র অধিকার (হালাল-হারাম নির্ধারণ), যা তিনি কেবল নিজের জন্য রেখেছেন, তাতে হস্তক্ষেপ করা।

এ কারণেই আলিমগণের একাংশ শরীয়াহ-বিরোধী আইন প্রণয়নকে হারামকে হালাল বানানো বলে গণ্য করেন। কারণ যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে মনে করে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা হালাল। আলিমগণের এ-সংক্রান্ত কিছু উক্তি সামনে উদ্ধৃত করা হবে ইন শা আল্লাহ।

৩। "*আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না, তারাই 'কাফিরূন*'", আয়াতটির শানে নুযূল নিয়ে একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বুঝবে এখানে নিছক গুনাহর[১৯৭] কথা বলা হচ্ছে না। বিষয়টি এরচেয়েও মারাত্মক।

ইহুদিরা যিনার ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধানকে পালটে ফেলেছিল। খেয়াল করুন,

---

[১৯৬] মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২৭/৫৮-৫ ৯।

[১৯৭] অথবা অবিচারের, যেমন এর আগেও তারা শুধু দুর্বলদের শাস্তি দিত, অভিজাতদের না।

Scanned by CamScanner

তাদের শরীয়াহ অনুযায়ী এমন করা জায়েজ এটা কিন্তু তারা বিশ্বাস করত না। তারা নিজেদের এ কাজটিকে বৈধ বা হালাল মনে করত না। তারা অবাধ্যতাবশত আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আল্লাহর বিধান ছিল বিবাহিত যিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা বলল শাস্তি হলো দোররা মারা এবং মুখে কালি মাখানো। তারপর নিজেদের বানানো বিধানটিকে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য ঘোষণা করল। কিন্তু সেই সাথে তাদের অন্তরে অপরাধবোধও ছিল। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ যখন মদীনাতে আসলেন, তখন তিনি সে সত্য রাসূল, সেটাও তারা মনের গহিনে স্বীকার করত। তারা চাচ্ছিল আল্লাহর শরীয়াহতে তারা যে পরিবর্তন এনেছিল সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর চাপিয়ে দিতে। তাই তারা বলেছিল, তিনি যদি আমাদের মনমতো রায় দেন, তাহলে মানবো। অন্যথায় মানবো না।

ব্যভিচারীর শাস্তি পরিবর্তন করা তো একটি ঘটনা। কিন্তু এটা তাদের নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। তাই আল্লাহ তাদেরকে আখ্যা দেন কুফরে ঝাঁপ দিতে দৌড়ে যাওয়া লোক হিসেবে (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪১ দ্রষ্টব্য)। তাদের কাফির ঘোষণা করেন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে-ই ইহুদিদের অনুরূপ করবে, তার ওপরই ইহুদিদের হুকুমই প্রযোজ্য।

আরও উল্লেখ্য, তাদের ব্যাপারে কুফরের হুকুমের কারণ হলো এ বিষয়ের ওপর ইহুদিদের জাতিগতভাবে ঐকমত্য ছিল। এটি কারও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। তাই কিছু বর্ণনায় আছে যে, ইহুদিরা বলেছিল, “আমরা একমত হয়েছি” অথবা “আমরা এটা নিজেদের মাঝে গোপন রাখতে একমত হয়েছি”...

৪। একটি মত আছে যে, মানবরচিত আইনপ্রণেতা যদি তার এ-সংক্রান্ত কাজকে হালাল মনে না করে, তাহলে সে কাফির হবে না। এমনকি সে যদি এমন সাংবিধানিক বা বিধানসভা তৈরি করে যা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য আইন তৈরি করে, সে ক্ষেত্রেও না।

এ মতটি নিতান্ত দুর্বল। কারণ আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়নকে হালাল মনে করা স্বতন্ত্রভাবে কুফর। এমন বিশ্বাস যে রাখে, সে আইন প্রণয়ন না করলেও কেবল এই বিশ্বাসের কারণেই কাফির। ইহুদিরা কাফির ঘোষিত হয়েছে তাদের বাহ্যিক কাজের কারণেই। তাদের কাফির হবার বিষয়টি কাজটিকে তারা হালাল মনে করছে কি না, তার ওপর নির্ভরশীল না।

৫। হালাল গণ্য না করলে কাফির হবে না—এটি আসলে মুরজিয়াদের মত। মুরজিয়ারা বিশ্বাস করে, ঈমান কেবল অন্তরের ব্যাপার। কর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক তারা

Scanned by CamScanner

স্বীকার করে না। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর অনেক রচনায় তাদের এ মতকে খণ্ডন করেছেন।

৬। সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করা, আর ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট কোনো মামলায় রায় দেয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্য বোঝা জরুরি। সামনে এর আলোচনা আসছে ইন শা আল্লাহ।

এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এখন আমরা বিষয়টির বিস্তারিত আলাপে ঢুকতে পারি। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর বদলে নিজেকে বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের কর্তৃপক্ষ দাবিকারী প্রত্যেকে এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। যারা মানবরচিত আইন প্রণয়ন করে সেটাকে সংবিধানে পরিণত করে, তাদের ব্যাপারেও একই কথা। এসব আইন সে নিজে বানিয়ে থাকুক অথবা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জাহিলিয়্যা থেকে ধার করে থাকুক, সবগুলোই একই শিরোনামের অধীন।

প্রথমে আমরা কিছু আলিমের মতামত উল্লেখ করব। পরিশেষে দেবো একটি সাধারণ উপসংহার।

ইমাম ইবনু হাযম

তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> "আল্লাহ বলেছেন,
>
> *'নিষিদ্ধ মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরির ওপর আরেক কুফরি কাজ যা দ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। এক বছর তারা একটি মাসকে হালাল করে, আরেক বছর ওই মাসটিকে হারাম করে যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করা যায়। এভাবে তারা আল্লাহর হারাম করা মাসগুলোকে হারাম করে...' [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩৭]*
>
> আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী কোনো কিছুর বৃদ্ধি করা সম্ভব শুধু অনুরূপ জিনিস সংযোজনের মাধ্যমে। ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস সংযোজনে বৃদ্ধি হয় না। এটা সত্য যে, পবিত্র মাসের বিধান এদিক-সেদিক করা কুফর। এটি এমন কাজ যার দ্বারা হারামকে হালাল করা হচ্ছে। জেনেশুনে যারা আল্লাহর দেয়া হারামকে হালাল বানায়, তারা ওই কাজের কারণেই কাফির হয়ে যায়।"[১৯৮]

ইবনু হাযমের বক্তব্য একেবারেই স্পষ্ট। হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানানো কুফর। আর জেনেশুনে করা হলে হারামকে হালাল বানানোর কাজটিই স্বতন্ত্রভাবে কুফর হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

---

[১৯৮] আল-ফাসল, ইবনু হাযম, ৩/২৪৫, সম্পাদিত সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

ইমাম আশ-শাতিবি

ইমাম আশ-শাতিবি এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। যেমন : বিদআহপন্থীদের নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে এ আয়াতের উদ্ধৃতি দেন তিনি,

> "হে বিশ্বাসীরা, আল্লাহ যেসব তায়্যিবাত (সকল পবিত্র খাবার, দ্রব্য, কাজ, বিশ্বাস, ব্যক্তি)-কে হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম বানিয়ে ফেলো না..." [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৮৭]

কিছু সাহাবি বিয়ে না করা বা মাংস না খাওয়ার মতো সংকল্প করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই শানে নুযূল উল্লেখের পর আশ-শাতিবি বলেন,

> "...এখানে কয়েকটি বিষয় জড়িত। প্রথমত, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানানোর নানা রকম রূপ রয়েছে। প্রথম প্রকার হলো কোনো কিছুকে হারাম বলে বিশ্বাস করা। যেমন: আরব কুফফাররা বাহীরাহ, সায়িবাহ, ওয়াসীলাহ ও হামি[১৯৯]কে হারাম ভাবত। এই হারাম গণ্য করার ভিত্তি নিতান্তই মানুষের মতামত। আর কিছুই না। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,
>
> *'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বোলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটানোর জন্য...' [সূরা আন-নাহল, ১৬:১১৬]*
>
> মুসলিমরাও এভাবে অনেক সময় মনুষ্য মতামতের ভিত্তিতে কোনো হালালকে হারাম ধরে নেয়..."[২০০]

কৃচ্ছ্র-সাধনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু ত্যাগ করা আর হালালকে পুরোপুরি হারাম বানিয়ে ফেলা এক কথা নয়। দ্বিতীয়টি কুফর। আশ-শাতিবি এখানে এ পার্থক্যটিই দেখাচ্ছেন। জাহিলি যুগের কাফিরদের কুসংস্কারের সাথে তিনি তুলনা করেছেন মানুষের মত মেনে মুসলিমদের হালাল-হারাম পরিবর্তনকে। মানবরচিত আইনপ্রণেতারা ঠিক এ কাজটিই করে থাকে।

---

[১৯৯] এগুলো উটের কিছু প্রজাতি। জাহিলি আরবে মুশরিকদের মাঝে এগুলো নিয়ে কিছু কুসংস্কার ছিল। বাহীরাহ উটনীর দুধ শুধু মূর্তির প্রতি অর্ঘ্যদানের উদ্দেশ্যে দোয়ানো হতো, অন্য কাজে ব্যবহার নিষেধ। সায়িবাহ উটনীকে মূর্তির নাম নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো, সে এমনি চরে বেড়াবে, ভারবহনসহ কোনো কাজে ব্যবহৃত হবে না। ওয়াসীলাহ উটনীর ক্ষেত্রেও একই কথা, কারণ সেটি পরপর দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। আর হামি একটি মর্দা উট, যাকে দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করানো শেষে মূর্তির নামে মুক্ত করে দেওয়া হয়। [ইংরেজি অনুবাদক]

[২০০] আল-ইতিসাম, ১/৩২৮।

Scanned by CamScanner

আরেক জায়গায় আশ-শাতিবি ব্যাখ্যা করেছেন,

"বিদআহর বিভিন্ন মাত্রা আছে। কোনোটা পুরোদমে কুফর, যেমন জাহিলি যুগের যেসব বিদআহর কথা কুরআনে এসেছে :

'আল্লাহর সৃষ্ট ফসল ও গবাদি পশুর একাংশ তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তারপর নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে এটা আল্লাহর জন্য, আর ওটা (আল্লাহর কথিত) শরিকদের জন্য...' [সূরা আল-আনআম, ৬:১৩৬]

'তারা বলে, অমুক অমুক গবাদি পশুর দুধ শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য তা হারাম। তবে তা মৃত হলে এর প্রাপক হিসেবে সবাই সমান...' [সূরা আল-আনআম, ৬:১৩৯]

'বাহীরাহ, সায়িবাহ, ওয়াসীলাহ বা হামি সংক্রান্ত কোনো বিধান আল্লাহ দেননি...' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:১০৩]

মুনাফিকদের বিদআহর ক্ষেত্রেও একই কথা। ইসলামকে তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থরক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। অনুরূপ আরও যেসব ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে কুফর, সেগুলোর ব্যাপারেও এ কথা প্রযোজ্য।"[২০১]

এখন 'অনুরূপ ক্ষেত্র' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? নিঃসন্দেহে এখানে সবার আগে আসবে মানবরচিত সেসব আইন, যা আল্লাহর আইনের পরিপন্থী। কারণ জাহিলি বিধানের মতোই এখানে আল্লাহর বদলে মানুষ আইন প্রণয়ন করছে।

তৃতীয় আরেক স্থানে আশ-শাতিবি বলেন,

"কুফফারের আরও অনেক ছোটখাটো বিদআহর কথা বর্ণিত আছে। এগুলোও মারাত্মক। যেমন : ফসলের একাংশ আল্লাহর নামে ও আরেক অংশ দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা, নানা জাতের উট নিয়ে কুসংস্কার, আপন সন্তান হত্যা, প্রতিশোধ ও সম্পদের উত্তরাধিকারের নিয়ম এদিক-সেদিক করা, বিবাহ-তালাক নিয়ে অবিচার, অন্যায়ভাবে অনাথের সম্পদ আত্মসাৎ-সহ এমন অন্যান্য বিষয় যা শরীয়াহতে বলা হয়েছে এবং আলিমগণ আলোচনা করেছেন। এসব বিধান এদিক-সেদিক করতে করতে একসময় নিজেদের খেয়ালখুশি মতো অবাধে আইন প্রণয়ন করা তাদের নিয়মে পরিণত হয়। ফলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বীনকে ইচ্ছেমতো বদলে ফেলা তাদের কাছে হালকা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে তারা এমন কিছু নীতি তৈরি ও গ্রহণ করে যার ফলে তারা খেয়ালখুশি মতো কোনো বাধা ছাড়াই

---

[২০১] আল-ইতিসাম, ২/৩৭।

Scanned by CamScanner

আইন বানাতে শুরু করে...।"[২০২]

খেয়াল করুন তিনি কী লিখেছেন, *"একসময় নিজেদের খেয়ালখুশি মতো অবাধে আইন প্রণয়ন করা তাদের নিয়মে পরিণত হয়।"*

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ

ইতোমধ্যে এই বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রচুর উদ্ধৃতি আমরা এনেছি। এখানে আরও কিছু যুক্ত করা হবে। জীবদ্দশায় স্বচক্ষে মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর আইন-বিরোধী সংবিধান প্রণীত হতে তিনি দেখেছেন। এ গ্রন্থেই ভিন্ন পরিচ্ছেদে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

শরীয়াহ পরিবর্তন এবং সত্যকে মিথ্যে বানানোর স্পর্ধা দেখানো লোকের ব্যাপারে ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

> "বিচারক যদি জ্ঞান ছাড়া রায় দেয়, তাহলে সে ধর্মপরায়ণ হলেও জাহান্নামী। যদি জেনেশুনে সঠিক রায়ের বিপরীত রায় দেয়, তাহলেও জাহান্নামী। যদি জ্ঞান ছাড়া অন্যায় রায় দেয়, তাহলেও জাহান্নামী হওয়াটাই যৌক্তিক। এটি হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে কথা। কিন্তু যদি সে মুসলিমদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন সর্বজনীন রায় দেয়, মিথ্যেকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যে বানায়, সুন্নাহকে বিদআহ আর বিদআহকে সুন্নাহ, ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর আদিষ্ট হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বানায়, তাহলে চূড়ান্ত বিচারদিবসে বিশ্বজগতের প্রতিপালকই তার বিচার করবেন।
>
> '...প্রথম ও শেষ উভয় জগতে সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্য। হুকুম করার অধিকার তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' [সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭০]
>
> *'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে, যাতে একে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' [সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৮]"*[২০৩]

তিনি কোন প্রেক্ষাপটে কথাটি বলছেন, তাও বিবেচ্য। শরীয়াহ-বিরোধী রায়কে তিনি কতটা গুরুতর বিবেচনা করছেন, খেয়াল করুন। মিনহাজুস সুন্নাহ থেকে ইবনু তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতি আমরা আগেও দিয়েছি। সমগ্র উম্মাহর সাথে সম্পর্কিত রায় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে রায়ের মাঝে সেখানে তিনি পার্থক্য করেছেন।

---

[২০২] আল-ইতিসাম, ২/২১০-৩০২।

[২০৩] মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩৫/৩৮৮, আরও দেখুন : ৩/২৬৭-২৬৮।

Scanned by CamScanner

অনেক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ইসলামের কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এটি মুসলিমদের ইজমা'।[২০৪] এ বিষয়ে তাঁর উদ্ধৃতি পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম

তিনি বলেছেন,

> "কুরআন ও নিশ্চিত ইজমা' থেকে জানা যায় যে, ইসলাম এর আগের অন্য সকল দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে। কুরআনের অনুসরণ বাদ দিয়ে যারা এমনকি তাওরাত-ইনজিলের অনুসরণ করবে, তারাও কাফির। আল্লাহ তা'আলা তাওরাত-ইনজিলসহ সকল জাতির বিধান রহিত করে দিয়েছেন। জিন ও মানবজাতির প্রতি বাধ্যতামূলক করেছেন ইসলামের আইনের অনুসরণ। তাই ইসলাম যা হারাম করেছে, এর বাইরে আর কোনো হারাম নেই। ইসলাম যার আদেশ দিয়েছে, তার বাইরে আর কোনো আদিষ্ট বিষয় নেই।"[২০৫]

ইমাম ইবনু কাসীর

পরবর্তী যুগের যেসব আলিম তাতারদের সমসাময়িক, ইবনু কাসীর তাদের একজন।

> "তারা কি জাহিলি যুগের বিধান চায়? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানপ্রণেতা আর কে আছে?" [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর বলেন,

> "আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ বিধান সকল উত্তম জিনিসের আদেশ দেয়। নিষেধ করে সকল মন্দকে। যারা এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধ মতামত, মানবীয় প্রবৃত্তি আর ভিত্তিহীন বানোয়াট প্রথার অনুগামী হয়, আল্লাহ তাদের প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন। জাহিলি যুগের আরবরা এভাবে নিজেদের মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করত। মঙ্গোলরা (তাতার) একই কাজ করে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের বানানো ইয়াসিক সংবিধানের মাধ্যমে। এই ইয়াসিকের কিছু আইন ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিমসহ অনেকের থেকে ধার করে এনে বানানো। বাকিটা তার নিজের খামখেয়ালি মতামত। তার বংশধরদের মাঝে এর অনুসরণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর ওপর একে তারা প্রাধান্য দেয়। এ রকম আচরণকারীরা কাফির। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানে ফিরে এসে ছোট-বড় সকল বিষয়ে সে অনুযায়ী বিচার

---

[২০৪] প্রাগুক্ত, ২৮/৪৬৮-৪৭১, ৩৫/৩৯৫।
[২০৫] আহকামু আহলিয-যিম্মাহ, ১/২৫৯।

Scanned by CamScanner

করছে, সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।"[২০৬]

বিচারের জন্য ইয়াসিকের শরণাপন্ন হওয়াই কুফর। এখানে সেটাকে বৈধ বা হালাল মনে করার কোনো শর্ত উল্লেখিত হয়নি। তাই আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে ইবনু কাসীর বলেন,

"খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়াহকে যে অগ্রাহ্য করে, রহিত হয়ে যাওয়া কোনো বিধানের দ্বারস্থ হয়, সে কাফির। তাহলে ইয়াসিকের দ্বারস্থ হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর ওপর একে অগ্রাধিকারদাতার কী অবস্থা হবে? যে কেউ এমনটি করবে, মুসলিমদের ঐকমত্যে কাফির সে...।"[২০৭]

পূর্বের রহিত বিধানের কাছে বিচারপ্রার্থীদের ব্যাপারেই যখন ইবনু কাসীর এ কথা বলেছেন, তখন যারা ইয়াসিকসহ আধুনিক সব মানবরচিত আইনের দ্বারস্থ হয়, তারা তো নিকৃষ্টতর।

ইবনু কাসীরের এই ফাতওয়াকে শুধু তাতারদের জন্য সীমাবদ্ধ করতে চাওয়ার চেষ্টা বৃথা। যারা মনে করে ইয়াসিক দিয়ে বিচার করার কারণে না, বরং ভিন্ন কোনো কারণে ইবনু কাসীর তাতারদের কাফির বলেছেন তারা আসলে ইবনু কাসীরের স্পষ্ট বক্তব্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছে যা তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য না। বরং তিনি যে এটা ব্যাপক অর্থে বলেছেন এটা পরিষ্কার, কারণ তিনি বলেছেন, জাহিলি যুগের আরবরা এভাবে নিজেদের মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করত। মঙ্গোলরা (তাতার) একই কাজ করে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের বানানো ইয়াসিক সংবিধানের মাধ্যমে'।

অর্থাৎ তিনি জাহিলি আরবদের বিধান আর তাতারদের ইয়াসিক সংবিধানকে উদাহরণ হিসেবে এনেছেন। তারপর বলেছেন, *"যে কেউ এমনটি করবে, মুসলিমদের ঐকমত্যে সে কাফির।"* উদাহরণগুলো নির্দিষ্ট, কিন্তু কাফির হওয়ার বিধান সার্বিক। নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী আলিমদের কথার ব্যাখ্যা করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

শাইখ আব্দুল-লতীফ ইবনু আব্দির-রহমান

শাইখ আব্দুল লতীফের সমসাময়িক বেদুঈনদের অনেকে কুরআন-সুন্নাহর বদলে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করত। শাইখ আব্দুল-লতীফকে নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, এদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে জানানোর পরও তারা তা না মানলে কাফির আখ্যা দেয়া যায় কি না। তিনি জবাবে বলেন,

---

[২০৬] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৩/১২২-১২৩, আশ-শাব সংস্করণ।

[২০৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩/১১৯।

Scanned by CamScanner

"আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যে শাসন-বিচার করে, বলার পরও কাজটি না ছাড়লে সে কাফির। আল্লাহ বলেছেন,

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]

আরও বলেন, *'তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়...?' [সূরা আলে ইমরান, ৩:৮৩]"*[২০৮].

শাইখ হামাদ ইবনু আতীক

যেসব কারণে কোনো মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায় সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন। এর মাঝে রয়েছে শিরক; বাহ্যিকভাবে মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে একমত হওয়া; মুশরিকদের বন্ধু বানানো; নিন্দা ও তিরস্কার না করে উল্টো মুশরিকদের সাথে তাদের শিরকি অনুষ্ঠানে বসা; আল্লাহকে অথবা তাঁর কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করা; আল্লাহর দিকে আহ্বানকে অপছন্দ করা; আল্লাহর আয়াত শোনা অপছন্দ করা বা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধকে অপছন্দ করা; আল্লাহর কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) অপছন্দ করা; কুরআন-হাদীসের নির্দেশের সাথে একমত না হওয়া, চাই সেটি একটি আয়াতের অংশই হোক না কেন; আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও অবহেলা করা; জাদুটোনা চর্চা করা; এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা।[২০৯]

তারপর তিনি বলেন, *"চৌদ্দতম বিষয় : আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কাছে বিচারের জন্য শরণাপন্ন হওয়া।"* এখানে সূরা আলল -মায়িদাহর ৫০ তম আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর যা বলেছেন (ইতিপূর্বে উল্লে-খিত), তা তিনি উদ্ধৃত করেন। তারপর যোগ করেন,

"বেদুঈন ও তাদের অনুরূপ কর্মকাণ্ড যারা করছে, তাদের ব্যাপারেও একই কথা। বাপ-দাদার প্রথা আর নেতাদের বানানো আইনকে কুরআন-সুন্নাহর ওপর স্থান দেয় তারা। এই অভিশপ্ত নিয়মের নাম আবার দিয়েছে শারউর-রুফাকাহ (বন্ধু আইন, সহজ আইন)। এমনটি যারা করবে, তারা কাফির। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আইনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। শাইখুল

---

[২০৮] আদ্দুরারুস-সানিয়্যাহ, ৮/২৪১। আরও দেখুন : ৮/২৭১-২৭৫, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৬ হিজরি। দাবি করা হচ্ছিল, তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থীদের এ কাজ ত্যাগ করতে বললে তারা মানবে না। এতে যুদ্ধ বেধে যাবে। এই খোঁড়া অজুহাত এখানে তিনি খণ্ডন করেছেন।

[২০৯] দলিলসহ বিস্তারিত তালিকা দেখুন সাবীলুন নাজাত ওয়াল-ফাকাক গ্রন্থে, পৃ. ৭৪-৮৩, আল-ওয়ালীদ ইবনু আব্দির-রহমান আল-ফিরইয়ান।

Scanned by CamScanner

ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

'আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করাকে যারা ফরয বলে মানে না, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। যে মনে করে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মতামত অনুযায়ী বিচার করা বৈধ, সেও কাফির। ন্যায়বিচার যে করতে হবে, এটা দুনিয়ার কোনো জাতিই অস্বীকার করে না। কিন্তু ন্যায়ের সংজ্ঞা একেক জায়গায় একেক রকম। সাধারণত নেতা যেটাকে ন্যায় মনে করে, জনগণও সেটাই মানে। এমনকি মুসলিম দাবিদার অনেক জাতিও নিজেদের প্রথা অনুযায়ী বিচার করে, যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান নয়। যেমন : বেদুঈন জাতি। তারা কুরআন-সুন্নাহর বদলে নেতার নির্দেশ মানাকেই যথেষ্ট মনে করে। এটি কুফর। মুসলিম হওয়ার পরও কিছু জাতি বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে তাদের আগেকার বিধি-বিধানই মানে। আর এর মূল হোতা তাদের নেতৃবৃন্দ। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা হারাম জেনেও যদি তারা এমনটি করতে থাকে, তাহলে তারা কাফির। অন্যথায় অজ্ঞ।'

কথাগুলো সূরা আল-মায়িদাহর ৪৪ তম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি রহম করুন।"[২১০]

শাইখ হামাদের কথাগুলো তো উল্লেখ করা হলোই, তিনি ইবনু কাসীর ও ইবনু তাইমিয়্যাহ থেকে যেসকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাও দেয়া হলো। বিভিন্ন যুগের আলিম বিভিন্ন সময় একই কথা বলছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আল্লাহর আইন-বিরোধী আইন প্রণয়নের ব্যাপারটিকে তাঁরা স্থান-কাল-নির্বিশেষে একইভাবে দেখেছেন। তাই ইবনু কাসীরের ফাতওয়া শুধু তাতারদের ওপর সীমাবদ্ধ না; যেমনটি কেউ কেউ দাবি করে থাকে।

শাইখ আশ-শাওকানি

ইমাম আশ-শাওকানি (রাহিমাহুল্লাহ)-এর যুগে ইয়েমেনের কিছু অংশ ছিল উসমানী শাসনের অধীনে, কিছু ছিল এর বাইরে। কিন্তু পুরো ইয়েমেন-জুড়েই মানুষের দ্বীনদারির অবস্থা ছিল করুণ। শুধু এ বিষয়টি নিয়েই আশ-শাওকানির আলাদা রচনা রয়েছে। সেখানে ইয়েমেনকে তিন অংশে ভাগ করে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রতিটি ভাগে ইসলাম-বিরোধী কী কী ঘটছে, তার মাঝে কোনগুলো কুফর, সব বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশটির ব্যাপারে তিনি লিখেছেন,

"এবার আসা যাক দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায়। অর্থাৎ, যে অংশটি উসমানীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন: উত্তর ও পূর্বাঞ্চল। জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর

---

[২১০] সাবীলুন নাজাত ওয়াল-ফাকাক, হামাদ ইবনু আতীক, পৃ. ৮৩-৮৪, আল-ওয়ালীদ ইবনু আব্দির-রহমান আল-ফিরইয়ান সম্পাদিত, প্রকাশকাল ১৪০৯ হিজরি।

Scanned by CamScanner

রহম করুন, প্রথম ভাগের ব্যাপারে বলেছিলাম, সেখানকার অল্প কিছু লোক ছাড়া আর কেউই ফরয সালাত পড়ে না। অন্যান্য ফরয আমলের অবস্থাও তথৈবচ। ঠিক একই অবস্থা দ্বিতীয় অংশেও; বরং তারচেয়েও খারাপ। তবে এখানে আরও এমন কিছু কুৎসিত পথভ্রষ্টতার দেখা মেলে, যা প্রথম ভাগে নেই।

যেমন: এখানে কিছু লোক তাগূতের সকল আইনকানুন জানে। সকল বিষয়ে বিচারের জন্য এদের কাছেই শরণাপন্ন হয় সবাই। কেউ বিরোধিতা করে না। এরাও আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সামনে এসব কাজ করতে কোনো ভয় বা লজ্জাবোধ করে না। পাহাড়ের ওপরে জ্বলতে থাকা আগুনের মতো বিষয়টি প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট। অথচ বিরোধিতা করার মতো কেউ নেই। নিঃসন্দেহে তা কুফর। এটি আল্লাহ ও তাঁর শরীয়াহর প্রতি অবিশ্বাস। যে শরীয়াহ তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর মুখে, যা তিনি নির্ধারণ করেছেন বান্দাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে। সত্যি বলতে আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আসা সকল আসমানি আইন-বিধানকে অস্বীকার করে বসেছে তারা। এরা যতদিন না ইসলামী শরীয়াহর আইন মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী বিচার করছে, যতদিন না তাগূতের শয়তানি বিধান ত্যাগ করছে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়া ফরয।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। আর এই প্রতিটি কাজই তাদের কাফির ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট। যেমন : এরা নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয় না, এ ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা করে। ইসলামের কোনো সুপ্রমাণিত ও সুপরিচিত বিধান যে অস্বীকার করে, এর বিরুদ্ধাচার করে, বিদ্রোহ করে, বিরুদ্ধাচারকে বৈধ মনে করে, একে হালকাভাবে নেয়, সে কাফির। সে আল্লাহ ও তাঁর বিশুদ্ধ শরীয়াহর ব্যাপারে কুফর করেছে। এটি ইসলামের একদম মৌলিক একটি নীতি।"[২১১]

আশ-শাওকানির এ কথা থেকে বেশ কিছু বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

◆ তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া বড় কুফর।

◆ তাগূতের কাছে বিচার চাওয়া হলো একাধিক কুফরের মধ্যে একটি। এখানে বর্ণিত প্রতিটি কাজই আলাদা আলাদাভাবে কাফির ঘোষণার জন্য যথেষ্ট।

◆ বড় কুফরের কিছু উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। যেমন : সম্পত্তিতে নারীদের উত্তরাধিকার অস্বীকার করা, এটি বাস্তবায়নে পরস্পর সাহায্য করাকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন বড় কুফর হিসেবে।

---

[২১১] রিসালাতুদ দাওয়ায়িল আজিল ফি দাফয়িল আদুওয়িস সায়িল, এটি আর-রাসায়িলুস সালাফিয়্যাহর অংশ, আশ-শাওকানি, পৃ. ৩৩-৩৪।

Scanned by CamScanner

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম

আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়নের বিষয়টিকে শাইখ মুহাম্মাদ বড় কুফর হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। একে তিনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে চারটি আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এর সাথে আরও দুটো হলো :

> "পঞ্চম প্রকারটি সবচেয়ে মারাত্মক। নিঃসন্দেহে এটি শরীয়াহর বিধানের গোঁয়ার বিরুদ্ধাচার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিদ্রোহ। তা হলো শরীয়াহ আদালতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আলাদা আদালত স্থাপন, এর জন্য আলাদা বিধান প্রণয়ন, এসব বিধানের আনুগত্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া ও এগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। শরীয়াহ আদালত যেমন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, ওইসব আদালত গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করে আনা আইনকানুনের মিশেলে। ফ্রেঞ্চ আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইনের পাশাপাশি মুসলিম দাবিদার বিদআতি ফিরকাগুলো থেকেও রসদ নিয়েছে তারা।
>
> অনেক ইসলামী অঞ্চলে এসব আদালত এখন রীতিমতো শেকড় গেড়ে ফেলেছে। পঙ্গপালের মতো মানুষ সেগুলোর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে সেখানকার বিচারকদের কুরআন-সুন্নাহবিরোধী রায় পেতে। সেসব আদালতের রায় মেনে চলা তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়।
>
> এর চেয়ে বড় কুফর আর কী হতে পারে? কালেমা শাহাদাতের এর চেয়ে বড় বিরোধিতা আর কী হতে পারে? আমাদের বক্তব্যের দলিল সুলভ ও সুবিদিত। এখানে আলাদা করে উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই...।"[২১২]

ষষ্ঠ ও শেষ প্রকারের ব্যাপারে তিনি বলেন,

> "ষষ্ঠ প্রকারটি হলো বিভিন্ন বেদুঈন গোত্রের অনুসৃত আইন। এগুলো তাদের বাপ-দাদার গালগল্প ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা এগুলোকে বলে সাল্লুম। এ দিয়েই তারা বিচার-ফায়সালা ও বিরোধের মিটমাট করে। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা এসব জাহিলি বিধান মানে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!"[২১৩]

উল্লেখ্য, মানবরচিত আইন ও এর ইসলাম-বিরোধী উৎসের সমর্থকদের ব্যাপারে

---

[২১২] তাহকীমুল কাওয়ানীন, পৃ. ৬-৭।

[২১৩] প্রাগুক্ত।

Scanned by CamScanner

শাইখ জানতেন। এসব মানবরচিত আইনের উৎস ইসলামী শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু, সেটাও জানতেন তিনি। শরীয়াহ-বিরোধী মানবরচিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক দিক। এখানে আরও দুটি বিষয় মনোযোগের দাবিদার :

♦ যেই উৎস থেকে আইনগুলো তাদের প্রযোজ্যতা ও বৈধতা চয়ন করে।

♦ আইনগুলোর সর্বজনীন প্রযোজ্যতা। অর্থাৎ, সকলের প্রতি এ আইন অনুসরণের বাধ্যবাধকতা।

বোঝাই যাচ্ছে যে, ইসলামী শরীয়াহ ও এই শরীয়াহ প্রদানকারী আল্লাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করা থেকেই এসব মানবরচিত আইন কিংবা বেদুঈন গোত্রগুলোর নিজস্ব আইন উৎসারিত হয়। তবে এ বিষয়টি এখানে বিস্তারিত আলোচ্য নয়।

শাইখ আশ-শানকীতি

এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য প্রচুর। আগেও আমরা এর কিছু উল্লেখ করেছি। এখন আরও কিছু যোগ করা হচ্ছে।

"...তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে অংশীদার করেন না।" (সূরা আল-কাহফ, ১৮:২৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ আশ-শানকীতি বলেন,

"এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে অন্য কিছুর ভিত্তিতে যারা আইন প্রণয়ন করে, তাদের অনুসারীরা মুশরিক। আল্লাহর সাথে তারা শরিক স্থাপন করছে। এ বিষয়টি অন্যান্য আয়াত থেকেও চয়ন করা যায়। যেমন : আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই না করা পশুর মাংস খাওয়া একটি শয়তানি বিধান। এ বিধান অনুসরণকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

'যাতে (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।' [সূরা আল-আনআম, ৬:১২১]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, শয়তানি ওই বিধান মানলে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কারও আনুগত্য করা এবং তাদের আইনের অনুসরণ মানে শয়তানেরই উপাসনা করা।

'হে আদমসন্তান, আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত কোরো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আর আমারই ইবাদাত করো। এটিই সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৬০-৬১]

সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হলো, যারা শয়তানের প্রণীত ও

Scanned by CamScanner

মানুষের মুখ দ্বারা প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ওই আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলেন আল্লাহ এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) মুখে—তাদের কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই, শুধু ওই ব্যক্তি ছাড়া যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওয়াহির উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।"[২১৪]

শাইখ কিন্তু শর্ত দেননি, কাফির হওয়ার জন্য মৌখিকভাবে এসব আইনকে বৈধ বলে বিশ্বাস করতে হবে বা মৌখিকভাবে আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শাইখ বলেছেন, "আদমসন্তানদের নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর আনীত বিধান ছাড়া অন্য বিধান যে মান্য করে তার এই কাজ জঘন্য কুফর...।"[২১৫]

সূরা আশ-শূরার এই আয়াতটি নিয়ে বারোটি পৃষ্ঠা জুড়ে মন্তব্য করেছেন শাইখ :

"যা নিয়েই মতভেদ করবে, তার সিদ্ধান্ত (আল-হুকম) আল্লাহর এখতিয়ারে..." [সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০]

বিষয়টি যে মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ আলোচনায় তার সাথে তাওহীদের সম্পর্ক তিনি দেখিয়েছেন। হুকুম দেয়ার সত্যিকারের অধিকারীর সাথে মানবরচিত আইনের প্রবক্তা ও সমর্থকদের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখিয়েছেন কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই তুলনাটা গুরুত্বপূর্ণ। আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার দাবি রাখে এটি।[২১৬]

তাঁর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলেন,

"স্রষ্টা এখানে স্পষ্টত বলে দিয়েছেন, আর-রহমানের আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে শয়তানের আইন অনুসরণকারীরা মুশরিক। এরা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে। এ এক ঐশী ঘোষণা।"[২১৭]

তিনি আরও বলেন,

"কুফফাররা জেনেশুনে আল্লাহর কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করলে এটা তাদের মূল কুফরের সাথে আরও কুফর যুক্ত করে। এটিই আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন,

'মাস পিছিয়ে দেয়ার এই কাজ কুফরের মাত্রা কেবল বৃদ্ধিই করে। ফলে কাফিররা

---

[২১৪] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৪/৯১-৯২।
[২১৫] প্রাগুক্ত, ৩/৩৪৯।
[২১৬] প্রাগুক্ত, ৭/১৬২-১৬৩।
[২১৭] প্রাগুক্ত, ৭/১৭০।

Scanned by CamScanner

পথভ্রষ্ট হয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসের হিসেব কোনো রকমে মেলানোর তাগিদে এই বছরকে বৈধ, তো ওই বছরকে অবৈধ গণ্য করে তারা। তাদের মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে দেখানো হয় তাদের দৃষ্টিতে। অবিশ্বাসীদের আল্লাহ পথ দেখান না।' [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩৭]

যা-ই হোক, আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়ন করা ব্যক্তির আইনের আনুগত্য যে করে তারা যে শিরক করছে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"[২১৮]

এবার শাইখের আগের উদ্ধৃতিটির সাথে এটি মিলিয়ে পড়ুন। বুঝবেন যে, আল্লাহর আইন মানার ব্যাপারটিকে তিনি সরাসরি ইসলামের ভিত্তি ও তাওহীদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। বলেছেন, অন্য কোনো আইনপ্রণেতার আইন অনুসরণের অর্থ যেন তাকে আল্লাহর বদলে রব হিসেবে মেনে নেওয়া। তিনি বলেন,

"এ রকম ইঙ্গিতবাহী আয়াতের সংখ্যা অনেক। ওপরে আমরা এর অনেকগুলো উদ্ধৃত করেছি। এখন প্রয়োজনীয় সংখ্যকের পুনরাবৃত্তি করছি...।"[২১৯]

মুসলিম উম্মাহ যে আল্লাহর শরীয়াহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আইনপ্রণেতাদের বানানো আবর্জনা দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করেছে, মূর্খ আর মুনাফিকদের অনুসরণ করছে। এতে তিনি সংগত কারণেই প্রচণ্ড দুঃখিত ও ব্যথিত। এ কারণেই এ বিষয়টি নিয়ে তিনি এত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

শাইখ আহমাদ শাকির ও শাইখ মাহমুদ শাকির

তাফসীরু ইবনী কাসীরের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'উমদাতুত তাফসীর। আল্লামা আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) এতে বেশ কিছু টীকা সংযুক্ত করেছেন।[২২০]

"তারা কি জাহিলি যুগের বিধান কামনা করে?..." (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫০), এ আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা উল্লেখ করে শাইখ আহমাদ শাকির টীকা যুক্ত করেছেন (এমনিতে এ টীকাটি বেশ দীর্ঘ। আমরা শুধু অংশবিশেষ উল্লেখ করছি):

"মুসলিমদের ভূমিতে কাফির, মুশরিক, ইউরোপীয়দের আইন দিয়ে শাসন করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এসব আইন তাদের খেয়ালখুশি আর মিথ্যে মতামতের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তিত করে তারা। আইনগুলো

---

[২১৮] প্রাগুক্ত, ৭/১৭৩।

[২১৯] প্রাগুক্ত, ৭/১৬৯।

[২২০] দেখুন : উমদাতুত তাফসীরের টীকা , ৩/১২৫, ৪/১৪৬-১৪৭, ১৫৫-১৫৮ ও ১৬৫-১৬৮।

Scanned by CamScanner

ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নাকি সাংঘর্ষিক—তা তাদের বিবেচ্যই না।

ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি, তাতে মুসলিমরা আজ পর্যন্ত কখনো এ রকম মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম তাতারদের যুগ। ইসলামের শত্রু চেঙ্গিস খানের আবিষ্কৃত আইনকে অষ্টম শতাব্দীর আলিম আল-হাফিয ইবনু কাসীর কতটা কঠিন ভাষায় রদ (খণ্ডন) করছেন, তা তো দেখতেই পেলেন। একই কথা কি আজ চতুর্দশ হিজরি শতাব্দীতে এসেও প্রযোজ্য হওয়ার কথা নয়?

বরং এখনকার মুসলিমদের অবস্থা আরও খারাপ। ইয়াসিকের প্রণেতা ছিল এমন এক কাফির, যার কুফর সুস্পষ্ট। আর আজকের বেশির ভাগ মুসলিম জাতি এমনসব সংবিধান আত্মস্থ করে নিয়েছে, যেগুলোর সাথে ইয়াসিকের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু সেগুলো প্রণয়ন করে মুসলিম দাবিদাররা! এতেই শেষ নয়। এসব আইন-বিধান তারা মুসলিম শিশুদের মুখস্থ করায়। ছেলের বিদ্যে দেখে গর্বিত হয় বাপ। এরা আধুনিক ইয়াসিকের একনিষ্ঠ আনুগত্য তো করেই, এর বিরোধিতাকারীদের কটাক্ষও করে। যারা এদেরকে দ্বীন ও শরীয়াহর দিকে আহ্বান জানায়, তাদেরকে পশ্চাৎপদ, গোঁড়া ইত্যাদি বলে। এসব মানবরচিত আইন যে চরম কুফর, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট...।”[২২১]

তাঁর ভাই মাহমুদ শাকিরের (রাহিমাহুল্লাহ) প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আসা যাক। সূরা আল-মায়িদাহর ৪৪ নম্বর আয়াতের তাফসীরে আত-তাবারী যা বলেছেন, মাহমুদ শাকির তার ব্যাখ্যা করেছেন। আত-তাবারী সেখানে ইবাদিয়্যাহ গোষ্ঠীর ব্যাপারে আবু মিজলাযের একটি উক্তি এনেছেন। নিচে আমরা তা উল্লেখ করব। এতে এক দীর্ঘ পাদটীকা যুক্ত করেন শাইখ মাহমুদ। তিনি বলেন,

“এ যুগের বিদআতিরা যা করে, আবু মিজলাযের কাছে ইবাদিয়্যাহর প্রশ্ন সে ব্যাপারে ছিল না। অর্থাৎ জান, মাল, সম্মান ও সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের বানানো আইন প্রণয়ন বা মুসলিমদের শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো আইন মানতে বাধ্য করার ব্যাপারে তাদের আলোচনা ছিল না। কারণ, এ কাজগুলো আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে, তাঁর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে তার বদলে কুফফারদের বিধান পছন্দ করার নামান্তর। এ কাজ কুফর এবং এর সমর্থকরা কাফির। দলমত-নির্বিশেষে কোনো মুসলিম কোনো কালে এ নিয়ে সন্দেহ

---

[২২১] উমদাতুত তাফসীর, ৪/১৭৩-১৭৪। আরও দেখুন শারহুত তাহাবিয়াহর ওপর তাঁর ব্যাখ্যা, পৃ. ২৫৮, মিসর, ১৩৭৩ হিজরি সংস্করণ এবং আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণের পৃ. ৩৬৪, ৪র্থ প্রকাশ।

Scanned by CamScanner

করেনি।”[২২২]

এগুলো এমন আলিমগণের কথা, যারা মুসলিম বিশ্বে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠার বিপর্যয় স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁদের জীবদ্দশায় মিশর ও অন্যান্য স্থানে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল মানবরচিত জাহিলি আইন।

শাইখ আব্দুর-রায্যাক আফীফি

তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'আল-হুকম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান-বহির্ভূত বিধানের শাসন)। আল্লাহর আইন-বিরোধী শাসকের কয়েকটি প্রকার এতে তিনি উল্লেখ করেছেন। একপর্যায়ে লিখেছেন,

> "তৃতীয় প্রকার হলো এমন শাসক, যে ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবি করে এবং এর বিধিবিধান জানে। জেনেশুনে ইসলাম-বিরোধী আইন বানায় এবং এক আইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলে যা জনগণের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়। এমন ব্যক্তি কাফির, সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে। শরীয়াহ-বিরোধী জেনেও যারা এসব আইন প্রণয়নের জন্য কমিটি বা কাউন্সিল তৈরির আদেশ দেয়, জনগণকে এসব আইন অনুযায়ী বিচার চাইতে আদেশ দেয় বা জোর করে—তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। শরীয়াহ-বিরোধী জেনেও এগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন মোকদ্দমায় রায়দাতা এবং ইচ্ছেকৃতভাবে তাদের আনুগত্যকারীদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। একই বিধান প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রেও, যারা জেনেশুনে ইসলামী আইনের প্রতিদ্বন্দ্বী আইন বানায়, যারা এর বাস্তবায়ন করে, বা উম্মাহকে এসব অনুসরণে বাধ্য করে, অথবা বিচারকের পদ গ্রহণ করে। এসব শাসকের আনুগত্যকারী ও এসব আইন গ্রহণ করা লোকদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। এরা সকলে আল্লাহর হিদায়াতের বদলে আপন প্রবৃত্তির অনুসারী।
>
> *'ইবলীস তার ধারণাকে বাস্তবরূপ দিয়েই ছেড়েছে। তারা তার অনুসরণ করে বসে...' [সূরা আস-সাবা, ৩৪:২০]*
>
> পথভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি, কুফর ও যুলমে তারা পরস্পর সহযোগী। আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস তাদের কোনো কাজেই আসেনি—যখন তারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজস্ব আইন বানিয়ে সেটাকে শাসন ও বিচারের ভিত্তি বানিয়েছে। ঠিক যেমন ইবলীসের জ্ঞান ছিল, সে সত্য জানত, তবুও সে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। এভাবেই তো আপন কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া হয়...।"[২২৩]

---

[২২২] তাফসীরুত তাবারি (পাদটীকা), ১০/৩৪৮।

[২২৩] শুবুহাত হাউলাস-সুন্নাহ এবং গবেষণাপত্র আল-হুকম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ, পৃ. ৬৪-

Scanned by CamScanner

এরপর যেসব আয়াতে আল্লাহর আইনের অনুসরণ ও তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করা বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে, সেগুলো তিনি উদ্ধৃত করেছেন। মানবরচিত আইনপ্রণেতাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তারা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করছে এবং শরীয়াহকে খাটো করে দেখছে।

শাইখের কথায়ও আমরা একই বিষয় দেখতে পাচ্ছি, কুফর হবার বিষয়টি কেবল আল্লাহর শরীয়াহ-বিরোধী আইন মান্য করাকে বৈধ বলে বিশ্বাস করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। কারণ, তিনি বলেছেন, *"আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস কোনো কাজেই আসেনি তাদের।"*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন

আল্লাহর আইন-বিরোধী শাসকের ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে শাইখ প্রথমে একটি দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করেন। এটিকে তিনি দুটি প্রকারে ভাগ করেন, যার প্রথমটি বড় কুফর। এ প্রকারের ব্যাপারে তিনি বলেন,

> "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে হালকাভাবে নেয়া, বা সম্মান না করা, বা অন্য কিছুকে এর চেয়ে সম্মানিত ও জনকল্যাণকর মনে করার কারণে যে শাসক অন্য বিধান দিয়ে শাসন করে, সে কাফির। এমন কাফির, যার কুফর তাকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয়। এদের মধ্যে ওইসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা জনগণের ওপর ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইন চাপিয়ে দেয়। তারা এ কাজ করে, কারণ ওইসব আইনকে তারা আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম মনে করে। কারণ উত্তম মনে করা ছাড়া যে কেউ একটি বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছুর অভিমুখী হতে পারে না, তা তো জানা কথা...।"[২২৪]

তারপর তিনি এর দ্বিতীয় প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন যা যুলম ও ফিসক।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রায় দেয়া এবং সর্বজনীনভাবে অনুসরণীয় আইন প্রণয়নের পার্থক্য নিয়ে তাঁকে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। এর জবাবে তিনি বলেছেন,

> "হ্যাঁ, (এ দুইয়ের মধ্যে) পার্থক্য আছে। সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য আইন প্রণয়নের বিষয়টিকে যুলম বা ফিসক হিসেবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এটি প্রথম প্রকারের ভেতর পড়বে (অর্থাৎ, বড় কুফর)। কারণ যে ব্যক্তি ইসলামী আইন-বিরোধী আইন প্রণয়ন করছে, সে ওইসব আইনকে ইসলামী আইনের চেয়ে উত্তম ও বেশি জনকল্যাণকর ভেবেই তা করছে। যেমনটা আমরা বলেছি, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান

৬৫, দারুল ফাজিলাহ সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি।

[২২৪] আল-মাজমুয়ুস সামীন মিন ফাতাওয়া ফাজিলাতিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি সালিহ ইবনি উসাইমীন, ১/৩৬, সংকলক ও সম্পাদক : ফাহদ ইবনু নাসির আস-সুলাইমান।

Scanned by CamScanner

ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন ও বিচার দুই ধরনের হতে পারে।

১. আল্লাহর দেয়া কোনো বিধান সম্পর্কে জানার পরও সেটাকে মানবরচিত কোনো বিধান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। কারণ ওই ব্যক্তি মনে করে মানবরচিত আইনটি আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম ও অধিক কল্যাণকর বা সমান। অথবা সে মনে করে আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে এমনভাবে আইন প্রণয়ন করা বৈধ। এমনটি যে করবে সে কাফির, ইসলামের সীমা থেকে সে বেরিয়ে গেছে। কারণ যে এমন কাজ করে সে আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে ও ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট নয়। এ আয়াতগুলো তার ওপর প্রযোজ্য :

'তারা কি জাহিলি যুগের বিধান চায়? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানপ্রণেতা আর কে আছে?' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫০]

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]

'কারণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়কে ঘৃণাকারীদের প্রতি তারা বলেছে, 'আমরা এ ব্যাপারে তোমাদের আংশিক অনুসরণ করব।' কিন্তু আল্লাহ তাদের সকল গোপন চক্রান্ত জানেন। কেমন লাগবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে-পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের আত্মা হরণ করবে? কারণ, আল্লাহকে যা রাগান্বিত করে, তারা সেগুলোর অনুসরণ করেছে। আর যা তাঁকে খুশি করে, সেগুলোকে করেছে ঘৃণা। তাই তাদের কর্মকে নিষ্ফল করে দিলেন তিনি।' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:২৬-২৮]

কাজেই তার সালাত-সিয়াম-যাকাত-হাজ্জ তার কোনো কাজে আসবে না। ইসলামের একাংশ প্রত্যাখ্যান করা মানে পুরো ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

'...তবে কি তোমরা কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করে বাকি অংশ প্রত্যাখ্যান করো? যারা এমনটি করবে, তাদের প্রতিফল ইহকালে কেবলই লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের কপালে জুটবে কঠিনতম শাস্তি। তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ বেখবর নন।' [সূরা আল-বাকারাহ, ২:৮৫]

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি কুফরি করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে বলে, 'আমরা কিছু বিশ্বাস করি, কিছু প্রত্যাখ্যান করি', তারা এক ঝুলন্ত পথের অনুসারী। আদতে তারা অবিশ্বাসীই। আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' [সূরা আন-নিসা, ৪:১৫০-১৫১]

Scanned by CamScanner

২. নির্দিষ্ট মোকদ্দমায় বিচারক কর্তৃক এমন রায় দেয়া, যা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যায় তবে সে একে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য বানায় না। এ বিষয়টি আবার তিন রকম হতে পারে :

ক. বিচারক হয়তো এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইনটি জানে। কিন্তু বিশ্বাস করে যে, বিপরীত আইনটি উত্তম ও অধিক কল্যাণকর। অথবা অন্তত সমান। অথবা সে মনে করে আল্লাহর আইনের এহেন বিরুদ্ধাচার বৈধ। এ ক্ষেত্রে সে বিচারক কাফির। ইসলামের গণ্ডি থেকে সে বহিষ্কৃত। ওপরে ১নং এর ক্ষেত্রে যে কারণ, এখানেও তা-ই।

খ. বিচারক ইসলামী আইন জানে এবং একেই উত্তম ও কল্যাণকর মানে। কিন্তু এর বিপরীত রায় সে দিয়েছে কারও ক্ষতি বা উপকার করার লক্ষ্যে। তাহলে সে কাফির নয়, যালিম। এই আয়াতের অধীনে পড়বে সে,

'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না, তারাই 'যালিমূন'(যালিম)।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৫]

গ. বিচারক স্বেচ্ছায় বা কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ রকম রায় দেয়। তাহলেও সে ফাসিক। কাফির নয়। আয়াত অনুযায়ী,

'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না, তারাই ফাসিকূন (ফাসিক)।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৭]

আল্লাহর আইন দিয়ে বিচারের বিষয়টি আজকের যুগের শাসকদের জন্য বিরাট একটি পরীক্ষা। পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত না। কারণ বিষয়টি খুবই গুরুতর। আল্লাহ যেন আমাদের শাসক ও তাদের উপদেষ্টাদের সংশোধিত করে দেন। আল্লাহ যাদের জ্ঞান দিয়েছেন, তাদের উচিত এ ব্যাপারগুলো শাসকদের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়া। যাতে তাদের ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা হয়। তাহলে যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা স্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হবে। আর যাদের বেঁচে থাকার, তারা বেঁচে থাকবে স্পষ্ট প্রমাণ দেখেই (সূরা আল-আনআম, ৬:৪২ এর প্রতি ইঙ্গিত)।

কেউ যেন এ ব্যাপারে সঠিক কথা বলতে নিজেকে ছোট মনে না করে। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না। কারণ সম্মান, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব শুধুই আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনগণের। আর আল্লাহই সকল শক্তির মালিক।"[২২৫]

দ্বিতীয় ফাতওয়াটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো, যাতে শাইখের বক্তব্যের সঠিক ও স্পষ্ট

---

[২২৫] আল-মাজমুয়ুস সামীন, ১/৩৭-৩৯।

Scanned by CamScanner

একটি চিত্র পাওয়া যায়। তবে শাইখের উল্লেখ করা দ্বিতীয় প্রকারটি নিয়ে আরও আলোচনা পরের পরিচ্ছেদে আসবে ইন শা আল্লাহ।

উল্লেখ্য, সর্বজনীনভাবে ও নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে, উভয় ক্ষেত্রেই মানবরচিত আইনকে আল্লাহর আইনের চেয়ে হয় উত্তম, নয়তো সমান বা এর দ্বারা বিচারকে অন্তত বৈধ মনে করলে শাইখ একে বড় কুফরের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন।

আলিমগণের এসকল উদ্ধৃতির সারমর্ম হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন-বিচার করা বড় কুফর হবে নিম্নোক্ত লোকদের ক্ষেত্রে :

অ. যারা আল্লাহর বদলে নিজেদেরকে বৈধ-অবৈধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকারী বানিয়ে নেয়। সেটা কোনো ব্যক্তি, দল, পার্লামেন্ট যেকোনো কিছুই হতে পারে। এভাবে তারা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এমনসব আইন বানায়, যা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। জনগণের ওপর তো এগুলো চাপিয়ে দেয়া হয়-ই, আল্লাহর শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার চাইতেও বাধা দেয়া হয়।

আ. আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যায়, এমন আইন ও ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতারা। এটি এখনকার অনেক মুসলিম দেশের সংবিধানের মতো। এখানে এমনসব বৈধ-অবৈধের ব্যাপার আছে, যা কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বিপরীত।

ই. যারা জেনেশুনে গোত্রীয় ও পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া এমনসব প্রথা ও বিধান (যেমন বেদুঈনদের সাল্লুম) আঁকড়ে ধরে থাকে, যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়ার সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তা মনোযোগের সাথে মেনে চলতে হবে।

গ) জেনেশুনে শরীয়াহ পরিবর্তনকারীদের আনুগত্য করা

এ ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল ও স্পর্শকাতর। এটিও বড় কুফরের একটি প্রকার। তবে ওপরের শিরোনামটি যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হবে এভাবে বললে : 'যারা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে, তাদের আইন শরীয়াহ ও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে জেনেও তাদের আনুগত্য করা'।

বিষয়টিকে পিচ্ছিল বলার একটি কারণ আছে। এই ফাতওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ একটি বিরাট ভুল করে। মানবরচিত সংবিধানে পরিচালিত মুসলিম দেশের সবাইকে তারা ঢালাওভাবে কাফির আখ্যা দিয়ে বসে। এ রকম আইনের বিরোধিতাকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী ছাড়া সমাজের আর কাউকে ছাড় দেয়া হয় না সেসব ফাতওয়ায়। নিঃসন্দেহে এ এক চরমপন্থী অবস্থান, যা কুরআন-হাদীসের মূলপাঠের সঠিক বুঝ ও

Scanned by CamScanner

এর সঠিক বাস্তব প্রয়োগের সাথে সাংঘর্ষিক।

এই আয়াত ও এর অনুরূপ আয়াত নিয়ে আলোচনার সময় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে,

> "তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহর পাশাপাশি তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে..." [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৩১]

এ ছাড়া আদি ইবনু হাতিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটিও এ আলোচনার অংশ। এ আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহর ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর এই ব্যাখ্যাগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, এ ব্যাপারে আরও কিছু মন্তব্য যোগ করা।

তিনি বলেন,

> "পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণকারীরা দুই প্রকার:
>
> ক) একদল জানে যে, পুরোহিতরা রাসূল ﷺ -এর বার্তাকে বিকৃত করেছে। এবং তারা এই বিকৃতিতে তাদের অনুসরণ করেছে। তাদের ধর্মীয় নেতারা আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছে, জেনেও নবীদের আনীত দ্বীনের বিপরীতে তারা সেটা অনুসরণ করেছে। আনুগত্য করেছে। এটি কুফর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ একে শিরক বলেছেন; যদিও তারা পুরোহিতদের উপাসনা করেনি, তাদেরকে সিজদা করেনি।
>
> জেনেশুনে যারা এভাবে দ্বীনের বিরুদ্ধে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আদেশের বদলে অন্যথা বিশ্বাস করে, তারা সূরা তাওবাহর আয়াতে বর্ণিত লোকদের মতো মুশরিক।
>
> খ) আরেকদল স্পষ্টভাবে বুঝত যে তাদের পুরোহিতরা আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করছে। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তারা পুরোহিতদের আনুগত্য করল। এদের অবস্থা ওই মুসলিমদের মতো, যারা জেনেবুঝে গুনাহ করে। অতএব তারা গুনাহগার গণ্য হবে; কাফির নয়...।"[২২৬]

তাই যেসব জনগণের ওপর মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করা হচ্ছে তাদের সকলে ঢালাওভাবে কাফির বলা সম্ভব নয়। বলতে হলে বেশ কিছু শর্ত আগে পূরণ হতে হবে। যেমন :

- মানবরচিত আইনের শাসকরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে পরিবর্তন করছে, এটা জেনেশুনে তাদের আনুগত্য করা।

---

[২২৬] আল-ঈমান, পৃ. ৬৭, আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণ; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৭০।

Scanned by CamScanner

♦ আনুগত্যকারীরা যে সেটাকে আসলেই গ্রহণ করে ও সমর্থন করে, এ রকম কোনো নিদর্শন থাকা। তাহলে বোঝা যাবে যে, বৈধ-অবৈধের ব্যাপারে তারাও ওই শাসকদের মতোই বিশ্বাস পোষণ করে।

তাই শাসক ও শাসিতের বিধান এক নয়। কারণ শাসিতরা আপন প্রবৃত্তির বশেও এসব আইন মান্য করে থাকতে পারে, অথবা এ ব্যাপারে অজ্ঞ হয়ে থাকতে পারে, কিংবা তাদের বাধ্য করা হয়ে থাকতে পারে। আবার তাদের এমন কোনো অজুহাত থাকতে পারে, যাতে তারা কিছু ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে, কাফির না।

এইসকল সম্ভাবনার কারণে বলতে হয় যে, আনুগত্যকারীকে কাফির আখ্যা দিতে হলে অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রমাণ লাগবে। কারণ ইসলাম নাকচ হয়ে যাওয়ার স্পষ্ট কারণ ও শর্ত পাওয়া না গেলে মুসলিম জনগণকে মুসলিমই বিবেচনা করতে হবে। মুসলিমদের ব্যাপারে এটিই সাধারণ মূলনীতি।

শাসিত জনগণের আসলে এ ব্যাপারে কোনো ক্ষমতা নেই। তাই তাদের বিধান অনেকটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রায়দাতা বিচারকের মতো। সে নিজের কাজটিকে বৈধ ভাবলে তা বড় কুফর। অন্যথায় সে কবীরা গুনাহগার ফাসিক। যদি শাসকের আইন আল্লাহর আইনের বিরোধী জেনেও তারা এর সাথে সম্মত হয় বা একে স্বীকৃতি দেয়, সমর্থন করে, তাহলে তা বড় কুফর। অন্যথায় তারা ফাসিক।

তারপরও ভুলভ্রান্তি বা সংশয়ের অবকাশ দূর করতে আমরা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীনের এ-সংক্রান্ত ফাতওয়া উদ্ধৃত করছি। হালাল-হারামের বিধান পরিবর্তনকারী আলিম ও সরকারের আনুগত্যকারীদের বিধান জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হয় তাকে। জবাবে তিনি বলেন,

"বিষয়টিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

ক. শরীয়াহর বিধানকে অপছন্দ করা, আলিম বা সরকারের বিধানকে সমর্থন করা ও আল্লাহর বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়ার কারণে সেগুলোর আনুগত্য করা। এ রকম ব্যক্তি কাফির। এখানে আল্লাহর বিধানকে ঘৃণা করা হচ্ছে। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে ঘৃণা করা কুফর। আল্লাহ বলেন,

'কারণ, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে ঘৃণা করে। তাই তাদের কর্মকে নিষ্ফল করে দিলেন তিনি।' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৯]

মানুষের আমল নিষ্ফল হয়ে যায় কুফরের কারণে। তাই আল্লাহর বিধানকে ঘৃণাকারী-মাত্রই কাফির।

খ. আল্লাহর আইনকে স্বীকার ও একেই দেশের জন্য উত্তম মনে করা সত্ত্বেও আপন

Scanned by CamScanner

প্রবৃত্তির কারণে শাসকের আইন মান্য করা। এমন ব্যক্তি কাফির নয়, সে ফাসিক।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন কাফির নয়। আমার উত্তর হলো, সে তো আর আল্লাহর দেয়া বিধানকে অস্বীকার করছে না। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ব্যক্তিগত লোভ-লালসার কারণে। তাই সে অন্যান্য সাধারণ পাপাচারীর মতোই।

গ. অজ্ঞতাবশত মানবরচিত বিধানকে আল্লাহর বিধান ভেবে আনুগত্য করা। এটিকে আবার দুটি উপভাগে ভাগ করা যায় :

- যারা নিজে থেকে সত্যটা খুঁজে নিতে সক্ষম, কিন্তু অলসতাবশত সেটা করে না। এমন ব্যক্তি গুনাহগার। কারণ আল্লাহ আদেশ করেছেন অজানা বিষয়গুলো জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতে।

- যারা সত্য খুঁজে নিতে সক্ষম নয়। তাই তারা সত্য মনে করে অন্যদের অনুসরণ করে। এদেরকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ তাদের ওপর যতটুকু দায়িত্ব ছিল, ততটুকু পালন করেছে তারা...।"[২২৭]

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে শুধু প্রথম ভাগটি বড় কুফরের আওতাধীন। ইবনু তাইমিয়্যাহর উল্লেখিত প্রথম ভাগও এটিই। যেসব শর্ত ও নীতিমালা উল্লেখ করা হলো, এই ভাগটি সেগুলোর অধীন। সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

মোটকথা, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার-শাসন করা তিনটি ক্ষেত্রে বড় কুফর হবে :

ক) আদর্শিক বা বিশ্বাস সংক্রান্ত : অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানক সরাসরি অস্বীকার করা, অন্য আইনকে উত্তম মনে করা, এমন আইন প্রণয়নকে বৈধ মনে করা ইত্যাদি (এটি কয়েক ভাবে হতে পারে)।

খ) আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যায়, এমন আইন প্রণয়ন : কোনো দেশের জন্য মানবরচিত আইন নির্মাণ ও প্রচার করা (এরও বিভিন্ন ধরন আছে, যার প্রতিটি কুফর আকবার)।

গ) আল্লাহর শরীয়াহর বিরুদ্ধাচার করা হচ্ছে জেনেও ওইসব শাসকের আনুগত্য করা (এটি একটি ক্ষেত্রে কুফর আকবার) ।

প্রতিটি প্রকার ওপরে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা যাব পরবর্তী আলোচনায়।

---

[২২৭] আল-মাজমুয়ুস সামীন, ২/১২৯-১৩০।

Scanned by CamScanner

মানবরচিত আইনের শাসন কখন ছোট কুফর

সূরা আল-মায়িদাহর আলোচ্য আয়াতটির ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে,

> "এটি ছোট কুফর। আল্লাহ ও আখিরাতে অস্বীকার করার মতো কুফর নয়।"

তিনি আরও বলেছেন,

> "তারা যে কুফরের কথা ভাবছে, এটা সেই কুফর নয়।"

এ-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। একদলের অবস্থান হলো, শাসক বা বিচারক যদি মানবরচিত বিধানকে অবৈধ বা হারাম মনে না করে তা দিয়ে শাসন-বিচার করে, তাহলে তা বড় কুফর হবে না। এ মতের অনুসারীরা ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এই উক্তিগুলোকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাদের মতে, উক্তিটির অর্থ ও প্রযোজ্যতা সার্বিক ও ব্যাপক। এই মতটি আমরা এখন পর্যালোচনা করব।

সঠিক মত হলো, বিষয়টি অতটা সরলরৈখিক নয়। মানবরচিত আইনের বিষয়টি কিছু ক্ষেত্রে বড় ও কিছু ক্ষেত্রে ছোট কুফর হয়ে থাকে। বড় কুফরের ক্ষেত্রগুলো তো ওপরে দেখলামই। এবার আসুন ছোট কুফরের আলোচনায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, আশ-শানকীতি, ইবনু উসাইমীন প্রমুখের উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখলাম, আল্লাহর আইন-বিরোধী আইন দিয়ে বিচার করা কিছু ক্ষেত্রে ছোট কুফর হয়। কিন্তু স্পষ্টতার স্বার্থে এখানে আমরা আরেকজন আলিমের উক্তি যোগ করছি। তারপর এ বিষয় সংক্রান্ত আরও কিছু নীতিমালা তুলে ধরছি। ছোট কুফরের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখের পর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম বলেন,

> "...কারণ বিচারক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানকে সত্য মেনেও প্রবৃত্তিবশত ভিন্ন রায় দিয়ে থাকতে পারে। যদিও সে যে ভুল করছে ও সত্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, সে নিজেও তা স্বীকার করে।
>
> যদিও এ কুফর তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না, তারপরও এটি মারাত্মক পাপ। ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি, মিথ্যাচারের মতো কবীরা গুনাহর চেয়েও এটি গুরুতর। যেসব পাপকে আল্লাহ তাঁর কিতাবে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলো অন্যান্য গুনাহর চেয়ে নিকৃষ্ট।"[২২৮]

ওপরে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীনের উক্তি থেকে আমরা

---

[২২৮] তাহকীমুল কাওয়ানিন, পৃ. ৭।

Scanned by CamScanner

জেনেছি যে, ছোট কুফরের বিধান শুধু নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে দেয়া রায়ের জন্য প্রযোজ্য। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কথার সঠিক ব্যাখ্যা এটিই। সামনের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে।

কুরআন-হাদীসের মূলপাঠ ও আলিমদের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর আইন-বিরোধী বিচার ছোট কুফর হতে হলে এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে :

১. এমনিতে সেই অঞ্চলে বা দেশে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী থাকতে হবে। বিচারের ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। শাসক বা বিচারক তা স্বীকার করবেন। বিচারক বা শাসক কোনো নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-বিরোধী রায় দিক বা না দিক, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা বৈধ, এমনটা সে মনে করে না।

২. রায়টি হতে হবে নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে। এমন কোনো সাধারণ নীতি বা আইন হতে পারবে না, যা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।[২২৯]

৩. আল্লাহর বিধানই যে সত্য এবং এটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা যে বৈধ নয়, তা তাকে মানতে হবে। আরও মানতে হবে যে, নির্দিষ্ট মোকদ্দমায় এর বিপরীত রায় দিয়ে সে গুনাহগার হচ্ছে। সে যদি তার শরীয়াহ-বিরোধী রায়কে বৈধ ভাবে এবং নিজেকে গুনাহগার মনে না করে, তাহলে তার কুফর আর ছোট কুফরে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

ইবনু আব্বাস (রা.)-এর মন্তব্য, কুফর দুনা কুফরের ব্যাখ্যা

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর "কুফর দুনা কুফর" (ছোট কুফর) কথাটিকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে দাবি করা হয় যে, মানবরচিত আইনকে হারাম হিসেবে মেনে নিয়ে কেউ যদি সেই আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে বা শাসন করে, তাহলে সে কাফির হবে না। এমন দাবিকারীরা বলে থাকেন,

"উক্তিটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে কিন্তু একে বৈধ মনে করে না, এমন শাসককে কাফির বলা খারিজিদের বৈশিষ্ট্য। আবু মিজলায লাহিক ইবনু হুমাইদের বর্ণনাটি থেকে জানা যায় যে, ইবাদিয়্যাহ গোষ্ঠীর সাথে

---

[২২৯] আত-তাহাবিয়াহর ব্যাখ্যাদাতা ইবনু আবিল-ইয আল-হানাফি বলেন, "সে (বিচারক) যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত রায় দেওয়াকে ঐচ্ছিক বলেও মনে করে, অথবা নিশ্চিত জেনেও আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে, তাহলে তা বড় কুফর। আর যদি আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার করাকে ফরয বলে মানে, ওই ক্ষেত্রের সঠিক বিধানটি জানে এবং নিজেকে শাস্তিযোগ্য মেনেই সে বিধানের অন্যথা করে, তাহলে সে পাপাচারী। এ ক্ষেত্রে কাফির শব্দটি রূপক তথা ছোট কুফর অর্থে ব্যবহৃত হবে...।" শারহুত তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪, ৪র্থ সংস্করণ, আল-মাকতাবুল ইসলামী।

Scanned by CamScanner

তাঁর এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় হলো, তৎকালীন শাসকদের ওপর 'কাফিরূন' আয়াতটি প্রযোজ্য কি না। ইবাদিয়্যাহ গোষ্ঠী বলছিল যে, হ্যাঁ, প্রযোজ্য। কিন্তু আবু মিজলায এদের সাথে একমত হননি। তিনি বলেছেন যে, তারা কুফফার নয়, স্রেফ পাপাচারী।"

ওপরে তাফসীরুত তাবারীর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি শাইখ মাহমুদ শাকিরের মন্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি যা থেকে এই দাবি ভুল প্রমাণিত হয়।[২৩০] এখন আমরা আত-তাবারীর বর্ণনা থেকে আবু মিজলায ও ইবাদিয়্যাহর কথোপকথনটি উল্লেখ করব। তারপর এ নিয়ে পর্যালোচনা করব।

আবু মিজলায ও ইবাদিয়্যাহর ঘটনা

আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন,

ইমরান ইবনু হুযাইর বলেছেন, বানু আমর ইবনু সাদূস গোত্রের কিছু লোক আবু মিজলাযের কাছে এসে বলল, "হে আবু মিজলায, আপনি কি এই আয়াতটিকে সত্য বলে মানেন?

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, মানি।"

"এই আয়াত মানেন?

'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যারা বিচার-ফায়সালা করে, তারাই 'যালিমূন'।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৫]"

"হ্যাঁ, তাও মানি।"

"আর এই আয়াতটি?

'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যারা বিচার-ফায়সালা করে, তারাই 'ফাসিকূন'।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৭]"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা। এখন বলুন তো, এরা (তৎকালীন শাসকবর্গ) কি আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে শাসন করছে?"

তিনি বললেন, "এটাই তাদের দ্বীন যা তারা অনুসরণ করে, যার ওপর তারা ঈমান

---

[২৩০] তাফসীরুত তাবারি, ১০/৩৪৮। তাঁর ভাই শাইখ আহমাদ শাকির এটি উদ্ধৃত করেছেন, উমদাতুত তাফসীর, ৪/১৫৫-১৫৮।

Scanned by CamScanner

এনেছে, এবং যার প্রতি তারা অন্যদের আহ্বান করে। যদি এর কোনো অংশের প্রতি তারা অবহেলা করে, তাহলে নিজেদের গুনাহগার জেনেই করে।"

তারা বলল, "না। আল্লাহর কসম, আপনি আসলে (শাসকদেরকে) ভয় পাচ্ছেন।"

তিনি বললেন, "এ কথা আমার চেয়ে আপনাদের ব্যাপারে বেশি খাটে। আমি তো আপনাদের এই মতের সমর্থক নই। আপনারা সমর্থন করেন এবং তাতে ভুল কিছু খুঁজে পান না। এ আয়াতগুলো ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।"

ইমরান বিন হুযাইরের আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, একদল ইবাদিয়্যাহ এসে আবু মিজলাযের সাথে বসে। তারপর সূরা আল-মায়িদাহর আয়াত তিনটি উল্লেখ করে। আবু মিজলায প্রশাসকদের ব্যাপারে বলেন,

"তাদের যা করার, তা করছে। এটা যে গুনাহ, তারা তা জানে। এ আয়াতগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।"

তারা বলল, "আল্লাহর কসম! আমরা যা জানি, আপনিও তা-ই জানেন। কিন্তু ওদের ভয় পান।"

তিনি বললেন, "এসব কথা বরং আমার বদলে আপনাদের ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য। আপনারা যা জানেন, আমি তা সমর্থন করি না।"

তারা জবাব দিলো, "কিন্তু জানেন তো বটে। কিন্তু শাসকদের ভয়ে আপনি সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করছেন না।"[২৩১]

এ বর্ণনাটিকে ব্যবহার করে অনেকে দাবি করে আধুনিক কালে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করা শাসকের ব্যাপারে কুফরের কথা বলা উক্ত বর্ণনার খারিজিদের মতো কাজ। শাইখ মাহমুদ শাকির তাদের এই যুক্তি খণ্ডন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম :

১। লাহিক ইবনু হুমাইদ (আবু মিজলায) একজন বিশ্বস্ত তাবিয়ি। শাইবানি সাদূসি গোত্রের সদস্য। তিনি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে ভালোবাসতেন। জামাল ও সিফ্‌ফিন যুদ্ধে তার গোত্র বানি শাইবান ছিল আলীর পক্ষে। খারিজিদের উদ্ভবের পর বানি শাইবান ও বানি সাদূস ইবনু শাইবানের একটি দল তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু ইবাদের অনুসারী, যে খারিজিদের ইবাদিয়্যাহ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এদের মতে, দুজন প্রতিনিধির মধ্যস্থতাকে গ্রহণ করে নেয়ার কারণে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নাকি কাফির হয়ে গেছেন! এরা ভেবেছিল, মধ্যস্থতাকারীদের মেনে নেয়ার মাধ্যমে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর অবতীর্ণ

---

[২৩১] তাফসীরুত তাবারি, ১০/৩৪৭-৩৪৮, বর্ণনা নং ১২০২৫ এবং ১২০২৬।

Scanned by CamScanner

বিধানের বিরুদ্ধাচার করছেন।

ইবাদিয়্যাহ ফিরকা তাদের প্রতিপক্ষের ভূমিকে দারুল ইসলাম বলে মানত ঠিকই। শুধু ওখানকার শাসকের এলাকাটিকে মনে করত দারুল কুফর। আর কবীরা গুনাহগারদের আল্লাহর নিআমাত অস্বীকারকারী হিসেবে কাফির মনে করত। তারা বিশ্বাস করত, কবীরা গুনাহগাররা আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

ইবাদিরা আবু মিজলাযের কাছে প্রমাণ করতে চাইছিল, সেখানকার প্রশাসকরা কাফির। কারণ একে তো তারা শাসকের অনুগত, পাশাপাশি তারা হয়তো কোনো পাপ বা হারামে লিপ্ত হয়ে থাকতে পারে। তাই প্রথম বর্ণনামতে আবু মিজলায বলেছেন,

"যদি এর কোনো অংশের প্রতি তারা অবহেলা করে, তাহলে নিজেদের গুনাহগার জেনেই করে।" অথবা দ্বিতীয় বর্ণনামতে তিনি বলেছেন, "তাদের যা করার, তা করছে। এটা যে গুনাহ, তারা তা জানে।"

তাই এ ঘটনাকে বর্তমানের বিদআতিরা যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়, আবু মিজলাযের কাছে ইবাদিয়্যাহর প্রশ্ন সে ব্যাপারে ছিল না। অর্থাৎ জান, মাল, সম্মান ও সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের বানানো আইন প্রণয়ন বা মুসলিমদের শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো আইন মানতে বাধ্য করার ব্যাপারে তাদের আলোচনা ছিল না। কারণ, এ কাজগুলো আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে, তাঁর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে তার বদলে কুফফারদের বিধান পছন্দ করার নামান্তর। এ কাজ কুফর এবং এর সমর্থকরা কাফির। দলমত-নির্বিশেষে কোনো মুসলিম কোনো কালে এ নিয়ে সন্দেহ করেনি।[২৩২]

২। সাম্প্রতিক কালের আগে, ইসলামের ইতিহাসে এর আগে কখনোই কোনো শাসক নিজে কোনো বিধান প্রণয়ন করে জনগণকে সে অনুযায়ী বিচার চাওয়ার আদেশ দেননি। আবু মিজলাযের সময় অর্থাৎ উমাইয়্যাহ শাসনামলেও এমন কিছু হয়নি। যা হতো, তা বড়জোর প্রশাসকদের পক্ষ থেকে কিছু পাপাচার, অত্যাচার, অবিচার। আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক রায় দেয়ার ঘটনাগুলো নির্দিষ্ট মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। অজ্ঞতাবশত যদি কেউ রায় দিয়ে থাকে, তাহলে তো অজ্ঞতার অজুহাত খাটবে। যদি প্রবৃত্তির বশে দিয়ে থাকে, তাহলে এটা গুনাহ যা থেকে তাওবাহ করতে হবে। অর্থাৎ ওই বিচারক আল্লাহর বিধানকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করবে ও মেনে নেবে। আর আলিমদের মতভেদের কারণে ভুল ব্যাখ্যার ফল হয়ে থাকলে তো আলাদা কথা।

---

[২৩২] তাফসীরুত তাবারি, ১০/৩৪৮, সম্পাদকের টীকা।

Scanned by CamScanner

আবু মিজলাযের সাথে ইবাদিয়্যাহর কথোপকথন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে বা মামলায় সংঘটিত সীমালঙ্ঘন ও অবিচারকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। "কিন্তু আবু মিজলাযের সময়কালে হোক, বা তার আগে-পরে, এমন কোনো শাসক ছিল না যারা শরীয়াহর কোনো বিধান অস্বীকার করে এর বিপরীত রায় প্রদান করেছে। অথবা ইসলামের বিধানের ওপর কুফফারদের বিধানকে প্রাধান্য দিয়েছে। আবু মিজলাযের সাথে ইবাদিয়্যাহর কথোপকথন এ ব্যাপারে ছিলই না।"[২৩৩]

শাইখ মাহমুদ শাকিরের কথার সাথে আমি আরেকটু যোগ করছি।

৩। আবু মিজলাযের জীবনী পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে[২৩৪]:

ক) তিনি খাওয়ারিজদের ব্যাপারে খুব তৎপর ছিলেন। তাদের সাথে আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সংঘটিত ঘটনার একজন বর্ণনাকারী তিনি। খারিজিরা একবার আব্দুল্লাহ ইবনু খাব্বাব এবং তাঁর গর্ভবতী দাসীকে হত্যা করে। তখন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথিদের বলেন, খারিজিরা উসকানি না দিলে কেউ যেন আগ বাড়িয়ে তাদের আক্রমণ না করে। এই সুবিদিত ঘটনাটির বর্ণনাকারীও আবু মিজলায।[২৩৫]

এ থেকে মনে হয় যে, ইবাদিয়্যাহ সহ সমসাময়িক খারিজিদের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট তৎপরতা ছিল।

খ) তিনি কোনো এককালে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনীকাররা লিখেছেন যে, কুতাইবা ইবনু মুসলিম আল-বাহিলির সাথে তিনি খুরাসানে এসেছিলেন। ইবনু আসাকির লিখেছেন, ওয়াকী ইবনু আবি আসওয়াদের আগে মার্ভবাসীরা আবু মিজলাযের কাছে এসে তাকে গভর্নর নিযুক্ত করে।[২৩৬] বর্ণিত আছে যে, তিনি কুতাইবা ইবনু মুসলিমের কাফেলার সাথে চলতেন...।[২৩৭]

---

[২৩৩] তাফসীরুত তাবারি, ১০/৩৪৯, সম্পাদকের টীকা।

[২৩৪] তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু দেখলাম যে, এ ব্যাপারে তথ্য বেশ সংক্ষিপ্ত। অন্য বিশেষজ্ঞরা যে তাঁকে সিকাহ (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী) বলেছেন, এগুলোর মাঝেই সব আলোচনা সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে বিশদ যে পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছে, তা মাকতাবাতুদ্দারে থাকা তারীখু দিমাশক (১৮/৩-১০)। তাঁর জীবনী জানতে দেখুন : আত-তারীখ আল-কাবীর, বুখারি, ৮/৫৮; তাবাকাতু ইবনি সাদ, ৭/২১৬; আস-সিকাত, ইবনু হিব্বান, ৫/৫১৮; আল-জারহ ওয়াত-তাদীল, ৯/১২৪; তাহযীবুল মিজ্জি পাণ্ডুলিপি; তাহযীবুত তাহযীব, ইবনু হাজার, ১১/১৭১; মীযানুল ইতিদাল, ৪/৩৫৬ ইত্যাদি।

[২৩৫] আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শাইবা, ১৫/৩০৮, ৩২৩, বর্ণনা নং ১৯৭৩৯ এবং ১৯৭৬৯।

[২৩৬] তারীখু দিমাশক, ১৮/৬-৭ (মদীনার মাকতাবাতুদ্দার পাণ্ডুলিপি)।

[২৩৭] প্রাগুক্ত, ১৮/৮।

Scanned by CamScanner

তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনায় সিকাহ (বিশ্বাসযোগ্য)। সাথিদের সাথে তিনি ফিকহ ও সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করতেন। কয়েকজন প্রশাসকের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।[২৩৮]

তাই ইবাদিয়্যাহরা প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে আসা স্বাভাবিক। বিশেষ করে প্রশাসকদের একটি অংশকে যেহেতু ইবাদিয়্যাহরা শিরককারী মনে করত। তাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অবস্থানের আলোকে জবাব দেন। আর এটিই আত-তাবারী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

গ) আবু মিজলাযের সাথে উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)-এর যোগাযোগ ছিল। বর্ণিত আছে উমার একবার বললেন, "খুরাসান সম্পর্কে কিছু বিষয় জানা দরকার। সত্যবাদী কাউকে খুঁজে দিন তো।" তাঁকে তখন আবু মিজলাযের কথা বলা হয়। তিনি তাঁকে ডাকিয়ে আনেন।[২৩৯]

উমার ইবনু আব্দিল আযীযও সমসাময়িক খারিজিদের সাথে বিতর্ক করেছেন। সঠিক মতের পক্ষে যথাযথ প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি দেখাতেন। খারিজিরা মোটাদাগে তাঁর প্রতি সন্তুষ্টই ছিল। আর আবু মিজলাযকে যেহেতু তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন, তাই খারিজিদের বিষয়ে তাদের দুজনের মধ্যেও আলোচনা হওয়াটা স্বাভাবিক।

৪। ইবাদিয়্যাহ সম্প্রদায়ের পরিচয়ে শাইখ মাহমদু শাকিরের মন্তব্যের সাথে আমি আরও কিছু তথ্য যোগ করছি :

ইবাদিয়্যাহরা দুজন খলিফায়ে রাশিদ, উসমান এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে কাফির বলে অপবাদ দেয়। তারা অভিযোগ করে, এই দুই খলিফা নাকি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল-মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে লেখা আব্দুল্লাহ ইবনু ইবাদের চিঠির কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। ইবাদিয়্যাহদের কিছু বইতে ইবনু ইবাদের 'সাহসী বাচনভঙ্গির' নিদর্শন হিসেবে এগুলো এসেছে।

উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কিছু কথিত 'ভুল' (যার অনেকগুলোই তাঁর হিংসুক ও বিদ্রোহীরা উত্থাপন করে) উল্লেখ করার পর ইবনু ইবাদ বলে,

"তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের একটি অভিযোগ এই যে, তিনি রাষ্ট্রীয় খাবার বিক্রি

---

[২৩৮] প্রাগুক্ত। উল্লেখ্য, প্রশাসকদের সাথে তাঁর এই সম্পর্ক ছিল আত্মসম্মানভিত্তিক। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, "নিজের থেকে কখনো আমি প্রশাসকের দুয়ারে ধরনা দিইনি। তাঁরাই আমাকে দূত পাঠিয়ে ডাকাতেন। ডেকে পাঠালে দূতের সাথেই যেতাম আমি।" তারীখু দিমাশক, ১৮/৯।

[২৩৯] তারীখুত তাবারি, ৬/৫৫৯-৫৬১; আল-কামিল, ইবনুল-আসীর, ৫/৫১-৫২, দারু সাদির সংস্করণ।

Scanned by CamScanner

শেষ হওয়ার আগে বাহরাইন ও ওমানবাসীদের খাবার বিক্রি করতে দেননি। এটি আল্লাহর হালাল করা একটি জিনিস হারাম করার শামিল।

'আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে হারাম...' [সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭৫]

এ রকম বিভিন্নভাবে উসমান আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উপায়ে শাসন করেছেন। বিরুদ্ধাচার করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ও তাঁর দুই সাহাবির। আল্লাহ বলেন,

'সঠিক পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়ার পর যে কেউ রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে যায়, আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেবো। আর তাকে পোড়াব জাহান্নামে। তা কতই-না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!' [সূরা আন-নিসা, ৪:১১৫]

এবং *'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির, যালিম, ফাসিক।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪, ৪৫, ৪৭]"*[২৪০]

তারপর সে বলে,

"এটি এবং এর অনুরূপ অনেক কারণে মুসলিমরা উসমানকে প্রত্যাখ্যান করছে। একই কারণে আমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা তাকে যে কারণে অভিযুক্ত করে, আমরাও সেই অভিযোগে অভিযুক্ত করছি..."

এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দা করার পর সে বলে,

"...জেনে রাখুন, এই উম্মাহ যে কুফরে ফিরে গেছে, তার নিদর্শন হলো তারা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার অবতীর্ণ বিধান ত্যাগ করে ভিন্ন কিছু দিয়ে শাসন পরিচালনা করছে..."[২৪১]

নিজের খারিজি পূর্বসূরিদের ব্যাপারে ইবনু ইবাদ বলে,

"তারা ছিলেন উসমানের বিরোধিতাকারী। কারণ উসমান আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে বিদআহ আঁকড়ে ধরেছিলেন। তালহা ও যুবাইর পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার পর তাদেরও বিরোধিতা করেছেন তারা (খারিজি পূর্বসূরিরা)। বিরোধিতা করেছেন সীমালঙ্ঘনকারী মুআওয়িয়ার। আর আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস ও আমর ইবনুল আসকে

---

[২৪০] ইযালাতুল ওয়া'সা আনিত্তিবায়ি আবিশ-শা'সা, সালিম ইবনু হামূদ আস-সামায়িলি, পৃ. ৯২, সম্পাদক সায়্যিদ ইসমাঈল কাশিফ, কায়রো ১৯৭৯ খ্রি., প্রকাশক : ওমান সালতানাত, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

[২৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Scanned by CamScanner

(মধ্যস্থতাকারী হিসেবে) নিয়োগ করে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার কারণে তারা আলীরও বিরোধিতা করেছেন। তাই তারা (পূর্বের খারিজিরা) এমন সকলকে পরিত্যাগ করেছেন। এই হলো খারিজিদের ইতিহাস। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা সাক্ষী আছেন যে, তাদের (পূর্বযুগের খারিজিরা) শত্রুরা আমাদেরও শত্রু। আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের বন্ধুরা আমাদেরও বন্ধু। কথা, কাজ ও হৃদয় দিয়ে আমরা তাদের সমর্থন করি...।"[২৪২]

তারপর বলে,

"পথভ্রষ্টতার নেতাদের ব্যাপারে বলতে হয়, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া ভিন্ন কিছু দিয়ে শাসনকারী। আল্লাহর দেয়া নিয়ম-বহির্ভূত উপায়ে তারা জিনিস বণ্টন করে। আর আল্লাহর রাস্তার বদলে তারা অনুসরণ করে নিজেদের প্রবৃত্তির।"[২৪৩]

মহান ও বিশিষ্ট সাহাবিদের, বিশেষ করে দুজন খলিফায়ে রাশিদ উসমান ইবনু আফফান ও আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বিরুদ্ধে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসনের অপবাদ দিয়ে এই ইবনু ইবাদ তাঁদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছে। তাহলে মুআওয়িয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-সহ পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণের ব্যাপারে তাদের আচরণ কেমন হবে, তা বলাই বাহুল্য। নিঃসন্দেহে ইবনু ইবাদের চোখে তারা আরও বড় কুফর করেছে। কারণ বনু উমাইয়্যাহর মধ্যে মুআওয়িয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) ছাড়া বাকিরা যে অনাচার-অবিচার করেছেন, তা তো জানা কথা।

ইবাদিদের চিন্তাধারা ওপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। উসমান এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাজগুলো অবিচার ছিল না, বরং শরীয়াহসম্মত ছিল; এটি আলিমদের ইজমা। এ দুই সাহাবি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বৈধ ও শরীয়াহসম্মত কাজকেই যখন তারা কুফর আখ্যা দেয়, সেখানে সত্যিকারের অনাচার-অবিচারকে ছেড়ে দেবে কেন?

তাই আবু মিজলাযের সাথে ইবাদিয়্যাহদের বিতর্ক হয়েছিল এ রকম বিষয়কে কেন্দ্র করে। আবু মিজলাযের অবস্থান সঠিক, ইবাদিরা ভুল। কিন্তু আজকের যুগে মুসলিম ভূমিগুলোতে যা ঘটছে, তার সাথে এ ঘটনার কোনো লেনাদেনা নেই। বর্তমানে মুসলিমদের দেশগুলোতে আল্লাহর আইন প্রত্যাখ্যান করে জনগণের ওপর মানবরচিত আইন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এটি স্পষ্ট। এই বাস্তবতার সাথে ইবাদিয়্যাহর ভিত্তিহীন অভিযোগের মিল কোথায়?

---

[২৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
[২৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Scanned by CamScanner

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বনাম খাওয়ারিজ

আবু মিজলাযের ঘটনা দলিল হিসেবে অপব্যবহৃত হয়, তা তো জানা গেল। এবার সেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা আলোচনা করা যাক, যেখানে ইবনু আব্বাস আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় "ছোট কুফর" এর কথা বলেছেন। যারা আজ আল্লাহর শরীয়াহকে মানবরচিত আইন প্রণয়ন করে তা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, এবং মানুষে ওপর তা চাপিয়ে দেয়, তাদেরকে কাফির না বলার ব্যাপারে কি এসব বর্ণনা দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে?

বাস্তবতা হলো, এ বর্ণনাগুলো উক্ত অবস্থানের স্বপক্ষের দলিল নয়।

ব্যাখ্যা করা যাক :

১। খারিজিরা কবীরা গুনাহগারকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী কাফির গণ্য করত। তাদের এ অবস্থানের মৌলিক ভিত্তিগুলোর অন্যতম ছিল সূরা আল-মায়িদাহর ৪৪তম আয়াত। তাই দেখবেন, আলিমগণ এ বিষয়টি ও এ ব্যাপারে খারিজিদের অবস্থান আলোচনা করার সময় উক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন এটি খারিজিদের দলিল।

যেমন : কবীরা গুনাহগাররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবার ব্যাপারে খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছেন কাযি আবু ইয়ালা। তিনি বলেন,

> "তারা বেশ কিছু জিনিসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন এই আয়াত: 'আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দিয়ে যারা বিচার করে না, তারাই 'কাফিরূন'।' তারপর তারা বলেছে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী যালিম শাসকদের কাফির ঘোষণা করতে হবে। এটিই আমাদের (খারিজিদের) অবস্থান।"[২৪৪]

তাদের যুক্তি খণ্ডন করে আবু ইয়ালা দেখান যে, আয়াতটি বিশেষভাবে ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ। খারিজিদের জবাবে আবু ইয়ালার অবস্থান আমাদের আলোচ্য নয়। এখানে মূল কথা হলো যে, যালিম নেতাসহ সকল কবীরা গুনাহগারকে কাফির আখ্যা দেয়ার জন্য খারিজিরা এ আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে।

উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফা ও প্রশাসকদের কাছে তাদের যুক্তিতর্ক সুবিদিত। এ ব্যাপারে অনেক ঘটনা আছে।[২৪৫]

২। যে পদ্ধতিতে খারিজিরা এ আয়াত উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করে, তা ভ্রান্ত। তাদের এ পদ্ধতি সাহাবিগণ ভালো করেই জানতেন। ইবনু আব্বাসের ব্যাপারে কিছু দলিল

---

[২৪৪] মাসায়িলুল ঈমান, কাযি আবু ইয়ালা, পৃ. ৩৪০, সাঊদ ইবনু আব্দিল-আযীয আল-খালাফ সম্পাদিত।

[২৪৫] তারীখু বাগদাদ, ১০/১৮৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা', ১০/২৮০।

Scanned by CamScanner

আমরা নিচে উল্লেখ করব। তার আগে অন্যান্য সাহাবির ব্যাপারে বলা যাক।

ইবনু ওয়াহব থেকে বর্ণিত আছে যে, বুকাইর একবার নাফি'কে জিজ্ঞেস করলেন, "হারুরিয়্যার (খারিজিদের একটি শাখা) ব্যাপারে ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অবস্থান কী ছিল?" নাফি' বলেন,

"তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরা আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। কারণ কুফফারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত তারা মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করত।" সাঈদ ইবনু জুবাইর এতে খুশি হয়ে বলেন, "হারুরিয়্যাদের অপব্যবহৃত একটি আয়াত হলো, 'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]। এর সাথে এ আয়াতও যোগ করে তারা, '...তারপরও অবিশ্বাসীরা অন্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমতুল্য মনে করে।' [সূরা আল-আনআম, ৬:১]

তারপর যখনই তারা দেখে কোনো নেতা অসত্য রায় দিচ্ছে, অমনি তাকে কাফির আখ্যা দিয়ে ফেলে। আর কাফির যেহেতু অন্য কিছুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করে, তাই সে মুশরিক। দেখা যায় এতে পুরো উম্মাহ মুশরিক হয়ে যায়। এরই জের ধরে শুরু হয় তাদের বিদ্রোহ ও রক্তপাত। সবকিছুর সূত্রপাত এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা থেকে।"[২৪৬]

খারিজিদের এই ভুলভাল ব্যাখ্যা সাহাবিদের মাথাব্যথার একটি বড় কারণ ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভুলগুলো তাঁরা তুলে ধরতেন। বিশেষত তাদের নিন্দা করে বর্ণিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে, তা মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

৩। সাহাবিগণ খারিজিদের সাথে মিশতেন বলে তাদের কথাবার্তা খুব ভালো করে জানতেন। তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের পরও অনেক সাহাবি তাদের কাফির আখ্যা দেননি। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"সাহাবিগণ যে খারিজিদের কাফির মনে করতেন না, তার একটি প্রমাণ হলো তাদের ইমামতিতে সাহাবিদের সালাত আদায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সহ অন্যান্য সাহাবি নাজদাহ আল-হারূরির পেছনে সালাত পড়তেন। তাঁরা তাদের সাথে কথাও বলতেন, তাদের প্রশ্নের জবাবে ফাতওয়া দিতেন, মুসলিমদের পরস্পর কথা বলার মতো করেই কথা বলতেন তাদের সাথে। নাজদাহ হারূরি বিভিন্ন মাসআলা জানতে চাইলে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু

---

[২৪৬] আল-ই'তিসাম, আশ-শাতিবি, ২/১৮৩-১৮৪। সাঈদ ইবনু জুবাইরের কথাটি আল-আজুররি উদ্ধৃত করেছেন আশ-শারীআহ গ্রন্থে, ১/৩৪২, হাদীস নং ৪৪, সম্পাদক আব্দুল্লাহ আদ-দুমাইজি, দারুল ওয়াতান থেকে প্রকাশিত।

Scanned by CamScanner

আনহুমা) তার জবাবও দিতেন। এমনকি সহিহুল বুখারিতে তার বর্ণিত হাদীসও আছে।[২৪৭] ইবনুল আযরাকও সুবিদিত বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা বলত। কুরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন-নাফি' তার সাথে তর্ক করতেন যেভাবে অন্য মুসলিমদের সাথে এসব বিষয়ে তিনি তর্ক করতেন।"[২৪৮]

খারিজিরা মুসলিমদের কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে লড়াই করত। মুসলিমদের রক্ত, সম্পদ, নারী, শিশু সবকিছু লুট করা হালাল মনে করত। এবং রাসূল ﷺ তাদেরকে আসমানের নিচে নিহতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আমরা যা বলতে চাইছি তা হলো, সাহাবিগণ কুরআনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করার সময় খারিজিদের ব্যাপারটি অবধারিতভাবে চলেই আসত। কারণ এদের সাথে তাঁদের সরাসরি বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল। আর এদের কুযুক্তির পক্ষে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত একটি দলিল ছিল সূরা আল-মায়িদাহর ওই আয়াত। যারাই ভিন্নমত পোষণ করত এ আয়াত দিয়ে খারিজিরা তাদের কাফির সাব্যস্ত করত।

তাই ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জবাবটি ছিল মূলত খারিজিদের মত খণ্ডন করার প্রেক্ষাপটে। এই প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর বক্তব্যকে বোঝা যাবে না।

৪। *"তারা যে কুফরের কথা ভাবছে, এটি সেই কুফর নয়"*, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে খারিজিদের প্রসঙ্গে। এখানে 'তারা' হলো খারিজিরা।

একাধিক সহীহ বর্ণনাসূত্রে জানা যায় ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খারিজিদের

---

[২৪৭] ইবনু আব্বাসের কাছে নাজদাহর প্রশ্নটি একাধিক ইসনাদে (সূত্রে) স্পষ্টত সহিহ মুসলিমে আছে (কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৮১২)। আর সহিহুল বুখারিতে আছে কিতাবুত-তাফসীর, সূরা হা-মীম আস-সিজদায় : "আল-মিনহাল থেকে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাসকে বলল, 'কুরআনের কিছু বিষয় আমি বুঝতে পারছি না...।'" সূরা আল-মুরসালাতের তাফসীরে আছে, "ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো...।" বুখারির ব্যাখ্যাদাতাগণ মনে করেন যে, এটি খুব সম্ভবত নাফি' ইবনুল আযরাক (আযারিকার পরবর্তী নেতা) ছিলেন। ফাতহুল বারিতে ইবনু হাজার আত-তাবারানির একটি বর্ণনা এনেছেন যে, নাফি' ইবনুল আযরাক ও নাজদাহ ইবনু উয়াইমির একদল খারিজি নেতাসহ মক্কায় এলেন। তাঁরা ইবনু আব্বাসের সাথে দেখা করেন...। (ফাতহুল বারি, ৮/৫৫৭)। দেখুন : ফাতহুল বারি, ৮/৬৮৬, সালাফি প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ; উমদাতুল কারি, ১৯/১৫০, মুনীরিয়্যাহ প্রকাশনী; ইরশাদুস সারি, ৭/২৬০, বুলাক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ; তুহফাতুল বারি, যাকারিয়া আল-আনসারি, ৯/১০৭, আল-মাইমানিয়্যা প্রকাশনী, ইরশাদুস সারি সহ এক খণ্ডে প্রকাশিত। আল-মিনহালের বর্ণনা এবং নাফি'র প্রশ্ন—দুটি বর্ণনাই আত-তাবারানি বর্ণনা করেছেন, ১০/৩০০, ৩০৪, হাদীস নং ১০৫৯৪ ও ১০৫৯৭।

[২৪৮] মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/২৪৭।

Scanned by CamScanner

সাথে বিতর্ক করতেন। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুজন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের পরে খারিজিরা দাবি করে, মানুষকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের অন্যথা করেছেন, যা কুফর।

বর্ণিত আছে, আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এক জুমুআর দিনে মিম্বারে উঠে হামদ-সানা পাঠ করেন। তারপর খারিজিদের কথা উল্লেখ করে তাদের সৃষ্ট দলাদলির সমালোচনা করে খুতবা দেন। যে বিষয় নিয়ে তারা বিভাজন সৃষ্টি করেছে তা নিয়েও বক্তব্য দেন। তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসতেই খারিজিরা মাসজিদের বিভিন্ন দিক থেকে স্লোগান দিয়ে ওঠে,

"বিচার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।"

আলী বলেন, "আমি আপনাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিচারের অপেক্ষায় আছি।" তারপর হাতের ইশারায় ওদের চুপ করতে বলেন।

এমন সময় এক লোক কানে আঙুল দিয়ে সামনে এসে বলতে থাকে,

"...যদি আল্লাহর সাথে ইবাদাতে আর কাউকে শরিক করো, তাহলে তোমাদের সব কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তোমরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৫][২৪৯]

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খারিজিদের সাথে বিতর্কের জন্য ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে পাঠাতেন। তিনি তাদের যুক্তিগুলো ধরে ধরে খণ্ডন করেন। ফলে তাদের বেশির ভাগই ভুল স্বীকার করে। অল্প কিছু গোঁয়ারের মতো লেগে থাকে। এদের বিরুদ্ধে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধ করেন।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে তাদের বিতর্কের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এখানে খারিজিদের বিতর্কের সবচেয়ে বিখ্যাত যুক্তি এবং ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জবাব উঠে এসেছে।

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের কাছে এসে বলেন,

"বলুন তো, কেন আপনারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর ভাতিজা ও জামাতা, এবং মুহাজির ও আনসারের ওপর এত ক্ষেপা?"

তারা বলল, "তিনটি কারণে।"

"কী কী?"

"প্রথমত, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তিনি মানুষকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ

---

[২৪৯] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৫/৩১২-৩১৩, হাদীস নং ১৯৭৪৬।

Scanned by CamScanner

দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

'...বিধান (আল-হুকম) শুধুই আল্লাহর...' [সূরা আল-আনআম, ৬:৫৭; সূরা ইউসুফ, ১২:৪০, ৬৭]

বিধান বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের আবার কাজ কী?"

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে এমন কিছু শোনাই, যা আপনাদের দাবিকে খণ্ডন করে, তাহলে কি মেনে নেবেন?"

"জি।" বলল তারা।

"আপনারা অভিযোগ করেছেন, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তিনি (আলী) মানুষকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি আপনাদের এমন একটি আয়াত শোনাব যা বলছে, সিকি দিরহামের একটি খরগোশের ব্যাপারেও মানুষকেই বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

'হে বিশ্বাসীরা, ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা কোরো না। যে ইচ্ছেকৃতভাবে হত্যা করবে, তার জরিমানা হত্যাকৃত প্রাণীটির সমমানের একটি আহার্য প্রাণী কাবায় এনে কুরবানি করা, যেমনটি তোমাদের মধ্যকার দুজন ব্যক্তি রায় দিয়েছে...।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৯৫]

এবার আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো, মানুষে-মানুষে রক্তপাত প্রতিহত করার জন্য দুজন ব্যক্তির নিয়োগ কি খরগোশ হত্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়? আপনারা জানেন, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তিনি নিজেই এর বিচার করতে পারতেন।

আবার এক মহিলা ও তার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

'দুজনের মাঝে বিভেদের শঙ্কা দেখা দিলে দুজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবে। একজন পুরুষটির পরিবারের, অপরজন নারীটির। আর তারা উভয়ে শান্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মাঝে মিলমিশ করে দেবেন...।' [সূরা আন-নিসা, ৪:৩৫]

তাই মানুষকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার নিয়ম আল্লাহ্ই করেছেন। যা সব সময়ই প্রযোজ্য। বুঝেছেন ব্যাপারটা?"

তারা জবাব দিলো, "জি, বুঝেছি...।"[২৫০]

---

[২৫০] আল-মুস্তাদরাক, আল-হাকিম, ২/১৫০-১৫২, তিনি বলেছেন যে, বর্ণনাটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম আয-যাহাবি একমত। এ ছাড়া ইমাম আহমাদের আল-মুসনাদ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে বর্ণনাটি, ১/৩৪২। আহমাদ শাকিরের সংস্করণে এর নম্বর ৩১৮৭, তিনি এর ইসনাদ সহীহ বলেছেন। এ ছাড়াও বর্ণনাটির অন্যান্য উৎস : আস-সুনান আল-কুবরা, আল-বাইহাকি,

Scanned by CamScanner

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ওইসব খারিজিদের সাথে বিতর্ক করতেন, যাদের মধ্যে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কাফির ঘোষণাকারীরাও ছিল। কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে তাদের বিকৃত বুঝ ও ব্যাখ্যার কারণে মুসলিমদের জন্য তারা যে হুমকি বয়ে আনছিল, সঠিক ব্যাখ্যার দ্বারা তা প্রতিহত করতে তৎপর ছিলেন ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)।

সূরা আল-মায়িদাহর ৪৪তম আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথিদের কাফির ঘোষণা করেছিল। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ ভুল ব্যাখ্যার খণ্ডনও করেছিল। সাহাবিদের ব্যাপারে এবং যালিম শাসকদের ব্যাপারে কুফরের অভিযোগের প্রসঙ্গেই ইবনু আব্বাস ছোট কুফর সংক্রান্ত উক্তিগুলো করেন।

বিভিন্ন সময় তাদের সাথে বিতর্ক করলেও, খারিজিরা যে উম্মাহর জন্য বিপজ্জনক, তা অন্যান্য সাহাবির মতো ইবনু আব্বাসও জানতেন। তাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি ইয়াযীদ যখন একবার খারিজিদের ইবাদাতগুজারির কথা তুললেন, তখন ইবনু আব্বাস জবাব দেন, "ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ওদের চেয়েও বেশি ইবাদাতগুজার, তারপরও পথভ্রষ্ট।"[২৫১]

তাঊস তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সামনে একবার খারিজিদের ধার্মিকতা নিয়ে কথা উঠল। তারা কুরআন শুনলে খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। ইবনু আব্বাস বলেন,

> "মুহকাম আয়াতগুলোর ওপর তারা ঈমান আনে এবং মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।"[২৫২], [২৫৩]

অন্য সাহাবিগণও খারিজিদের ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছেন।

৫। প্রত্যেক গুনাহর জন্য মানুষকে কাফির আখ্যা দেয়া খারিজিদের প্রসঙ্গেও ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তিটি বিবেচনা করা যায়। তাই ছোট কুফর

৮/১৭৯; আল-মুজামুল কাবীর, আত-তাবারানি, ১০/৩১২, বর্ণনা নং ১০৫৯৮; আল-মুসান্নাফ, আব্দুর-রায্যাক, ১০/১৫৭, বর্ণনা নং ১৮৬৭৮; আল-মারিফা ওয়াত-তারীখ, আল-ফাসাওয়ি, ১/৫২২, মাকতাবাতুদ্দার প্রকাশনী; জামিয়ু বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল-বার, পৃ. ৩৭৫-৩৭৭, আব্দুল-কারীম আল-খাতীব সম্পাদিত, অথবা আল-মুনীরিয়্যাহ সংস্করণের ২/১০৩; আনসাবুল আশরাফ, আল-বালাযুরি, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩-৪৪, সম্পাদক আব্দুল আযীয আদ-দূরি।

[২৫১] ইবনু আবি শাইবাহ, ১৫/৩১৩, বর্ণনা নং ১৯৭৩৭; শারহুস-সুন্নাহ, আল-লালিকায়ি, ৮/১৩২২২, হাদীস নং ২৩১৫।

[২৫২] ইবনু আবি শাইবাহ, ১৫/৩১৩, বর্ণনা নং ১৯৭৪৮।

[২৫৩] অর্থাৎ যখন তারা কুরআন-সুন্নাহর এমন কিছু শোনে যা তারা বোঝে, তখন তারা তা মেনে নেয়; কিন্তু যখন তারা বুঝে উঠতে সক্ষম হয় না, তখন তা তাবিল, নাকচ বা অস্বীকার করে বসে, এভাবেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

মন্তব্যটি নির্দিষ্ট মামলায় আল্লাহর আইনের বিপরীত রায় দেয়া বিচারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম সহ অন্যান্য আলিম একে এভাবেই বুঝেছেন। ইতিপূর্বে এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

৬। আবু মিজলায ও ইবাদিয়্যাহর ঘটনার ব্যাপারে যা বলা হলো, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মন্তব্যের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। বরং এ ক্ষেত্রে সেটি আরও বেশি উপযুক্ত। সেই সময়কার খারিজিরা খুলাফা রাশেদীনসহ বড় বড় সাহাবিদের কাফির আখ্যা দিত। তাই শাইখ আহমাদ শাকির এ দুটি ঘটনা সম্পর্কিত করে বলেন,

> "ইবনু আব্বাস ও অন্যান্যদের এই বর্ণনাগুলোকে আমাদের আজকের যুগের ধোঁকাবাজরা খেলনা বানিয়ে ফেলেছে। এরা ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করে কিন্তু ইসলামের মূলনীতিগুলোকে খাটো করার দুঃসাহস দেখায়। মুসলিম ভূমিতে শিরকি মানব-রচিত বিধানের প্রতিষ্ঠাকে বৈধতা দেয়ার জন্য তারা এ বর্ণনাগুলোকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে।
>
> আবু মিজলাযের সাথে খারিজি ইবাদিয়্যাহদের বিতর্কের একটি বর্ণনা আছে। সেটি ছিল কিছু প্রশাসকের যুলুমের ব্যাপারে। কিছু ক্ষেত্রে তারা প্রবৃত্তি বা অজ্ঞতাবশত শরীয়াহ-বিরোধী রায় দিত। খারিজিদের মতে কবীরা গুনাহগার মাত্রই কাফির। আবু মিজলাযকেও তারা সেই মতের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করে যাতে তিনি প্রশাসকদের কাফির আখ্যা দেন। কারণ ওটাই খারিজিদের বিদ্রোহের অজুহাত।"[২৫৪]

এরপর তাফসীরুত তাবারী থেকে বর্ণনা দুটি উদ্ধৃত করে ভাই মাহমুদ শাকিরের এ-সংক্রান্ত মন্তব্য যোগ করেন তিনি। ওপরে আমরা সেগুলো উল্লেখ করেছি।

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে হোক বা তার পরে, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সমসাময়িক কেউ ভাবতেও পারতেন না যে, কোনো সময় মুসলিমরা শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসিত হতে পারে। কেউ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে, প্রণীত সেই আইন আবার জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে অনুযায়ী বিচার চাইতে বাধ্য করতে পারে, এমন কিছু ছিল কল্পনাতীত। তার ওপর খারিজিদের কুরআন বোঝার ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি ছিল ভুল।[২৫৫] তাই ওই প্রেক্ষাপটে ইবনু আব্বাস তাদের কাছে আয়াতটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে, সেখানে ছোট কুফরের কথা বলা হয়েছে।

---

[২৫৪] উমদাতুত-তাফসীর, ৪/১৫৬।

[২৫৫] এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন আল-ইতিসাম, আশ-শাতিবি, ১/২৩৮, ২/৩১১।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারীদের ব্যাপারে আলিমগণের মতামত

আল্লাহর আইন পরিবর্তন ও বিকৃত করা লোকদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে অবস্থান নিয়েছেন আলিমগণ। এ অধ্যায়ে তাঁদের কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হবে। বর্তমানে মহান আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে মানবরচিত বিধান ও ব্যবস্থা দিয়ে ঢালাওভাবে আল্লাহর শরীয়াহকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আর কখনো এই মাত্রায় এমন ঘটেনি। তবে অতীতেও এমন কিছু সময় এসেছে যখন আল্লাহর শরীয়াহ পরিবর্তন, বিকৃত কিংবা মানবরচিত ব্যবস্থা দিয়ে এর প্রতিস্থাপনের মতো ঘটনা সীমিত মাত্রায় ঘটেছে। এ ব্যাপারে আলিমগণের এবং মুসলিমদের মনোভাব কেমন ছিল, সেটাই আমরা এখন দেখব।

রিদ্দা : মুরতাদদের ফিতনা

মুরতাদদের ফিতনা দেখা দেয় মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওফাতের পর। ইমাম বুখারী তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, 'ফরয অস্বীকারকারীদের হত্যা ও মুরতাদ আখ্যাদান সংক্রান্ত অধ্যায়'। এ অধ্যায়ে তিনি নিচের বর্ণনাটি এনেছেন।

> আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাত হলো, আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা নিযুক্ত হলেন। আর তখন আরবের অনেকে মুরতাদ হয়ে গেল। উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আবু বকর, আপনি কীভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই) বলবে। আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, যথার্থ কারণ না থাকলে (যে কারণে শরীয়াহতে নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হয়) তার জান-মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ, আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।
>
> আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! যারাই সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা,

Scanned by CamScanner

যাকাত হলো সম্পদ হতে আদায়কৃত হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবে তা না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্ষকে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি অনুধাবন করলাম, তিনিই সঠিক ছিলেন।[২৫৬]

ইবনু হাজার বলেছেন,

"ইমাম বুখারী এ আলোচনার নামকরণ করেছেন, 'ফরয অস্বীকারকারীদের হত্যা ও মুরতাদ আখ্যাদান সংক্রান্ত অধ্যায়'। নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, যারা ফরয বিধান আঁকড়ে ধরতে এবং পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে হত্যার বৈধতা আছে।"

আল-মুহাল্লাব বলেন,

"যারা ফরয দায়িত্ব কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে। যদি সে স্বীকার করে যাকাত ফরয, তাহলে বলপ্রয়োগে তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু কেউ যদি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি (বলপ্রয়োগে যাকাত আদায়ের সময়) বাধা দেয় ও লড়াই করে, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে যতক্ষণ না সে ফিরে যায়।"

ইমাম মালিক আল-মুয়াত্তায় বলেছেন,

"আমাদের মতে, যদি লোকেরা আল্লাহ্ নির্দেশিত কোনো একটি ফরয মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, আর মুসলিমরা যদি তাদের কাছ থেকে সেটা আদায় করতে না পারে, তবে মুসলিমদের দায়িত্ব তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।" ইবনু বাত্তাল বলেছেন, "যদি তারা কবুল করে নেয় যে ওই বিধান ফরয, তবুও (তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার) এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।"[২৫৭]

ইমাম মালিকের উক্তির ওপর মন্তব্য করে আল-বাজি বলেন,

---

[২৫৬] সহিহুল বুখারী 'ফরয অস্বীকারকারীদের হত্যা ও মুরতাদ আখ্যাদান সংক্রান্ত অধ্যায়', হাদীস নং ৬৯২৪, ৬৯২৫ (ফাতহুল বারি, ১২৫৭২/, ১ম সালাফিয়্যাহ মুদ্রণ।

[২৫৭] ফাতহুল বারি, ১২/২৭৫-২৭৬। তিনি ইমাম মালিকের মুয়াত্তা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা কিতাবুয যাকাতে আছে। সাদাকাহ অনুচ্ছেদ, ১/২৬৯, ফুয়াদ আব্দুল বাকী সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

"(ইমাম মালিক) যা বলেছেন সেটাই ঠিক—যারা আল্লাহর কোনো হক আটকে রাখে এবং সেই বিষয়টি ফরয হওয়ার ব্যাপারে যদি কোনো দ্বিমত না থাকে তবে মুসলিমরা অবশ্যই এমন লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে যতক্ষণ না সেই পাওনা আদায় করে নেয়া হবে। যাকাত আটকে রাখা মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঠিক এটাই করেছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, যাকাতের বিধানের মতো অন্যান্য সকল পাওনার ক্ষেত্রেও একই রায় প্রযোজ্য হতে পারে।"[২৫৮]

এটি সুবিদিত যে মুরতাদদের বিভিন্ন ধরন ছিল। এদের মধ্যে :

১. একদল মূর্তিপূজায় ফিরে গিয়েছিল।

২. আরেকদল আল-আসওয়াদ, মুসাইলামাহ এবং সাজাহ-এর মতো ভণ্ড নবীদের অনুসরণ করেছিল।

৩. কেউ কেউ যাকাতের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেছিল।

৪. আরেকদল যাকাতের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেনি, কিন্তু আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

আবু বকর ও উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যে শুরুতে যে মতপার্থক্য হয়েছিল তা ছিল কেবল চতুর্থ দলের ব্যাপারে। প্রথম তিন দল যে কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এ নিয়ে কারও কোনো মতভেদ ছিল না। ইমাম বুখারীর মতে এরা ছিল দ্বীন বিকৃতকারী ও এর বিধান পরিবর্তনকারী। তিনি বলেছেন,

"নবী ﷺ -এর পর ইমামগণ (উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম) বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত আলিমদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেন সবচেয়ে সহজ মতটি নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া গেলে অন্য কোনো মতামত তারা তালাশ করতেন না...। যারা যাকাত আটকে রেখেছিল আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা ভাবলেন। কিন্তু উমার বললেন, 'কীভাবে আপনি এমন লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন যখন...?' (কিন্তু) এরপর উমার নিজেই আবু বকরের মতামত অনুসরণ করলেন। আবু বকর এ ব্যাপারে কারও পরামর্শ গ্রহণ করেননি, কারণ যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং যারা দ্বীনত্যাগী ও দ্বীনের বিধান পরিবর্তনকারী তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশনা তাঁর সামনে সুস্পষ্ট ছিল।

নবী ﷺ বলেছেন, 'যে দ্বীন ত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করো...।'"[২৫৯]

---

[২৫৮] আল-মুনতাকা, আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি, ২/৭৫।

[২৫৯] সহিহুল বুখারী : কিতাবুল ই'তিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ—আল্লাহর বাণী,

Scanned by CamScanner

রিদ্দা (দ্বীনত্যাগ) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক হওয়াতে দুইটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

১. সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ইজমা হলো যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামের কোনো একটি ফরয বিধান পালনে যে অস্বীকৃতি জানাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

বিষয়টি এতটাই গুরুতর যে, এই ব্যক্তিরা কাফির কি না সেই আলোচনাও এ ক্ষেত্রে চলে আসে। দেখুন, আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের মধ্য কোনো একটি বিধান প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে লোকেরা একমত হলেই এই অবস্থা। তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত সম্পূর্ণ শরীয়াহ পরিত্যাগ করে একে মানবরচিত আইনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হলে হুকুম কী হবে?

২. ফরয বিধান মানা সত্ত্বেও যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদেরকে কাফির গণ্য করা হবে কি না তা নিয়ে আছে বিতর্ক। এ মতপার্থক্য সুবিদিত। আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ অপরাধে বুযাখা গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে, একপর্যায়ে বুযাখা গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এল শান্তি প্রস্তাব নিয়ে। তিনি তাদেরকে সর্বাত্মক যুদ্ধ আর অপমানজনক সন্ধির মধ্যে যেকোনোটি বেছে নিতে বললেন।

> তারা বলল, "সর্বাত্মক যুদ্ধ বলতে কী বোঝায় তা আমরা জানি, কিন্তু অপমানজনক সন্ধি কী?"
>
> তিনি বললেন, "আমরা তোমাদের অস্ত্র ও ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে নেব। সেগুলো রেখে দেবো গনিমত হিসেবে। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তোমরা যা নিয়ে গেছ সেগুলো ফিরিয়ে দেবে। আমাদের নিহতদের জন্য রক্তমূল্য তোমরা পরিশোধ করবে, কিন্তু তোমাদের মৃতরা জাহান্নামী (অর্থাৎ তাদের কোনো রক্তমূল্য নেই)...।"[২৬০]

যাকাতের বিধান স্বীকার করেও যাকাত দিতে অস্বীকার করা ব্যক্তিদের যেসব আলিম মুরতাদ গণ্য করেছেন এই বর্ণনাকে তারা দলিল হিসেবে এনেছেন। কিন্তু আল-

---

وامرهم شورى بينهم (এবং তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে) (ফাতহুল বারী, ১৩/৩৩৯), ১ম সালাফিয়্যাহ মুদ্রণ।

[২৬০] আল-বুরকানী, মুসতাখরাজ; আল-জাময়ু বাইনাস সাহীহাইন গ্রন্থে আল-হুমাইদি আল-বুরকানী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ১/৯৬, হাদীস নং, ১৭, আলী হুসাইন আল-বাওয়াব সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৯ হিজরি। বুখারী এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন : কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইখতিলাফ, নং ৭২২১ (ফাতহুল বারী, ১৩/২০৬, ২১০), ১ম সালাফিয়্যাহ মুদ্রণ।

Scanned by CamScanner

মুগনীতে ইবনু কুদামাহ বলেছেন,

> "এই দলিলটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ: এর একটি অর্থ হতে পারে (যাকাতের বিধান স্বীকার করা সত্ত্বেও যাকাত দিতে অস্বীকার করায়) তারা মুরতাদ। অথবা আরেকটি অর্থ হতে পারে, (তারা মুরতাদ কারণ) তারা যাকাতের বিধানই অস্বীকার করেছিল, ইত্যাদি...।"[২৬১]

এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে। সেই দুইটি মত বর্ণনার পর কাযি আবু ইয়ালা বলেছেন,

> "যারা যাকাতের বাধ্যবাধকতা বিশ্বাস করে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং এর জন্য লড়াই করে, তাদেকে কাফির গণ্য করা হবে কি না? এ ব্যাপারে আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বিভিন্ন বর্ণনা আছে।
>
> আল-মাইমুনী বর্ণনা করেছেন, যারা আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল এবং এ উদ্দেশ্য যুদ্ধ করেছিল, (তাদের ব্যাপারে হুকুম হলো) কেউ তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং তাদের কোনো জানাযার নামাজ নেই (অর্থাৎ তারা মুসলিম নয়)। আর কৃপণতা বা উদাসীনতার কারণে যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে কিন্তু যাকাত দিতে বাধ্য করলে লড়াই করে না, এমন ব্যক্তিরা মারা গেলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা যাবে এবং তাদের জন্য জানাযার সালাত পড়া হবে (অর্থাৎ তারা মুসলিম)।
>
> এ থেকে আপাতভাবে বোঝা যায়, যারা যাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্য লড়াই করে, তারা কাফির হয়ে যাবে। কারণ আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন, যারা যাকাত আটকে রাখে তারা কাফির। তিনি আরও বলেছিলেন, "...না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই সাক্ষ্য দেবে যে তোমাদের মৃতরা জাহান্নামী!"
>
> আল-আসরামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যারা রমাদ্বানে সিয়াম রাখে না এবং যারা সালাত আদায় করে না তাদের হুকুম কী একই রকম? জবাবে তিনি বলেন, "সালাতের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি অন্যান্য বিষয়ের মতো নয়।"
>
> তাকে প্রশ্ন করা হলো, যে যাকাত দেয় না তার ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ[২৬২] হতে বর্ণিত আছে, যে সালাত পড়ে না সে মুসলিম নয়। আবু বকর (আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে) লড়াই করেছিলেন যাকাত না দেয়ার কারণে, কিন্তু এই হাদীসে সালাতের কথা বলা হয়েছে।"

---

[২৬১] আল-মুগনি, ইবনু কুদামাহ, ৪৯/

[২৬২] অর্থাৎ ইবনু মাসউদ। তার এই বর্ণনাটি ইবনু আবী শাইবাহ কর্তৃক আল-মুসান্নাফে উল্লিখিত হয়েছে, ৩/১১৪। আরও দেখুন, আল-মুগনী, ৪/৯।

Scanned by CamScanner

এ বক্তব্যে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের উক্তি এবং আবু বকরের আমল বর্ণনা করেছেন। নিজে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো রায় দেননি। বরং বলেছেন 'এই হাদীসে সালাতের কথা বলা হয়েছে'। অর্থাৎ হাদীসে সালাত ত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন ব্যক্তি ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া। যে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায়।"[২৬৩]

যাকাত এমন বাধ্যতামূলক বিধান যা সম্পদের ওপর দিতে হয়; যাকাত আটকে রাখলে এবং (যাকাত না দেয়ার লক্ষ্যে) লড়াই করলে তারা কাফির হয় না, যেমন কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) প্রদান না করলে ও মানুষের পাওনা প্রদান না করলে কেউ কাফির হয় না।[২৬৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই দুটি বর্ণনা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে আলিমদের আরও দুইটি মতামত এনেছেন।[২৬৫] ইবনু কুদামাহও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বর্ণনা দুটির উদ্ধৃতি দিয়ে। উল্লিখিত মতের দালিলিক আলোচনা, যারা কাফির হয়ে যাবার মত গ্রহণ করেছেন তাদের দলিলের জবাবে আলোচনা এবং তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে মনে হয় ইবনু কুদামাহ মনে করতেন এ কারণে ব্যক্তি কাফির হয় না।[২৬৬]

এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহর অবস্থান সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তার মত হলো, যদি কিছু লোক দলবদ্ধভাবে যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং এর জন্য লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে কাফির গণ্য করা হবে। মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকরের অবস্থান এমনই ছিল। যারা যাকাত আটকে রেখেছিল সাহাবায়ে কেরাম তাদের সাথে অন্যান্য মুরতাদদের পার্থক্য করেননি।

যে বিষয়ে ফকীহগণের মতপার্থক্য আছে তা হলো ওইসব লোকের ব্যাপারে যারা যাকাত দেয় না, আবার এর জন্য লড়াইও করে না। এমন ব্যক্তিরা কাফির না হবার ব্যাপারে দলিল আছে। যেমন হাদীসে এসেছে,

"যে এটা (যাকাত) আটকে রাখে, আমরা সেটা এবং তার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ

---

[২৬৩] সহীহ মুসলিম : অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : যে সালাত পরিত্যাগ করে তাকে কাফির নাম দেয়ার বর্ণনা, হাদীস নং ৮২।

[২৬৪] কিতাবুর রিওয়াইয়াতাইন ওয়াল-ওয়াজহাইন, আবু ইয়ালা, ১/২২১-২২২, আব্দুল কারিম আল-লাহিম সম্পাদিত।

[২৬৫] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫১৮, ৩৫/৫৭।

[২৬৬] আল- মুগনী, ৪/৮,৯।

Scanned by CamScanner

করব...।"[২৬৭]

অন্য হাদীসে এসেছে,

"ইবনু জামিলের কী হলো...?"[২৬৮] ইত্যাদি।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক এ থেকে পরিষ্কার হবে। শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

"যারা যাকাত আটকে রাখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে; যদিও তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে কিংবা রমাদ্বানে সিয়াম রাখে। সাহাবা এবং পরবর্তী ইমামগণ এ বিষয়ে একমত। কারণ এসব লোকের কোনো যৌক্তিক ওজর নেই। এরা মুরতাদ। যাকাত আটকে রাখার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তারা যদি যাকাতকে ফরয বিধান হিসেবে স্বীকার করে, তাহলেও মুরতাদ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে তারা বলেছিল,

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূলকে যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন, তিনি বলেছেন,

'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন...।' (সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১০৩)

কিন্তু তিনি (রাসূলুল্লাহ) ইন্তেকাল করেছেন, তাই এই বিধান আর প্রযোজ্য নয়!"[২৬৯]

শাইখুল ইসলাম আরও বলেছেন,

"খারিজি, যারা যাকাত আটকে রাখে এবং সুদি লেনদেন ত্যাগ না করা তায়েফবাসী; এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত সকল হুকুম বাস্তবায়ন করে। যদি তারা দলবদ্ধ হয় এবং (শরীয়াহর কিছু হুকুম) বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের বন্দীদের হত্যা করা, যুদ্ধের

---

[২৬৭] হাদীসটি বাহয ইবনু হাকিম, তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে এটা (যাকাত) আটকে রাখে, আমরা সেটা এবং তার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করব...। (সুনানু আবি দাউদ, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ১৫৭৫; সুনানুন নাসায়ি, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৪৪, হাদীসের মান : হাসান।) [সম্পাদক]

[২৬৮] হাদীসটি সহিহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কাছে বলা হলো, ইবনু জামিল, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (যাকাত) আটকে রেখেছে। তিনি বললেন, ইবনু জামিলের যাকাত না দেওয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে।...' (সহিহুল বুখারি, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ১৪৬৮; সহীহ মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, হাদীস : ৯৮৩, তবে সহীহ মুসলিমে 'রাসূলের বরকতে' অংশটুকু নেই।) [সম্পাদক]

[২৬৯] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫১৯।

Scanned by CamScanner

ময়দান হতে পলায়নরতদের ধাওয়া করা এবং তাদের আহতদের হত্যা করা বৈধ। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর তারা যদি নিজেদের ভূমিতে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তারা পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত তাদের অঞ্চলে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক...।"[২৭০]

আদ-দুরারুস সানিয়্যাহতে এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহর আরেকটি সুস্পষ্ট মন্তব্য উল্লেখিত হয়েছে :

"সাহাবিরা তাদেরকে প্রশ্ন করেননি, 'তোমরা কি এটাকে (যাকাত) ফরয মনে করো নাকি অস্বীকার করো?'

এ বিষয়টি (তারা অন্তরে ফরয মানে নাকি মানে না) সাহাবিদের মধ্যে মোটেও পরিচিত ছিল না। আবু বকর সিদ্দিক উমারকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবে তা না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

সুতরাং তাঁর মতামত ছিল খুবই সহজ। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, এতটুকুই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট। যাকাতের বাধ্যবাধকতা স্বীকার বা অস্বীকারের কোনো প্রসঙ্গ এখানে আসেনি।

বর্ণিত হয়েছে, এই গোত্রগুলোর মধ্যে অনেকে যাকাতের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করত, কিন্তু যাকাত দিতে কৃপণতা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের বিরুদ্ধে খলিফাগণের নেয়া পদক্ষেপে কোনো ভিন্নতা দেখা যায়নি। অর্থাৎ তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে, নারী-শিশুদের বন্দী করা হয়েছে, মালামাল বাজেয়াপ্ত করে গনিমত নেয়া হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে যে, তাদের নিহতরা জাহান্নামী। তাঁরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সবাই তাদেরকে 'আহলুর রিদ্দা' (মুরতাদ) নামে ডাকতেন।

আবু বকর সিদ্দিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফযিলত হলো যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে দৃঢ়পদ রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি অন্যদের মতো দ্বিধাগ্রস্ত হননি। বাকিরা তাঁর সাথে একমত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করেছেন। আর মুসাইলামার মিথ্যা নবুয়তে যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাধ্যবাধকতা নিয়ে কারও মধ্যেই কোনো সন্দেহ ছিল না।

এটাই সেইসব আলিমদের দলিল যারা বলেন, যদি তারা (যারা যাকাত আটকে

---

[২৭০] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৫১।

Scanned by CamScanner

রাখে) খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করে তবে কাফির হয়ে যাবে; অন্যথায় নয়। এসব লোককে কাফির আখ্যা দেয়া এবং তাদেরকে মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে সাব্যস্ত। আর যারা এ কারণে খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করেনি তাদের অবস্থা ভিন্ন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বলা হলো, "ইবনু জামিল (যাকাত) আটকে রেখেছে।" তিনি বললেন, "ইবনু জামিলের যাকাত না দেয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বরকতে সম্পদশালী হয়েছে।"

তিনি ﷺ তাকে (ইবনু জামিলকে) হত্যার আদেশ জারি করেননি, কিংবা তাকে কাফির বলেননি। সুনানু আবি দাউদ ও সুনানুন নাসায়িতে এসেছে বাহয ইবনু হাকিম, তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে এটা (যাকাত) আটকে রাখে, আমরা সেটা এবং তার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করব...।"[২৭১]

ইবনু তাইমিয়্যাহর উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে তায়েফবাসীদের কথা এসেছে, যারা সুদি লেনদেন পরিত্যাগ করেনি। বিষয়টি আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক। তাই এখানে উল্লেখ করছি এ নিয়ে শাইখুল ইসলামের আরেকটি বক্তব্য। তাতারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

"সিরিয়াতে আসা তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বাধ্যতামূলক, এটাই কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

'আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (কুফর, শিরক, গায়রুল্লাহর ইবাদাত) নির্মূল হয়ে যায়; এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।...'(সূরা আল-আনফাল, ৮:৩৯)

এখানে দ্বীন অর্থ আনুগত্য। কাজেই যদি দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত থাকে আর কিছু অংশ অন্য কারও জন্য নির্ধারিত করা হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ জিহাদ করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না দ্বীন সামগ্রিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ বলেছেন,

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেসমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা

---

[২৭১] আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ, ৮/১৩১, শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ)'-এর একটি চিঠি হতে।

Scanned by CamScanner

পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭৮-২৭৯)

এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তায়েফবাসীদের ব্যাপারে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর সালাত-সিয়াম পালন করলেও সুদি লেনদেন ত্যাগ করেনি। এখানে আল্লাহ তা'আলা ব্যাখ্যা করেছেন, সুদি কার্যক্রম ত্যাগ না করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

সকল হারামের মধ্যে সুদকে হারাম করা হয়েছে সবার শেষে। রিবা হলো সেই অর্থ যা পাওনাদারের সম্মতিতে আদায় করা হয়। যদি সুদি কারবারে লিপ্ত লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে যারা ইসলামের অধিকাংশ বা প্রায় সকল বিধান উপেক্ষা করে, যেমন এই তাতারদের অবস্থা?"[২৭২]

পরিশেষে, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ছিল যারা যাকাত আটকে রাখে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক, এবং তারা মুরতাদ। এমন লোকেরা যাকাতের বিধান অস্বীকার না করলেও তাদের জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি :

ক) তারা দলবদ্ধভাবে যাকাত দিতে অস্বীকার করে।

খ) যাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করে।

এই দুইটি শর্ত থাকলে, এ ধরনের লোকেরা মুরতাদ। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা আছে।

যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের ঘটনার উদাহরণ থেকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের ছাড়া অন্য বিধান দিয়ে বিচার বা শাসন সংক্রান্ত একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম, দলগতভাবে যাকাত দিতে অস্বীকার করা এবং এ উদ্দেশ্য লড়াই করা হলে কুফরের বিধান আসবে, যদিও যাকাতের বিধানকে স্বীকার করা হয়। একইভাবে সর্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে পুরো সমাজের ওপর কিছু মানবরচিত আইন চাপিয়ে দেয়া আর এককভাবে কোনো নির্দিষ্ট মামলায় ব্যক্তির আচরণের মধ্যেও পার্থক্য হবে। একক ব্যক্তির ওপরও কুফর ও রিদ্দার হুকুম আসতে পারে, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে।

আলিমরা প্রায়শই ব্যক্তি এবং সমষ্টির (দল) মধ্যেকার পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

---

[২৭২] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৪৪, আয়াতের শানে নুযুল দেখুন তাফসীরুত তাবারী, ৬/২৩, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত, তাফসিরু ইবনি কাসীর, ১/৪৮৯-৪৯০,আশ-শাব প্রকাশিত।

Scanned by CamScanner

করে থাকেন। ব্যক্তিপর্যায়ের ঘটনা আর পুরো উম্মাহকে যে ঘটনা প্রভাবিত করে তার মধ্যেও আছে পার্থক্য। চরমপন্থী রাফিদ্বি ও যারা তাদের পীরদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "এই লোকগুলোর সবাই কাফির। মুসলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। সম্ভব হলে তাদের একক ব্যক্তিদেরও হত্যা করতে হবে। কিন্তু রাফিদ্বি ও খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে উমার এবং আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের কোনো একক ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্ভব হলে তা-ই করতে হবে। ফকীহগণ এমন ব্যক্তিকে সম্ভব হলে হত্যা করার ব্যাপারে দ্বিমত করলেও, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, দলগতভাবে বিদ্রোহী গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক। আর হত্যার চেয়ে লড়াইয়ের অর্থ অনেক ব্যাপক...।"[২৭৩]

যারা যাকাত আটকে রেখেছিল সাহাবিরা তাদের ব্যাপারে কুফর ও রিদ্দার রায় দিয়েছিলেন। কে যাকাতের বিধানকে ফরয মনে করল, আর কে করল না; এ নিয়ে তাঁরা কোনো পার্থক্য করেননি। এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকনির্দেশিকা।

যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকা লোকদের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় আছে যা ভিন্নমত পোষণকারীদের প্রায় সবাই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে।

তারা বলে, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর খিলাফতের সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে মত পরিবর্তন করেছিলেন। যারা যাকাত আটকে রেখেছিল, তারা কাফির, তাদের সন্তানদের বন্দী করা হবে, ধনসম্পত্তি গনিমত হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হবে—এটি ছিল আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফত চলাকালীন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মত। কিন্তু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর খিলাফতকালে তাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেন।

এই দাবির ভিত্তিতে তারা বলে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবিদের ইজমা ছিল—এটা বলা সঠিক না।

এই বিষয়টি অনেক দিন পর্যন্ত আমাকে সন্দেহগ্রস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্য দেখার পর সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আসলে, এটি একটি ভ্রান্ত যুক্তি এবং এই দাবি করেছিল মিনহাজুল কারামাহ গ্রন্থের লেখক, এক রাফিদ্বি। তার বক্তব্য ছিল, যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে ইজমা ছিল না; বরং

---

[২৭৩] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৪৭৫-৪৭৬।

Scanned by CamScanner

মতপার্থক্য ছিল। সে বলেছে,

> “ষষ্ঠ মতপার্থক্যটি ছিল যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং উমার তার খিলাফতকালে তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। তাদের বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।”

এই কথার খণ্ডন করে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> “এটি একটি মিথ্যাচার। মুসলিমদের তৎকালীন ঘটনা সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের কাছে এটি স্পষ্ট। আস-সহীহাইনে (সহিহুল বুখারী ও সহিহু মুসলিম) এসেছে, আবু বকরের সাথে যাকাত অনাদায়ীদের ব্যাপারে আলাপ করার পর উমার ও আবু বকর দুজনেই একমত হলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সুতরাং যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে আবু বকরের সাথে উমার একমত হয়েছেন, একমত হয়েছেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম।
>
> তারপর, প্রথমদিকে যাকাত দিতে অস্বীকার করার পর যারা যাকাত প্রদানে সম্মত হলো, তাদের নারী-শিশুদের বন্দী করা হয়নি। যুদ্ধবন্দী হিসেবেও (দাস-দাসী) গ্রহণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় কিংবা আবু বকরের সময়েও মদীনাতে তখন কোনো কারাগার ছিল না...।
>
> ইসলামের প্রথম কারাগার ছিল মক্কাতে। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার বাড়ি খরিদ করে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেটাকে কারাগারে রূপান্তর করেন।
>
> কিন্তু কিছু লোক দাবি করে, আবু বকর তাদের নারী-শিশুদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তারপর উমার তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। যদি তাদের দাবি অনুসারে এই ঘটনাটি ঘটেও থাকে, তবুও এর মাধ্যমে যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার দাবি প্রমাণিত হয় না। হতে পারে, তাদের নারী-শিশুদেরকে বন্দী করার বৈধতার ব্যাপারে উমার একমত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের নারী-শিশুদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
>
> মুসলিমদের মধ্যে হাওয়াযিন গোত্রের নারী-শিশুদেরকে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। একপর্যায়ে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। নবী ﷺ তখন বললেন, যারা ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক তারা ফিরিয়ে দেবে। যারা ইচ্ছুক ছিলেন তারা ফিরিয়ে দিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি ঐচ্ছিক ছিল)। যারা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেননি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলেন।

Scanned by CamScanner

আবু বকর, উমার এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত ছিলেন, কোনো মুরতাদকে ঘোড়ায় চড়ার কিংবা অস্ত্র বহনের অনুমতি দেয়া যাবে না। তাদেরকে খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলিফার কাছে ও মুমিনদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তারা সত্যিকারভাবে ইসলামে ফিরে এসেছে।[২৭৪] যখন (উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে স্পষ্ট হলো তারা সত্যিকারভাবে আদর্শ মুসলিম হয়েছে, তখন তিনি তাদের বন্দীদের (নারী-শিশুদের) তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, কারণ এটা করা জায়েয ছিল।"[২৭৫]

মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান নিয়ে আমরা এতক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যাকাত অনাদায়ীরাও এই মুরতাদের অন্তর্ভুক্ত। এ ঘটনাকে দলবদ্ধভাবে ইসলাম ত্যাগ এবং দ্বীন ও দ্বীনের বিধান পরিবর্তনের প্রথম আন্দোলন গণ্য করা হয়। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে এমনটাই উল্লেখ করেছেন।

তাতারদের ইয়াসিক ও ইবনু তাইমিয়্যাহর অবস্থান

এটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, যা এই সময়কালকে আগের যুগগুলোর চেয়ে স্বতন্ত্র করেছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটা পর্যন্ত মুসলিমরা ইসলামী শরীয়াহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার অধীনে ছিল না। তার মানে এই না যে এই পুরো সময়ে কখনো কোনো অত্যাচার-অবিচার, অন্যায় রক্তপাত বা অন্যায়ভাবে সম্পত্তির জবরদখল করা হয়নি। বরং বিভিন্ন শাসকদের দিক থেকে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায় ছিল। উমাইয়্যা, আব্বাসীয় এবং অন্যান্য শাসনামলে শাসক ও কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক অবিচারের দৃষ্টান্ত আছে। এ সময় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম ফিতনা-ফাসাদের বিস্তারও ঘটেছে। ইতিহাস গ্রন্থে এগুলো বিস্তারিত সংরক্ষণ করেছেন মুসলিম ঐতিহাসিকরা। কিন্তু ইসলাম বাদে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা বা আইন দিয়ে মুসলিমরা কখনোই শাসনকার্য পরিচালনা করেননি। অন্যায়-অবিচার ঘটলেও সকলেই জানতেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এসব অবিচারগুলো ঘটছে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের খেয়ালখুশির অনুসরণ, প্রতিশোধ-স্পৃহা কিংবা অন্যান্য কারণে। পূর্ববর্তী শাসকের বিদায়ের পর ন্যায়পরায়ণ শাসক এলে তিনি পরিস্থিতি সংশোধন করতেন। মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেন ইসলামী

---

[২৭৪] সহিহুল বুখারী : কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইসতিখলাফ, হাদীস নং ৭২২১। আরও দেখুন ফাতহুল বারী, ১৩/২১০, ১ম সালাফী মুদ্রণ।

[২৭৫] মিনহাজুস সুন্নাহ, ৬/৩৪৭-৩৪৯।

Scanned by CamScanner

শরীয়াহ অনুসারে।

শাসকদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, শাসক অত্যাচারী হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ না।[২৭৬] নানা রকম যুলুম-অত্যাচার-অবিচার ঘটতে পারে, কিন্তু সেগুলোর কারণে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাদের আনুগত্য পরিহার করাও বৈধ নয়, যদি না তারা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়।

কিন্তু শাসকেরা আল্লাহর শরীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন শাসনব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন করে, বিচার-ফায়সালাকে একদল লোক বা রাষ্ট্রের দিকে অর্পণ করে, আর এত সবকিছুর পরও নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে—এমন ঘটনা ইসলামে ইতিহাসে নজিরবিহীন। ইবনু তাইমিয়্যাহর সময়কালের আগে এমন কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না।

হ্যাঁ, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু দল ছিল যারা শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়ে এমনসব আইন ও আকীদাহ আরোপ করেছিল যা সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ফিরকাগুলো ছিল স্পষ্টতই ইসলামের সীমার বাইরে। যেমন : উবাইদিয়া (ফাতেমী শিয়া) গোষ্ঠী, যাদের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "প্রায় ২০০ বছর ধরে কায়রোতে ইসলামী শরীয়াহ-বহির্ভূত শাসন চলেছে। এখানকার শাসকরা বাহ্যিকভাবে ছিল রাফিদ্বি, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এরা ছিল বাতিনী ইসমাঈলি, নুসাইরি, কারামিতা। তাদের খণ্ডন করে আল-গাযালি (রাহিমাহুল্লাহ) তার বইতে লিখেছেন, 'বাহ্যিকভাবে তারা রাফিদ্বিদের অনুসরণ করে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে (তাদের আকীদাহ) সুস্পষ্ট কুফর।'
>
> ফাতিমীরা ইসলামী সীমানার বাইরে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ—মুসলিমদের বিভিন্ন দল-উপদল, তাদের আলিম, শাসক, সাধারণ মানুষ, হানাফী, মালিকী, শাফিয়ি ও হানবলীসহ অন্যান্যরা এ বিষয়ে একমত।

---

[২৭৬] শাসকের তিন অবস্থা :
ক. শাসক মুসলিম ও ন্যায়পরায়ণ। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। এ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।
খ. শাসক মুসলিম, কিন্তু অত্যাচারী। তবে তার থেকে কোনো সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়নি। এ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি না? এ নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে; তবে অধিকাংশের মতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ দাবি করেছেন, বিদ্রোহ না করার বিষয়ে ইজমা রয়েছে; কিন্তু এ দাবি সঠিক নয়, কেননা এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর ইমামদের পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে আর আহলুস সুন্নাহর পারস্পরিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ইজমা কীভাবে সম্ভব?
গ. শাসক কাফির কিংবা মুরতাদ। এই শাসকের বিরুদ্ধে সামর্থ্য থাকলে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

সকলেই বলেছেন ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর বংশধর হবার যে দাবি তারা করে, তা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার... তারা মূলত ইসমাঈলি, নুসাইরি, দ্রুজ ইত্যাদি। যারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাতারদের সহায়তা করেছে।[২৭৭] হালাকু খানের উপদেষ্টা আন-নাসির আত-তুসী ছিল তাদের ইমামদের অন্যতম।"[২৭৮]

সেই সময় এই ঘটনার পাশাপাশি দেখা দিলো তাতারদের ফিতনাহ। তারা মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করল। তাতাররা পরিচালিত হতো তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের রচিত শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুনের দ্বারা। যার নাম আল-ইয়াসা (الياسا) বা আল-ইয়াসিক (الياسق)। তারা সামগ্রিকভাবে এই বিধান প্রয়োগ করত। এটি ছিল তাদের 'পবিত্র সংবিধান'। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার সময়ও এটি সাথে করে নিয়ে যেত তারা।

ইয়াসা (ياسا) শব্দটি কয়েকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ইয়া-সাহ (ياسه), ইয়াসা-ক (يساق) বা ইয়াসাক (يسق)। এটি একটি মঙ্গোলীয় (তুর্কি) শব্দ, যার দ্বারা তাতার নেতা চেঙ্গিসের তৈরি আইনকানুনকে বোঝানো হয়।[২৭৯]

তার সময়কার হাজিব (আক্ষরিক অর্থে শাসকদের দারোয়ান) ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল-মাকরিযি লিখেছেন,

> "এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ছিল সৈনিক ও তাদের কমান্ডারদের মধ্যে বিচার করা। মাঝে মাঝে তারা স্বাধীনভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিচার করত আবার

---

[২৭৭] রাফিদ্বি ও তাতারদের পারস্পরিক সহায়তায় বিষয়টির দিকে ইবনু তাইমিয়্যাহ ইঙ্গিত করেছেন। তাতার আইনকানুনের লিখিত রূপ ইয়াসিকে এমন কিছু আইনকানুন দেখতে পাওয়া যায়, যা খুবই চমকপ্রদ। আল-মাকরিজি এসবের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন; সেখানে আছে, আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরদের প্রতি বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে, তাদের কোনো দুঃখ-দুর্দশা দেওয়া যাবে না, ভারী কাজ চাপানো যাবে না। লিখিত আছে, '...আলী ইবনু আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো বংশধরের ওপর কোনোরকমের দুঃখ-দুর্দশা বা কষ্টকর কাজ আরোপ করা যাবে না, এটাই শর্ত।' সামনে বিস্তারিত সূত্রসহ আলোচনা আসছে।

[২৭৮] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৬৩৫-৬৩৬।

[২৭৯] তাজুল আরুস'তে (৭/৯৮), এটি 'ইয়া' ও 'ক্বাফ' এর সাথে যুক্ত সেকশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইয়াসা-ক্ব (يساق) শব্দটি থেকে এক আলিফ বাদ দিয়ে ইয়াসাক (يسق) রূপেও উচ্চারণ করা যায়। শব্দটির আদিরূপ 'ইয়াসাগ', যাতে গাইন (غ) যুক্ত ছিল। পরে এটা ক্বাফ'তে (ق) রূপান্তরিত হয়। এভাবে অপভ্রংশের মাধ্যমে এটি তুর্কি শব্দে পরিণত হয়, যার অর্থ জনসাধারণের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য আইনকানুন নির্ধারণ করা। ইয়াসা (ياسا) সংবিধানের অধিকাংশ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড, এ জন্য শব্দটি পরবর্তী সময়ে মৃত্যু বা হত্যার সমার্থক শব্দ পরিণত হয়েছে। আল-মুগল ফিত-তারিখ, ১/৩৩৮ দ্র.।

Scanned by CamScanner

কখনো পরামর্শ গ্রহণ করত শাসক বা তার সহকারীরা। কিন্তু হাজিবদের বিচার সীমাবদ্ধ ছিল সৈনিকদের মধ্যেকার বিবাদ, ভূমি বণ্টন ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মতপার্থক্যের মধ্যে।

হাজিবদের কেউই অতীতে শরীয়াহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ কিংবা ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে বিবাদ ইত্যাদি নিয়ে রায় দিত না। শরীয়াহ অনুযায়ী মীমাংসার এসব বিষয় তারা হস্তান্তর করত কাযিদের কাছে। প্রায়ই দেখা যেত, কাতেব ও জামিনদাররা হাজিবদের দরবার থেকে পালিয়ে কাযির দরবারে এসে শরীয়াহর আইনে বিচার চাইত। আর একবার কোনো কাযির দরবারে মামলা উপস্থিত হলে কেউ তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিতে পারত না...।"[২৮০]

পরবর্তী সময় হাজিবদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাদের অবস্থান চলে আসে কাযিদের সমান্তরালে। আল-মাকরিযি বলেছেন,

"এরপর সবকিছু বদলে গেল। যেসব কমান্ডাররা আজ[২৮১] মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করে তাদের অনেকের ক্ষেত্রে 'হাজিব' পদবি ব্যবহার করা হয়... আজকের হাজিবরা ছোট-বড় যেকোনো বিষয়ে বিচার করে। সেই রায় শরীয়াহ মোতাবেক হোক কিংবা না হোক। শরীয়াহ-বহির্ভূত রায়কে তারা বলে 'সিয়াসাহ'। শরীয়াহ কোর্টের কোনো কাযিও যদি বিচারপ্রার্থীকে (বাদী) হাজিবদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তিনি তাতে সক্ষম হবেন না।"[২৮২]

এরপর তিনি বলেছেন,

"হাজিবদের শাসনকেই সর্বপ্রথম 'সিয়াসাহ' এর শাসন বলা শুরু হয়। এটি একটি শয়তানি পরিভাষা। অধিকাংশ লোক শব্দটির উৎপত্তি জানে না। না জেনেই তারা 'সিয়াসাহ' শব্দটি ব্যবহার করে। তারা বলে, অমুক বিষয়টি শরীয়াহর আইনে ফায়সালা করা যাবে না, কাজেই এটি সিয়াসাহর আইনে ফায়সালা করতে হবে। তাদের কাছে এটি নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু আল্লাহর কাছে খুবই মারাত্মক। (সূরা আন-নূরের ১৫ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।"

অতঃপর আল-মাকরিযি শারা' (الشرع) এবং সিয়াসাহ (سياسه) শব্দদ্বয়ের আরবি অর্থ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সিয়াসাহ দুই প্রকার; সিয়াসাহ আদিলাহ বা

---

[২৮০] আল-খুতাত, ২/২১৯, বুলাক এডিশন।

[২৮১] আল-মাকরিজি ৮৪৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পূর্ণ নাম তাকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আলী, তিনি ৭৬৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্র. আজ-জাওয়ুল লামি, ২/২১; আল-বাদরুত তালি, ১/৭৯; আল-আলাম, ১/১৭৭।

[২৮২] আল-খুতাত, ২/২১৯-২২০।

Scanned by CamScanner

ন্যায্য সিয়াসাহ এবং সিয়াসাহ যালিমা বা অত্যাচারী সিয়াসাহ (سياسه ظالم)। ন্যায্য সিয়াসাহ হলো শার'ঈ সিয়াসাহ, বিভিন্ন বই-পুস্তকে এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর সিয়াসাহ যালিমা হলো অত্যাচারী সিয়াসাহ যা শরীয়াহতে নিষিদ্ধ। এরপর তিনি সিয়াসাহ শব্দের উৎপত্তির আলোচনা করেছেন। যারা মনে করে এটি আরবি শব্দ তাদের ভ্রান্তি খণ্ডন করে বলেছেন,

> "আজকালকার লোকেরা (সিয়াসাহ শব্দের উৎপত্তির ব্যাপারে) যা বলে তা একেবারেই সঠিক না। বরং এই ক্রিয়াটির আদিরূপ ছিল ইয়া-সাহ। তারপর মিশরীয়রা শুরুতে সীন (س) হরফ যুক্ত করে ইয়া-সাহকে 'সিয়াসাহ' বলতে শুরু করল। এরপর শব্দটির শুরুতে সুনির্দিষ্টবাচক আর্টিকেল 'আল' যুক্ত করল। ফলে যাদের আরবি ভাষাগত কোনো জ্ঞান নেই তারা শব্দটিকে আরবি মনে করতে শুরু করল। কিন্তু আমি যা উল্লেখ করেছি সেটাই হলো বাস্তবতা, এটি আরবি শব্দ নয়।[২৮৩]

দেখুন আজ কীভাবে এই শব্দ মিশর ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। এটি এখন সুপরিচিত। পশ্চিমের তাতার রাষ্ট্রের নেতা চেঙ্গিস খান যখন রাজা ওং খানকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করল, তখন সে নিজস্ব কিছু নীতি ও শাস্তি নির্ধারণ করল। এগুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করল, নাম দিল 'ইয়া-সাহ'। কিছু লোক যদিও 'ইয়াসাক' উচ্চারণ করে, কিন্তু আদি উচ্চারণ ইয়াসাহ। সেসব আইনকানুন লেখা

---

[২৮৩] 'সিয়াসাহ আরবি শব্দ না এবং সিয়াসাহর আদি রূপ ছিল ইয়া-সাহ এবং এটিই সঠিক'— কথাটি ত্রুটিমুক্ত নয়, কেননা হাদীসে এবং সালাফদের লিখনীতে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। হাদীসের মধ্যে সিয়াসাহ শব্দের পরিবর্তিত রূপ এসেছে। যেমন, রাসূল ﷺ বলেন, (كانت بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي)
'বনি ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন (তাসুসুহুম) করতেন। যখন কোনো একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। (সহিহুল বুখারি, ৩৪৫৫; সহীহ মুসলিম, ১৮৪২)।
ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ তাসুসুহুমুল আম্বিয়া (تسوسهم الأنبياء) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'কর্তৃত্বশীল ও আমির-উমারা যেভাবে তাদের অধীনস্থ প্রজাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করে থাকেন, নবীগণও তাদের উম্মতকে ওইভাবে পরিচালনা করতেন। সিয়াসাহ হলো, কোনো কাজকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা।' তা ছাড়া সিয়াসাহ ক্রিয়ামূল হিসেবেও আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ব্যবহার করেছেন। তিনি মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে বলেন,
إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه، الحسن السياسة، الحسن التدبير
আমি তাকে (মুয়াবিয়াহ ইবনু আবি সুফয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মাজলুম খলিফা উসমানের অভিভাবক এবং তাঁর রক্তের দাবিদার পেয়েছি। তাঁর সিয়াসত (পরিচালনা) ও ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর। (তারিখুত তাবারি, ইমাম তাবারি, ৫/৬৮), এখানে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা অর্থে সিয়াসাতের ব্যবহার এসেছে। এ ছাড়াও দেখতে পারেন : লিসানুল আরব, ৬/১০৭; আল-কামুসুল মুহিত, পৃ. ৭১০। সঠিকতর বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

শেষ হবার পর চেঙ্গিসের নির্দেশে তা লোহার পাতে খোদাই করা হলো। জনগণের ওপর সংবিধান হিসেবে সে একে নির্ধারণ করে দিলো। তার মৃত্যুর পরেও তাতাররা সেটি আঁকড়ে রইল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করলেন। ইতিহাসের ন্যূনতম জ্ঞান আছে এমন সকলে জানে চেঙ্গিস খান দুনিয়াবাসীর কোনো ধর্ম অনুসরণ করেনি। চেঙ্গিসের পর তাতাররা ইয়া-সাহ থেকে বিচ্যুত হয়নি; এর মাধ্যমেই শাসন করতে থাকল।"[২৮৪]

হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের সময় তাতার নেতা অরঘুনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ কাতেব ছিল আলাউদ্দিন আল-জুওয়াইনী।[২৮৫] তার সময়কালেই হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে। আল-কালকাসন্দি[২৮৬], আলাউদ্দীন আল-জুয়াইনী থেকে বর্ণনা করেছেন,

"চেঙ্গিস খানের লোকদের একটি প্রথা ছিল, যারা কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করবে অন্যরা তাকে নিন্দা করবে না।"[২৮৭]

এরপর আল-কালকাসন্দি ইয়াসাহর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

"...চেঙ্গিস খান ইয়াসাহ তৈরি করেছিল এবং এর মাধ্যমে শাসন করেছিল। পরবর্তী প্রজন্মগুলো অনুসরণ করেছে চেঙ্গিস খানের আদর্শ। ইয়াসাহর আইনগুলো চেঙ্গিস তৈরি করেছিলেন নিজস্ব ভাবনা থেকে। সেখানে বিভিন্ন বিচার ও শাস্তির বর্ণনা ছিল, যার মধ্যে নবী ﷺ-এর শরীয়াহর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিছু ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশই ছিল শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। চেঙ্গিস খান এর নাম দেয় 'আল-ইয়াসা আল-কুবরা'। সে এটি লিপিবদ্ধ করে। আদেশ জারি করে এই লিপি সিন্দুকে ভরে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করা হবে এবং তার

---

[২৮৪] আল-খুতাত, ২/২২০।

[২৮৫] আলাউদ্দিন আতা মালিক আল জুয়াইনী, তিনি ও তার পিতা মঙ্গলদের জন্য কাজ করতেন। তার জন্ম ৬২৩ হিজরী এবং মৃত্যু ৬৮৬ হিজরী। দাওলাতুল ইসমাঈলিয়্যাহ ফিল-ইরান, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৮। যারা মোঙ্গলদের ইতিহাস লিখেছে আল জুয়াইনী তাদের অন্যতম। মোঙ্গলদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক ঐতিহাসিকগণ তার ও রশিদ উদ্দিন নামক আরেকজন ঐতিহাসিকের রচনা ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন ইবনু কাসীর এসব উৎস থেকে চেঙ্গিস খানের জীবনী লিখেছেন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১১৭।

[২৮৬] আহমাদ ইবনু আলী ইবনি আহমাদ আল ফারাজ, জন্ম ৭৫৬ হিজরী মৃত্যু ৮২১ হিজরী, আজ-জাওয়ুল লামী; ২/৮, আল-আলাম, ১/১৭৭।

[২৮৭] সুবহুল আশা, ৪/৩১০। আতা মালিক আল জুইয়াইনী নিজেই এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন যার শিরোনাম তারিখু ফাতিহিল আলাম জাহানকুশাই, ১/৬২-৬৩, ড. মুহাম্মদ আত-তুয়ানজি অনূদিত ও সম্পাদিত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি/১৯৮৫ ইং, দার আল-মালাহ পাবলিশার্স।

Scanned by CamScanner

সন্তানদের শিক্ষা দেয়া হবে।"[২৮৮]

ইবনু কাসীর বলেছেন, "আল-ইয়াসা বড় বড় হরফের দুটি ভলিউমে লেখা হয়েছে, তাতাররা উটের পিঠে করে এটা তাদের সাথে বহন করত।"[২৮৯] ইয়াসাহতে লিপিবদ্ধ আইনকানুনের মধ্যে ছিল :

♦ "যে ব্যভিচার করবে তাকে হত্যা করা হবে। বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না।

♦ যে সমকামিতায় লিপ্ত হবে তাকে হত্যা করা হবে।

♦ যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, জাদুচর্চা, গুপ্তচরবৃত্তি করবে অথবা দুইজন তর্করত ব্যক্তির মধ্যে নাক গলিয়ে একের বিরুদ্ধে অন্যকে সহায়তা করবে, তাকে হত্যা করা হবে।

♦ যে পানি বা ছাইয়ের ওপর মূত্রত্যাগ করে, তাকে হত্যা করা হবে।

♦ কাউকে কোনো ব্যবসা পণ্য দেওয়ার পর ক্রমাগত তিনবার লোকসান করলে তাকে হত্যা করা হবে।

♦ যে বিনা অনুমতিতে অন্যের বন্দীকে খাবার বা পোশাক দেয়, তাকে হত্যা করা হবে...।

♦ মুসলিমদের পদ্ধতিতে কোনো পশু জবাই করলে হত্যা করা হবে।..."[২৯০]

♦ চেঙ্গিস খান আদেশ দিয়েছিল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী না হয়ে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার। অধীনস্থদের ওপর সে নিয়ম জারি করেছিল, কেউ হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করতে পারবে না। বরং কোনো পাত্রের মাধ্যমে উঠিয়ে তা পান করতে হবে। তার অনুসারীদের সে কাপড় ধুতে নিষেধ করত। বলত, ছিঁড়ে যাবার আগ পর্যন্ত সেগুলো পরতে হবে।[২৯১]

♦ সে কোনো বস্তুকে নাপাক বলা নিষিদ্ধ করেছিল। বলত সবকিছুই পাক-পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে সে কোনো পার্থক্য করত না। কেউ কোনো নির্দিষ্ট ফিরকার অনুসারী হতে চাইলে বাধা দিত।[২৯২]

---

[২৮৮] প্রাগুক্ত, ৪/৩১০-৩১১। এসব আইনকানুনের বিকাশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন আল জুয়াইনী রচিত 'তারিখু ফাতহিল আলাম', ১/৬১-৬৮।

[২৮৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩৮১১/

[২৯০] এসব অদ্ভুত কানুনের বিবরণ দেখুন, তারিখু আতা মালিক আল-জুয়াইনী, ১/১৯১, ২৪৮।

[২৯১] প্রাগুক্ত।

[২৯২] আল-খুতাত, ২/২২০-২২১।

Scanned by CamScanner

◆ চেঙ্গিস খানের এসব আইনকানুনের মধ্যে একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে আইন জারি করেছিল যে, প্রত্যেক শাসককে একটি ডাক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের খবরাখবর খুব দ্রুত সংগ্রহ করা যায়।[২৯৩]

এই ছিল তাতার নেতা চেঙ্গিস খানের ইয়াসাহ-ব্যবস্থা।

তার মৃত্যুর পর তার সন্তানাদি ও অনুসারীরা ইয়াসাহ সংবিধানকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল, যেভাবে প্রথম যুগের মুসলিমরা কুরআনের বিধিবিধানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এটাকে তারা একটি ধর্মে পরিণত করল, তাদের মধ্যে কেউ যার কোনো বিরোধিতা করত না।[২৯৪]

মুসলিম বিশ্ব আক্রমণের সময় এটাই ছিল তাতারদের অনুসৃত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এরপর একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। তাদের অনেকে ইসলামে প্রবেশ করল। এমনকি তাদের নেতা কাযান ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের দাবি করলেও তাদের আচরণে এমন অনেক কিছু ছিল যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন :

ক) সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলিম ভূমিতে তাদের হামলা। তারা মুসলিমদের ধন-সম্পত্তি লুট করেছিল ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলা করেছে।

খ) ইয়াসিকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও একে পবিত্র গণ্য করা। এর অনেক কিছু ইসলামী শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো তারা বাস্তবায়ন করত।

গ) বিভিন্ন ইসলামী বিধান তারা বাস্তবায়ন করেনি। যেমন : সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, মুসলিমদের রক্তপাত হতে বিরত থাকা, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর জিজিয়া আরোপ করা ইত্যাদি।

ঘ) নানা রকমের অন্যায়-অনাচারের অনুমোদন দেয়া। যেমন : মদ্যশালা ও পতিতালয় খোলা। খ্রিষ্টানদের প্রকাশ্যে ক্রুশ প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া। তাতারদের সময় বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) ও আল-খালিলে (হেবরন) খ্রিষ্টানরা প্রকাশ্যে ক্রুশ প্রদর্শন করত।

এসব সত্ত্বেও নিজেদেরকে তারা মুসলিম দাবি করত। সাক্ষ্য দিত দুই কালেমার। সুলতান নাসির কালাউনের প্রতি লেখা চিঠিতে কাযান লিখেছিল, তারা উভয়ে একই ধর্মের অনুসারী। বলেছিল, আল্লাহ তাদেরকে দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। সে আরও বলেছিল, কিছু মামলুক সৈন্যরা মারদ্বীনবাসীদের ওপর যখন হামলা করেছিল,

---

[২৯৩] প্রাগুক্ত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ দিকে ডাক-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছিল। তাতারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দুর্বলতা সৃষ্টির এটি অন্যতম কারণ।

[২৯৪] আল-খুতাত, ২/২২১।

Scanned by CamScanner

সে-ই তাদের সুরক্ষা দিয়েছে। আর এটা সে করেছে কেবল ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যেই।

দামেস্ক দখলের সময় লেখা আরেক চিঠিতে মিশর ও সিরিয়ার শাসকদের দ্বীন থেকে বিচ্যুতি ও ইসলামী আইনকানুন আঁকড়ে না ধরার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কাযান।[২৯৫]

শামবাসী ও তাতারদের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, এমন পরিস্থিতি ও দাবির কারণে লোকেরা সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেল। তাতাররা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করছে। সাক্ষ্য দিচ্ছে দুই কালেমার। তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব?[২৯৬]

কেবল সাধারণ মানুষ না, এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে গেলেন আলিম ও ফকীহরাও। এই জটিল সমস্যার সমাধান এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একজন ব্যক্তির যিনি সত্যকে স্পষ্ট করবেন। যার কাছ থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে মুসলিমরা। এই বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমাধানে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করলেন।

(১) তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

ইবনু তাইমিয়্যাহ তাতারদের ব্যাপারে হুকুম মুসলিমদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন। তাতারদের ব্যাপারে তাঁর কাছে নানা রকমের প্রশ্ন এসেছিল। তাতাররা একদিকে দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়। অন্য দিকে মুসলিমদের হত্যা করে, তাদের নারী-শিশুদের বন্দী করে, ইসলামের পবিত্র বিভিন্ন বিষয়কে অসম্মানিত করে। যেমন : মুসলিমদের অপমান করা, মাসজিদের; বিশেষ করে বাইতুল মাকদিসের সম্মান নষ্ট করা ইত্যাদি। এ সাংঘর্ষিকতার কারণে তাতারদের নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি কাজ করছিল। এর মধ্যে কিছু মুসলিম দাবি করতে শুরু করল তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। নিজেদের যারা মুসলিম দাবি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ হয় কীভাবে?

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল :

> তাতারদের সৈনিকদের ব্যাপারে কী হুকুম হবে, যারা দাবি করে তাদের কাছে ইসলামের জ্ঞান ও বুঝ আছে? অথবা দাবি করে তারা ফকির, সুফি ইত্যাদি?
>
> আর তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে, যারা বলে তাতাররা মুসলিম; যারা তাদের

---

[২৯৫] নাসির কালাউনের প্রতি প্রেরিত কাজানের চিঠিপত্র ও এসবের জবাব দেখুন 'ওয়াসাইকুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ ওয়াল-গায আল-মুগুলী' গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ৩৮৩-৪০৩।

[২৯৬] দুই কালেমার সাক্ষ্য : (১) আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং (২) মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল—এই দুইটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনা ও সাক্ষ্য প্রদান করা।

Scanned by CamScanner

বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারাও মুসলিম। দুই দলই ফিতনাবাজ, তাই কারও পক্ষেই আমাদের লড়াই করা উচিত না?...

আমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত উত্তর প্রদান করুন যেন আমরা উপকৃত হতে পারি। বিষয়টি অধিকাংশ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করেছে, কারণ তারা তাতারদের বাস্তবতা জানে না কিংবা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম জানে না।

আরেকটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল :

অনেক সৈন্য তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না। তারা বলে তাতারদের বাহিনীতে এমন অনেক লোক আছে যাদের জোর করে যুদ্ধ করতে নিয়ে আসা হয়েছে। যদি তাদের কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে আমরা কি পিছু ধাওয়া করতে পারি?

আরেকটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল :

তাতারদের মালামাল গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হালাল নাকি হারাম?

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন। প্রত্যেক ফাতওয়া প্রদানকারীর এই মূলনীতিটি মেনে চলা উচিত; বিশেষ করে নব-উদ্ভাবিত বিষয়ে ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে।

একটি প্রশ্নের জবাবে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

"হ্যাঁ; আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর নির্দেশ এবং ইমামদের ইজমা অনুসারে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বাধ্যতামূলক। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি দুইটি মূলনীতি :

১. তাদের ব্যাপারে বাস্তবিক জ্ঞান।

২. তাদের মতো লোকের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের জ্ঞান।

প্রথম নীতির ব্যাপারে : তাতারদের সাথে যারা উঠাবসা করেছে তারা তাদের বাস্তবতা জানে। যারা তাদের সাথে উঠাবসা করেনি তারাও নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে তাদের ব্যাপারে বাস্তবতা জেনেছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে তার আগে আরেকটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করছি। এটা কেবল ইসলামী শরীয়াহর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

আমরা বলি, ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করতে হবে, তারা দুই কালেমার সাক্ষ্য দিলেও—এ ব্যাপারে ইমামদের ইজমা আছে।

Scanned by CamScanner

যদি তারা কালেমার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে অস্বীকার করে, তবে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যদি তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে যাকাত প্রদান না করা পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি তারা রমাদ্বানের সিয়াম পালন বা বাইতুল্লাহয় হাজ্জ করতে অস্বীকৃতি জানায় কিংবা যিনা, মদ, জুয়া কিংবা শরীয়াহতে নিষিদ্ধ অন্যান্য বিষয়কে হারাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি তারা লোকদের জান, মাল, সম্মান ও আহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি তারা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে কিংবা কাফিরদেরকে পরাজিত ও নত করে জিজিয়া আদায় করা পর্যন্ত জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানায়। (সূরা আত-তাওবাহ, ৯:২৯ দ্রষ্টব্য)।

একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি তারা প্রকাশ্যে কুরআন-সুন্নাহ এবং উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম ও তাদের মধ্যেকার নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদআহর অনুসরণ করে। যেমন : প্রকাশ্যে আল্লাহর গুণবাচক নাম ও আয়াত অস্বীকার করা (সূরা আল-আরাফ, ৭:১৮০ দ্র.) (বা এসবের বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করে), কিংবা আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে অবিশ্বাস, অথবা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্বাদরের ব্যাপারে অবিশ্বাস, বা খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের সময়ে অধিকাংশ মুসলিমরা যা অনুসরণ করেছেন তার প্রতি অবিশ্বাস, সাহাবিদের গালমন্দ করা, আনসার-মুহাজির ও তাদের সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের গালমন্দ করা, অথবা নিজেদের অনুগত করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। (যারা এমন কাজ করে) তাদের এই কাজের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিঃসন্দেহে ইসলামের শরীয়াহ হতে বিচ্যুত হয়েছে...।”[২৯৭]

এরপর তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলিল উল্লেখ করেছেন। বর্ণনা দিয়েছেন মুরতাদ, খারিজি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাহাবিদের আচরণ কেমন ছিল।

“শেষ (দ্বিতীয়) নীতিটি হলো : তাদের (তাতারদের) বাস্তবতা জানতে হবে। তারা আসলে কেমন, তা জানতে হবে। আমরা জানি, ৬৯৯ হিজরীতে প্রথমবারের মতো তারা সিরিয়া আক্রমণ করে। তারা সেখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা ঘোষণা দেয়, যা দামেস্কের মিম্বার থেকে প্রচার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বন্দী করে প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম নারী-শিশুদের। বাইতুল মাকদিস, জাবালুস সালিহিইয়া, নাবলুস, হিমস, দারিয়া ও অন্যান্য স্থানে তারা যেসব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং যত

[২৯৭] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫১০-৫১১।

Scanned by CamScanner

লোক বন্দী করেছে তার বর্ণনা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

বলা হয়, তারা প্রায় এক লক্ষ মুসলিমকে বন্দী করেছিল। মাসজিদে ও অন্যান্য স্থানে ধর্ষণ করেছিল পর্দানশীল মুসলিম নারীদের, যেমন : আল মাসজিদুল আকসা (জেরুসালেম) এবং আল-মাসজিদ আল-উমাইয়ী (দামেস্কের উমাইয়া মাসজিদ) ও অন্যান্য স্থানে, এ ছাড়া উকাইবার মাসজিদকে তারা ধূলিসাৎ করেছে।

এদের সৈন্যদের অবস্থাও আমরা দেখেছি। তাদের অধিকাংশই সালাত আদায় করে না। তাদের শিবিরে আমরা কখনো কোনো ইমাম-মুয়াজ্জিন দেখিনি। আর তারা মুসলিমদের যেসব মালামাল লুট করেছে, নারী-শিশুদের বন্দী করেছে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিবরণ একমাত্র আল্লাহই জানেন...।

তারা লড়াই করছে চেঙ্গিস খানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা এই উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগত, তাদেরকে তারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও সে কাফির হয়। আর যারা এর প্রতি অনুগত না, তাকে তারা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও সে সর্বোত্তম মুসলিম হয়। তারা ইসলামের জন্য লড়াই করছে না এবং তারা (কিতাবীদের) জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করে না।”[২৯৮]

তাতাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও চেঙ্গিস খানকে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তার শিক্ষাকে পবিত্র গণ্য করত। এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার পর তিনি বলেছেন,

“এটি ইসলামের সুপরিচিত বিষয়ের একটি, যা না জানার কোনো অজুহাত নেই—ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণকে যে সমর্থন, ন্যায্যতা কিংবা বৈধতা দিতে চায়, সে একজন কাফির। এটি ওইসব লোকদের কুফরের মতো যারা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করে।”[২৯৯]

এরপর তিনি তাতারদের উপদেষ্টা এবং তাদের রাফিদ্বি আকীদাহর কথা বলেছেন। তারপর তিনি অন্যান্য প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দিয়েছেন।[৩০০]

এটি ছিল প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো বাস্তবিক থেকে।

(২) বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ

বাস্তবিক দিক থেকে ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বিষয়টি স্পষ্ট করেন তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও এতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে । সিরিয়া থেকে মিশরে গিয়ে সেখানকার সুলতান, আমির ও উপদেষ্টাদের সাথে তিনি দেখা করেন। তাদের

---

[২৯৮] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫১৯-৫২১।
[২৯৯] মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫২৪।
[৩০০] প্রাগুক্ত, ২৮/৫০১-৫৫৩, ৫৮৯।

Scanned by CamScanner

অনুপ্রাণিত করেন তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ আর যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুতের জন্য। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও এর প্রস্তুতিতে ইবনু তাইমিয়্যাহ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া তিনি নিজে কিছু সৈন্যদলও পরিচালনা করেন, যা সুবিদিত।

যেসব তাতাররা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি না—এই সংশয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ইবনু কাসীরও (রাহিমাহুল্লাহ)। তাতাদের ব্যাপারে আলোচনা করার পর শাকহাবের যুদ্ধ সম্পর্কে ইবনু কাসীর মন্তব্য করেছেন,

> "লোকেরা তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। এটা কোন ধরনের লড়াই হিসেবে গণ্য হবে? কারণ তারা তো বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রদর্শন করে। আবার তারা কোনো মুসলিম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেনি। কেননা তারা তো কারও প্রতি আনুগত্যের ওয়াদাই করেনি, তাহলে বিদ্রোহ কীভাবে হবে!...
>
> শাইখ তাকী উদ্দিন (ইবনু তাইমিয়্যাহ) তখন বললেন, 'তারা হলো সেই খারিজিদের মতো যারা আলী ও মুআওয়িয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। যারা তাঁদের পরিবর্তে নিজেদেরকে ক্ষমতার অধিকতর যোগ্য ভেবেছিল। তাতাররা দাবি করে, মুসলিমদের তুলনায় তারাই ক্ষমতার অধিকতর যোগ্য। গুনাহ ও ভুলক্রুটির জন্য তারা মুসলিমদের সমালোচনা করে। অথচ তারা যা করছে তা আরও বহুগুণে নিকৃষ্ট অপরাধ।'
>
> তিনি এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও আলিমদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তিনি লোকদের বলতেন, 'যদি তোমরা আমাকে তাদের বাহিনীতে মাথার ওপর মুসহাফ (কুরআন) ধরা অবস্থাতেও দেখতে পাও, আমাকে হত্যা করবে।' তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। লোকদের অন্তর ও নিয়্যাতকে দৃঢ় করেছিলেন। আর আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।"[৩০১]

'ইয়াসাহ' এবং এর বিভিন্ন আইনকানুনের কথা উল্লেখ করে ইবনু কাসীর বলেছেন,

> "এর সবকিছুই আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যা তিনি তাঁর বান্দা, নবীদের ওপর নাযিল করেছেন, তাঁদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল খাতামুন্নাবীয়্যিন (নবীদের সীলমোহর, শেষ নবী) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করেছেন তার পরিবর্তে কেউ যদি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের রহিত হয়ে যাওয়া বিধান দিয়েও বিচার-ফায়সালা করে তবে সে একজন কাফির। সুতরাং, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে ইয়াসাহর

---

[৩০১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৩-২৪।

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে বিচার করে এবং একে প্রাধান্য দেয় তার পরিণতি কেমন হতে পারে? যে তা করে, সে মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে একজন কাফির।"[৩০২]

"তারা কি জাহিলিয়াত আমলের ফায়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফায়সালাকারী কে?"(সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৫০), এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর বলেছেন,

"এর মাধ্যমে সেসব লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ বিধান সকল উত্তম জিনিসের আদেশ দেয়। নিষেধ করে সকল মন্দকে। যারা এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধ মতামত, মানবীয় প্রবৃত্তি আর ভিত্তিহীন বানোয়াট প্রথার অনুগামী হয়, আল্লাহ তাদের প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন। জাহিলি যুগের আরবরা এভাবে নিজেদের মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করত। মঙ্গোলরা (তাতার) একই কাজ করে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের বানানো ইয়াসিক সংবিধানের মাধ্যমে। এই ইয়াসিকের কিছু আইন ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিমসহ অনেকের থেকে ধার করে এনে বানানো। বাকিটা তার নিজের খামখেয়ালি মতামত। তার বংশধরদের মাঝে এর অনুসরণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর ওপর একে তারা প্রাধান্য দেয়। এ রকম আচরণকারীরা কাফির। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানে ফিরে এসে ছোট-বড় সকল বিষয়ে সে অনুযায়ী বিচার করছে, সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।"[৩০৩]

এভাবে ইবনু তাইমিয়্যাহ ও পরবর্তীকালে তার ছাত্ররা তাতারদের হুকুম সুস্পষ্ট করেছেন। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেছেন যেন উম্মাহর ওপর থেকে তাদের বিপদ হটানো যায়।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত

শরীয়াহ প্রত্যাখ্যানের চেষ্টার আরও কিছু উদাহরণ আছে। তবে তাতারদের তুলনায় এগুলো ছিল সীমিত আকারের। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যাপক বিভ্রান্তি মিশে ছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হলেও শরীয়াহর বিরোধিতাকারীরা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। আমাদের আলোচনার জন্য এমন তিনটি উদাহরণ পেশ করাই যথেষ্ট।

ক) বাতিনী ফিরকার আন্দোলন : বাতিনীদের বিভিন্ন দল-উপদল ছড়িয়ে ছিল মুসলিম

---

[৩০২] প্রাগুক্ত, ১৩/১১৯।
[৩০৩] তাফসিরু ইবনি কাসীর, ৩/১২২-১২৩, আশ-শা'ব মুদ্রণ। আহমাদ শাকির রচিত উমদাতুত তাফসীর দ্র. ৪/১৭৩, এ বিষয়ে তার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

Scanned by CamScanner

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। আল-গাযালি তার ফাদায়িহুল বাতিনিয়্যাহ গ্রন্থে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,

> "তাদের আকীদাহর পঞ্চম বৈশিষ্ট্য শরীয়াহর আনুগত্য প্রসঙ্গে। তাদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সবকিছুর চূড়ান্ত বৈধতায় বিশ্বাসী—পর্দার বিলুপ্তি, হারামের বৈধতা প্রদান এবং সেগুলো হালাল মনে করা, শরীয়াহর বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যান করা...।"[৩০৪]

সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ও জিহাদের মতো ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের ক্ষেত্রেও বাতিনীরা নিজস্ব অপব্যাখ্যা দেয়; যা সুপরিচিত।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাদের কুফর এতই প্রকাশ্য ছিল যে, সুন্নতের অনুসারীরা—সুন্নী মুসলিমরা—তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে তাদের মুরতাদ ও কাফির হবার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল সবার কাছে। এজন্য বাতিনীরা বাধ্য হয় নিজেদের আকীদাহ-বিশ্বাস লুকিয়ে রেখে, গোপনে ও ধীরগতিতে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করতে।

খ) সমসাময়িক যিন্দিকদের ব্যাপারে আল-জুয়াইনীর মন্তব্য : বিখ্যাত আব্বাসী উযীর গিয়াস উদ-দৌলা নিজামুল মুলকের প্রতি লেখা চিঠিতে তার যুগের কিছু যিন্দিকদের (ধর্মত্যাগী; আধুনিক যুগের সেক্যুলার গোষ্ঠী এদের সমতুল্য) ব্যাপারে আল-জুয়াইনী লিখেছেন,

> "বিভিন্ন এলাকা থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তা উল্লেখের পর, মাননীয় উযীরের সমীপে আমি যে বিষয়টি পেশ করতে চাই, এটি একটি মারাত্মক ফিতনা যা দ্বীনের ক্ষতি করছে। এটা থামানো না হলে অধিকাংশ মুসলিম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, যা পরবর্তীকালে মোকাবেলা করা দুঃসাধ্য। সাধারণ মানুষরা যেসব মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এটি তার অন্যতম।
>
> আল্লাহ যাকে কোনো কর্তৃত্বশীল পদে নিয়োজিত করেছেন, তার দায়িত্ব ইসলামের সমর্থন করা এবং দিনে-রাতে উম্মাহকে সুরক্ষিত রাখা। আমি সর্বোচ্চ যা করতে পারি তা হলো এই ফিতনা নির্মূলের চেষ্টা করা যেভাবে এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আর আল্লাহ যাকে কর্তৃত্বশীল করেছেন তার দায়িত্ব হলো লোকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।
>
> বিভিন্ন এলাকায় ও প্রধান শহরে একদল যিন্দিকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা আল্লাহ

---

[৩০৪] 'ফাজায়িহুল বাতিনিয়্যাহ', পৃ ৪৬।

Scanned by CamScanner

তা'আলার গুণাবলি অস্বীকার করে। এরা লোকদের সত্য নির্দেশনা ছুড়ে ফেলার দাওয়াত দেয়—এদের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের নেতাকে হেফাযত করুন। দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে এরা নির্ভর করছে বিভিন্ন বিভ্রান্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর। এরাই তাদের রক্ষক ও সমর্থক। এসব বিভ্রান্ত লোকেরা দয়াময় আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ভোগ করে সুখী জীবনযাপন করে; অথচ নিজেদের মজলিসে তারা দ্বীনের কটাক্ষ করে, তামাশা করে, আকারে-ইঙ্গিতে ও ইশারার মাধ্যমে মুসলিমদের শরীয়াহর সমালোচনা করে। এসব স্বভাব ও আচার-আচরণ তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের মাঝেও ছড়িয়ে গেছে। এরা তাদের অনুকরণ করে। এসব যিন্দিক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ভ্রান্ত যুক্তি ও পথভ্রষ্টতা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে গেছে। ইসলামের প্রতি কটাক্ষ ও অবমাননাকর আলোচনা, বিতর্ক সর্বত্র সয়লাব হয়ে গেছে...।"[৩০৫]

আল-জুয়াইনী এখানে কাদেরকে যিন্দিক হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন? বাতিনীদের নাকি অন্য কোনো ফিরকাকে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন সম্ভাব্য উত্তর আছে। কিন্তু তিনি অন্যত্র যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় বাতিনীদের না, বরং তিনি অন্য কোনো গোষ্ঠীর কথা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"পরিশেষে, যে মনে করে মানুষের ঐকমত্য, যুক্তি অথবা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামত থেকে শরীয়াহর আইনকানুন নির্ণয় করা যায়—তারা শরীয়াহ বর্জন করেছে। এবং এই নীতিকে শরীয়াহ বর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কেননা এই নীতি গ্রহণযোগ্য হলে, অবিবাহিত যিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা বৈধ হতো, সন্দেহের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বৈধ হতো। নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কিছু চিহ্ন বা নিদর্শনের ভিত্তিতেই উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাতের হার বৃদ্ধি করা বৈধ হতো...।

এসব যুক্তির কোনো মজবুত ভিত্তি নেই। এসব যুক্তিকে যদি দ্বীনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে দেখা যাবে প্রত্যেক যুক্তিবাদী ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে শরীয়াহ হিসেবে গ্রহণ করবে। ফলে রাসূল ﷺ -এর কাছে নাযিলকৃত ওয়াহির বদলে এসব চিন্তা-চেতনাই শরীয়াহর স্থান দখল করবে। অথচ এসব চিন্তা-চেতনা স্থান-কালভেদে পরিবর্তিত হয়, তখন শরীয়াহর কোনো স্থিতিশীলতা থাকবে না...।"[৩০৬]

এই উদ্ধৃতি থেকে সহজে বোঝা যায় যে, আল-জুয়াইনী ওইসব লোকদের মতামতের

---

[৩০৫] আল-গিয়াসি, আল-জুয়াইনি, পৃ ৩৮১-৩৮২, ড. আব্দুল আযিম আদ-দীব সম্পাদিত।
[৩০৬] প্রাগুক্ত, পৃ ২২০-২২১।

Scanned by CamScanner

দিকে ইঙ্গিত করেছেন যারা মনে করে কবীরা গুনাহকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোরতা ও আরও বল প্রয়োগ করে অধিকতর কার্যকরভাবে গুনাহ প্রতিরোধ করা যায়। ফলে তারা শরীয়াহর আইনকানুনে নতুন কিছু সংযোজন করতে চেয়েছিল। যেমন : অবিবাহিত যিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে চাওয়া, সন্দেহের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা ইত্যাদি।

নেক নিয়ত থেকেও যদি কেউ এমন কাজ করে তবু সেটা গ্রহণযোগ্য না। আল-জুয়াইনীর নিচের কথাগুলো লক্ষ করুন। তিনি বলেছেন,

> "শরীয়াহর নির্ধারিত সীমা যে অতিক্রম করবে, তাকে নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন হতে বিচ্যুত মনে করতে হবে। যে সীমালঙ্ঘন করে, কিন্তু গুনাহ করছে এটি স্বীকার করে, সে গুনাহগার, কিন্তু আল্লাহর রহমত থেকে তার নিরাশ হওয়া উচিত না।
>
> কিন্তু আফসোস তাদের জন্য যারা কবীরা গুনাহ করে, অথচ নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে এগুলোকে সে রাসূল ﷺ -এর দ্বীনের অংশ মনে করে। সত্য সেটাই যা ইমামগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় ছাড়া সবকিছুই পথভ্রষ্টতা, এটাই সত্য। 'আর সত্য প্রকাশের পর বিভ্রান্তি ছাড়া কী বাকি থাকে?' (সূরা ইউনুস, ১০:৩২ দ্রষ্টব্য)
>
> এ ধরনের চিন্তাধারার সাথে তাদের সাদৃশ্য পাওয়া, যারা কিসরা ও অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজা-বাদশাদের প্রথাকে দ্বীনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। যারা এসব আঁকড়ে ধরবে তারা এমনভাবে ইসলামকে দূরে ঠেলে দিলো, যেভাবে ময়দা থেকে চুল টেনে বের করা হয়।"[৩০৭]

আল-জুয়াইনী (রাহিমাহুল্লাহ) এসব কথা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা দ্বীন পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। আল-জুয়াইনীর যুগ পর্যন্ত এবং পরবর্তী যুগেও মুসলিমরা ক্রমাগত শরীয়াহ আঁকড়ে থেকেছে। আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছুই বিচার-ফায়সালার উৎস হিসেবে মুসলিম উম্মাহ মেনে নেয়নি। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে নানা রকমের যুলুম, অত্যাচার, অবিচার ও মন্দের বিস্তার সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ধারিত শাসন ও বিচারব্যবস্থা টিকে ছিল বরাবরই।

---

[৩০৭] আল-গিয়াসি, পৃ. ২২১-২২২। এখানে আল জুয়াইনী যা বর্ণনা করেছেন তা বর্তমানের মুসলিমদের মধ্যে মানবরচিত বিধানের ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কেননা এগুলো পশ্চিমের কাফের খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের আইনকানুন ও জীবন-পদ্ধতির প্রতিরূপ। আল জুয়াইনী উল্লেখ করেছেন, যে কিসরার আইনকানুনকে মানদণ্ড ও দ্বীনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে সে কাফের, সে ইসলামের সীমা বর্জন করেছে।

Scanned by CamScanner

গ) আশ-শাতিবি তার বিখ্যাত আল-ইতিসাম গ্রন্থে বিদআহর অনুসারীদের ব্যাপারে আলোচনায় শরীয়াহ পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ আলোচনার সাথে যুক্ত করেছেন শরীয়াহর বিশুদ্ধতা ও নিখুঁত হবার বিষয়টি। কারণ বিদআতিরা কার্যত দাবি করে শরীয়াহ পরিপূর্ণ নয়। আশ-শাতিবির বইটি যেহেতু সুপরিচিত, তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই; শুধু নাম উল্লেখই যথেষ্ট।

Scanned by CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রান্ত যুক্তিতর্ক ও তার জবাব

এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় নিয়ে উত্থাপিত নানা মনগড়া ও ভ্রান্ত যুক্তিতর্কের জবাব নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-শাসন করা, আল্লাহর আইনের বদলে মানবরচিত আইনকে স্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক বিচারের মানদণ্ড নির্ধারণ করা কুফর আকবার। আগের অধ্যায়গুলোর আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে যারা অস্বীকার করে এবং ইসলামী শরীয়াহ ব্যতীত অন্য বিধানে বিচার-ফায়সালা করাকে বৈধ মনে করে, তাদের কুফরের ব্যাপারে তেমন কোনো মতপার্থক্য নেই।

কিন্তু আল্লাহর আইন এবং তা দিয়ে শাসনের আবশ্যকতা স্বীকার করেও যারা আল্লাহর শরীয়াহর বিপরীতে আইন প্রণয়ন করে এবং মানবরচিত আইনে শাসন করে, এমন লোকদের কাজকে অনেকে কুফর আকবার বলতে চান না। ভিন্নমত পোষণকারীরা এ অবস্থানের পক্ষে বিভিন্ন ভ্রান্ত যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাদের বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি যুক্তি :

১। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়িদাহর ৪৪ নং আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এটি কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর)'।

২। যেসব আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানে বিচারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো শুধু আহলে কিতাবের জন্য প্রযোজ্য।

৩। মানবরচিত আইনে বিচার করা 'কার্যগত কুফর' (আল-কুফর আল-আমালী)। আর কার্যগত কুফরের কারণে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। ঈমান ভঙ্গ হয় কেবল বিশ্বাসগত কুফরের (আল-কুফর আল-ইতিকাদী) কারণে।

৪। কেবল ওই ব্যক্তিই কাফির, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধানে বিচার করাকে বৈধ মনে করে অথবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে প্রত্যাখ্যান

Scanned by CamScanner

করে। অন্যরা না।

৫। বিদআতিদের প্রতি সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিছু বিদআহ ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করে আবার এমন অনেক বিদআহ আছে যা ব্যক্তিকে কাফির বানায় না। যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধানে শাসন-বিচার করে তার অবস্থা বিদআতিদের মতো।

৬। আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে বিচার-শাসনকে কুফর বলা যায় না, এটি আলিমগণের ইজমা।

৭। আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়ন এবং মানবরচিত আইনের শাসনকে কুফর আকবার বলার অর্থ হলো সব ক্ষেত্রে, এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও পাইকারিভাবে কুফরের হুকুম প্রয়োগ করা।

আলোচ্য বিষয়ে উত্থাপিত ভ্রান্ত যুক্তি-তর্কের মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রান্তি যুক্তিগুলোর খণ্ডন এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরার জন্য, আমরা এগুলো নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাব।

প্রথম ভ্রান্ত যুক্তি

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তি, 'এটা ছোট কুফর'।

ইতোমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক আলোচনা আমরা সেখানে এনেছি। যারা ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এই উক্তিকে তাদের অবস্থানের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তাদের খণ্ডনের জন্য ওই আলোচনা যথেষ্ট। আসলে তারা ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অন্যান্য বক্তব্যের প্রতি এবং অন্যান্য সাহাবিদের উক্তির প্রতি লক্ষ করে না।[৩০৮]

দ্বিতীয় ভ্রান্ত যুক্তি

সূরা মায়িদাহর আয়াতগুলো শুধু আহলুল কিতাবের জন্য প্রযোজ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে এ ভ্রান্ত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে সূরা মায়িদাহর আয়াতসমূহের শানে নুযুল এবং আয়াতগুলোর ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মন্তব্য।

সালাফদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সূরা মায়িদাহর এই আয়াতগুলোকে কেবল আহলুল কিতাবের জন্য প্রযোজ্য মনে করতেন; এ কথা সত্য। তাদের মতামতগুলো তৃতীয়

---

[৩০৮] তৃতীয় অধ্যায়, ১৫১-১৬৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।

Scanned by CamScanner

অধ্যায়ে আমরা উল্লেখও করেছি। পাশাপাশি আমরা আরও দেখেছি যে এই আয়াতগুলো ছাড়া এমন আরও অনেক আয়াত আছে যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা এসেছে। সেই আয়াতগুলো যে আমভাবে (ব্যাপকভাবে) কাফির ও মুসলিম সবার জন্য প্রযোজ্য, এ নিয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। বইয়ের শুরুতে সংশ্লিষ্ট অনেক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় ভ্রান্ত যুক্তি

মানবরচিত আইনে বিচার করা 'কার্যগত কুফর', এই ধরনের কুফরের কারণে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

এ অবস্থান গ্রহণকারীরা বলে থাকেন, আল্লাহর আইন দ্বারা শাসনকে আবশ্যক হিসেবে স্বীকার করার পর কেউ যদি মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে, তাহলে সেটা 'আমলী কুফর' বা কার্যগত কুফর। অর্থাৎ সে কাজের মাধ্যমে কুফর করেছে। কিন্তু তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুফর নেই, কারণ আল্লাহর আইনে বিচার-শাসন করা বাধ্যতামূলক এটা সে স্বীকার করছে। কার্যগত কুফর মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

কুফর দুই প্রকার, 'বিশ্বাসগত কুফর', যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং 'কার্যগত কুফর' যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে না—এই হলো এই ভ্রান্ত যুক্তির মূল ভিত্তি। এ যুক্তি খণ্ডনের জন্য এই ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট হবে।

কুফরের শ্রেণিবিভাগ

মূল আলোচনাতে যাবার আগে 'কার্যগত কুফর' ও 'বিশ্বাসগত কুফর' (কুফর আমালী ও কুফর ইতিকাদী) সংক্রান্ত এ পরিভাষাগুলোর উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি।

আমরা জানি, কুরআন-সুন্নাহতে যেসব বিষয়কে কুফর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু এমন আছে যা ব্যক্তিকে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেয়। আবার কিছু আছে যা ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করে না। সালাফুস সালিহিন এবং ইমামগণ এ দু-ধরনের কুফরের মধ্যে পার্থক্য করতেন। অন্যদিকে এ দু-ধরনের কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে না খারিজি এবং ওয়ায়িদিয়্যাহরা। এ বিষয়ে খারিজিদের অবস্থানের খণ্ডনও সালাফগণ করেছেন।

সালাফুস সালিহিন এবং ইমামগণ কুফরকে বিভক্ত করেছেন দুই ভাগে। এক ধরনের কুফর মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আরেক ধরনের কুফর ইসলাম থেকে বের করে না—এটুকুতে তাঁরা সবাই একমত। কিন্তু বিষয়টির ব্যাখ্যায় তাঁরা যেসব শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন সেখানে কিছুটা পার্থক্য আছে :

Scanned by CamScanner

◆ সালাফগণের অনেকে এক প্রকারের কুফরকে বলেছেন কুফর আকবার (বড় কুফর), অপর প্রকারকে বলেছেন কুফর আসগার (ছোট কুফর)।

◆ অনেকে শুধু এই বলে পার্থক্য করেছেন যে, এক ধরনের কুফর মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আরেক ধরনের কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

◆ যে ধরনের কুফর মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, সেটাকে অনেকে আবার 'কুফর দুনা কুফর' বলেছেন।

◆ অনেকে এক প্রকার কুফরকে বলেছেন 'বিশ্বাসগত কুফর' (আল-কুফর আল ইতিকাদী; আদর্শগত কুফর), অন্য প্রকারকে বলেছেন 'কার্যগত কুফর' (কুফর আল-আমালী; কার্যগত বা ব্যবহারিক কুফর)।

'ব্যবহারিক' শব্দের মাধ্যমে তারা আমলকে বুঝিয়েছেন। যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, পিতা-মাতাকে সম্মান করার মতো ইত্যাদি আমল বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে যিনা, চুরি, মদ্যপান, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা ইত্যাদি আমল বা কাজ হারাম। এইসব ক্ষেত্রে অবাধ্যতাকে তারা 'কার্যগত কুফর' শিরোনামের অধীনে এনেছেন। এইসব ক্ষেত্রে অবাধ্যতা (যেমন : পিতামাতাকে সম্মান না করা অথবা মদ পান করা) মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, যতক্ষণ না সে এগুলোকে বৈধ মনে করে।

বড় ও ছোট কুফরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সালাফগণ যেসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেগুলো সমার্থবোধক। এগুলোর মাধ্যমে মূলত একই বিষয় বুঝিয়েছেন তারা সবাই। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না। তাদের মতপার্থক্য ছিল খারিজি ও মুরজিয়াদের সাথে। কিন্তু পরবর্তী যুগে এমন কিছু মানুষের উদ্ভব ঘটল যারা কিছু বিষয়ে মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রভাব ছিল ব্যাপক, অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রভাব ছিল কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ। সালাফদের কারও কারও ব্যবহৃত 'আল-কুফর আল-ইতিকাদী' (বিশ্বাসগত কুফর) ও 'আল-কুফর আল-আমালী' (কার্যগত কুফর) এর মতো পরিভাষাগুলোকে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করল এবং এর ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করল। এভাবেই একটি ভ্রান্ত যুক্তির উদ্ভব হলো, হারামে লিপ্ত ব্যক্তি যদি ওই কাজকে হালাল মনে করে, তাহলেই শুধু তাকে কাফির বলা যাবে। এ ছাড়া আর কাউকে কোনো আমলের কারণে কাফির বলা যাবে না।

তারপর এই ভ্রান্ত যুক্তি তারা প্রয়োগ করতে শুরু করল সব ধরনের কুফরের ওপর। এটা পরিণত হলো তাদের অভ্যাসে। আকীদাহগত আলোচনা কিংবা খারিজিদের

Scanned by CamScanner

প্রত্যাখ্যান করা, সব ক্ষেত্রে তারা বলতে শুরু করল:

'এটি আমলী (কার্যগত) কুফর, আর আমলী কুফরের কারণে কেউ কাফির হয় না।'

যেমন তারা বলে, কেউ যদি হারাম হিসেবে মেনে নিয়ে মানবরচিত আইনে বিচারশাসন করে, তাহলে সেটা আমলী কুফর। কারণ সে তো মানবরচিত আইনে বিচার করাকে বৈধ মনে করছে না। আর আমলী কুফরের কারণে কেউ কাফির হয় না।

এভাবে গভীর কোনো আলোচনা ছাড়াই কেবল নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করে, তারা নিজেদের মতো করে উপসংহার টেনে দেয়। কারণ তাদের ভাষ্যমতে, এই উপসংহার এসেছে সালাফদের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে।

যেমনটা আগেই বলেছি, সালাফদের ব্যবহৃত পরিভাষায় কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তৈরি হয় এগুলো ভুল বুঝে আকীদাহগত বিষয়ে যখন কেউ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন আলোচ্য ইস্যুতে অনেকের ভুল হয়েছে।

আমরা এখন এ যুক্তির খণ্ডন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশয় নিরসন করব। বিষয়টি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

১। যেসব উলামা 'কার্যগত কুফর ও বিশ্বাসগত কুফর' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তাঁরা শব্দগুলোর সঠিক অর্থ ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যাতে সম্ভাব্য সংশয় নিরসন হয়ে যায়। পাশাপাশি তারা উপযুক্ত মন্তব্য যুক্ত করেছেন যাতে বিষয়টির সত্য ও বাস্তবতা স্পষ্ট থাকে।

'কিতাবুস সালাত' গ্রন্থে ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"'কার্যগত ঈমান' (আল-ঈমান আল-আমালী) এর বিপরীত হলো 'কার্যগত কুফর' (আল-কুফর আল-আমালী) এবং 'বিশ্বাসগত ঈমান' (আল-ঈমান আল-ইতিকাদী) এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় হলো 'বিশ্বাসগত কুফর'। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীসে বিষয়টি এভাবে এসেছে,

'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর।'

গালি দেয়া ও যুদ্ধ করার মধ্যে তিনি ﷺ পার্থক্য করেছেন। প্রথম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক বলেছেন, অপর কাজকে কুফর বলেছেন। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় কাজকে তিনি 'কার্যগত কুফর' বুঝিয়েছেন, 'বিশ্বাসগত কুফর' বোঝাননি। আর এ ধরনের কুফর কাউকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। ঠিক যেমন যিনাকারী, চোর বা মদ পানকারী ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে হয় না; যদিও মুমিনের বৈশিষ্ট্যগুলো

Scanned by CamScanner

তাদের ওপর প্রযোজ্য হয় না।"[৩০৯]

ইবনুল কায়্যিম এখানে যা বলেছেন, তা-ই সঠিক এবং সালাফ ও ইমামদের মতের সাথে সংগতিপূর্ণ। উদাহরণসহ তিনি উল্লিখিত পরিভাষার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ইবনুল কায়্যিম বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিভাষা সংশয় সৃষ্টি করতে পারে, তাই আরও কিছু মন্তব্য যুক্ত করে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরি কথা উচ্চারণের মাধ্যমে কাফির হয়ে যেতে পারে, আর কুফুরি কথা কুফরের একটি শাখা। ঠিক একইভাবে একজন ব্যক্তি ওইসব কুফরি আমল করার মাধ্যমেও কাফির হয়ে যেতে পারে, যে আমলগুলো কুফরের শাখা। যেমন: মূর্তির প্রতি সিজদাহ করা অথবা মুসহাফের (কুরআন) অবমাননা।"[৩১০]

মূর্তির প্রতি সিজদাহ এবং মুসহাফের অবমাননার উদাহরণ থেকে ভ্রান্ত যুক্তির অনুসারীদের নীতির অসারতা ধরা পড়ে। তারা সব ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বলে, আমলী কুফরের কারণে কেউ কাফির হয় না। অথচ এ দুটো কাজ স্বতন্ত্রভাবে কুফর। আর এই দুটি আমল যে ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয়, এ নিয়ে আলিমদের ইজমা আছে।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে ইবনুল কায়্যিম বলেছেন,

"আমলী কুফরকে (দুই ভাগে) বিভক্ত করা যেতে পারে। যা পুরোপুরি ঈমানের বিপরীত, আর যা পুরোপুরিভাবে ঈমানের বিপরীত নয়। মূর্তির প্রতি সিজদা, মুসহাফ অবমাননা করা, নবী-রাসূলদের প্রতি কটাক্ষ-বিদ্রূপ করা কিংবা তাদেরকে হত্যা করা সরাসরি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।"[৩১১]

অর্থাৎ, এই কাজগুলো স্বতন্ত্রভাবেই কুফর আকবার। নিছক আমল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়। সুতরাং, যারা কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই আমলী কুফরকে সব ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 'ছোট কুফর'-এর অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, ইবনুল কায়্যিমের দেয়া উদাহরণের মাধ্যমে তাদের যুক্তির ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

যদি কেউ ছোট কুফর বলতে কেবলই 'কার্যগত কুফর' বলতে চায়, তাহলে তার উচিত সেসব উদাহরণ পেশ করা যেগুলো সালাফদের ঐকমত্য অনুসারে 'ছোট কুফর' বলে স্বীকৃত। যেমন: মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কারও বংশ নিয়ে গালমন্দ করা, মৃতদের জন্য বিলাপ করা, যিনা করা, চুরি করা ইত্যাদি। এই ধরনের কাজের কারণে কেউ কাফির হয় না, এটি স্বীকৃত।

---

[৩০৯] কিতাবুস সালাত, পৃ. ৪০৭।

[৩১০] কিতাবুস সালাত, পৃ. ৪০৫।

[৩১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬।

Scanned by CamScanner

প্রকৃতপক্ষে 'আমলী কুফরের' এই শ্রেণিবিভাগটি ওই সুপরিচিত বাক্যের মতো যা খারিজিদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য বলা হয়, 'আমরা গুনাহর কারণে কাউকে কাফির আখ্যা দিই না' অথবা 'আমরা কবীরা গুনাহর কারণে কাউকে কাফির আখ্যা দিই না' ইত্যাদি।

এই বক্তব্য থেকে অনেকে ধরে নেন, সালাফগণ কোনো গুনাহর কারণেই বা কোনো কবীরা গুনাহর কারণেই কাউকে কখনো কাফির সাব্যস্ত করতেন না। অথচ শিরকও কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর সাথে শিরক করা যে ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, এ নিয়ে কারও কোনো মতপার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরককে গুনাহ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? তিনি বললেন,

> "আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করানো।"

অন্য হাদীসে তিনি এটিকে কবীরা গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন,

> "আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবিরা বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা...।"

'আমরা গুনাহর কারণে কাউকে কাফির আখ্যা দিই না', এই ধরনের উক্তিগুলো সালাফগণ সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন খারিজিদের বক্তব্য খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে। কেননা খারিজিরা ঢালাওভাবে যেকোনো গুনাহ বা কবীরা গুনাহর কারণে মুসলিমদের কাফির সাব্যস্ত করত।

ওপরের আলোচনার আলোকে বোঝা যায় 'কার্যগত কুফর' পরিভাষাটি অনেক ক্ষেত্রে সংশয় তৈরি করতে পারে। কিন্তু সালাফগণের ব্যবহৃত অন্যান্য পরিভাষায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যেমন : ছোট কুফর (কুফরে আসগার), কুফর দুনা কুফর, যে কুফরের কারণে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয় না ইত্যাদি। সুতরাং, 'কার্যগত কুফর' এর পরিবর্তে অন্যান্য পরিভাষাগুলো ব্যবহার করাই উত্তম।

২। দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়া—একটি বাহ্যিক কাজ যা ঈমানের পূর্বশর্ত। সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে কালেমা উচ্চারণ করে না, সে কাফির। তবে মুরজিয়াদের বক্তব্য এর বিপরীত। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> "...দুই কালেমার সাক্ষ্য সম্পর্কে : যদি কোনো ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কালেমা উচ্চারণ না করে, তবে সে কাফির। এ বিষয়ে মুসলিমদের ঐকমত্য আছে। সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই কাফির; এটাই উম্মাহর সালাফুস সালিহিন এবং অধিকাংশ আলিমের মত। মুরজিয়াদের একটি দল; জাহমিয়্যাহ, অর্থাৎ জাহম

Scanned by CamScanner

আস-সালিহি ও তাঁর অনুসারীরা বলে : (এমন) কোনো ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস থাকলে, সে বাহ্যিকভাবে কাফির হলেও অভ্যন্তরীণভাবে কাফির না। ইতিপূর্বে আমরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উৎস চিহ্নিত করেছি। এটি ইসলামে অনুপ্রবেশকৃত একটি বিদআতি বিশ্বাস। এটি ইমামদের, শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফকীহদের কারও আকীদাহ ছিল না।

আমরা আগেই বলেছি, অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সত্যায়ন করতে হবে বাহ্যিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। বরং তার চেয়েও বেশি। কেননা বাহ্যিক সত্যায়ন ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ঈমান, বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকা অসম্ভব।”[৩১২]

কেউ কি এখন বলবে, কালেমার সাক্ষ্যদান যেহতু একটি বাহ্যিক কাজ, কাজেই এটি উচ্চারণ না করলেও কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, কারণ এটা ‘কার্যগত কুফর’? নিঃসন্দেহে এমন ধারণা আলিমদের ইজমার বিপরীত।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখে কালিমা উচ্চারণ না করার মতো বাহ্যিক কাজ কুফর আকবার হতে পারে। আবার আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, যে আল্লাহ, রাসূল অথবা মুসহাফের অবমাননা করে, সে একজন কাফির। এগুলোর কুফর হওয়া নিয়ে আলিমদের ইজমা আছে। অথচ এগুলো সবই কার্যগত কুফর। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কার্যগত কুফরের কারণে কাফিরে পরিণত হয় না এটি একটি ভুল ধারণা।

পরবর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা করতে যাচ্ছি তা ওপরের দুটি পয়েন্টের পরিপূরক।

চতুর্থ ভ্রান্ত যুক্তি

কেবল ওই ব্যক্তিই কাফির, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধানে বিচার করাকে বৈধ মনে করে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই অবস্থানকে অনেকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। তারা বলে, কুফরি কাজ করলেও ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি কাফির হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে।

দলিল হিসেবে ইমাম আত-তহাবীর ওই উক্তি উল্লেখ করেন যা নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই আমরা আলোচনা করলাম। ইমাম তহাবী তাঁর পূর্ববর্তী ইমামগণ হতে উল্লেখ করেছেন,

> “গুনাহর কারণে কোনো আহলে কিবলাকে (মুসলিমকে) আমরা কাফির সাব্যস্ত করি না, যতক্ষণ না সে সেটাকে হালাল মনে করে।”

এর ওপর ভিত্তিত করে তারা বলে,

---

[৩১২] আল-ঈমানুল আওসাত, পৃ. ১৫১।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বদলে মানবরচিত আইনে বিচার ও শাসন করা ব্যক্তির জন্যেও এ কথা প্রযোজ্য। কাজেই মানবরচিত আইনের শাসনকে সে যদি হালাল মনে না করে, তাহলে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা যায় না।

এটি হলো তাদের অবস্থান।

একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভ্রান্ত যুক্তির জবাব দেয়া যায়। যেমন :

১। বক্তব্যটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না: *'...গুনাহর কারণে কাফির সাব্যস্ত করি না'*, কথাটি উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ফকীহগণ ঢালাওভাবে বলেননি। পরবর্তীদের কেউ কেউ এ কথার অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারী তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, *'গুনাহ হলো জাহিলিয়াতের কাজ এবং শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহগার কাফির নয়'*।[৩১৩]

ইমাম বুখারী এখানে চিহ্নিত করে দিয়েছেন শিরক একটি স্বতন্ত্র কুফর, যদিও এটা এক প্রকারের গুনাহ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউ গুনাহকে বৈধ মনে করল কি না ইমাম বুখারী তা উল্লেখ করেননি। তার মানে কি গুনাহকে যারা বৈধ মনে করে তাদেরকে তিনি কাফির গণ্য করতেন না?

আসলে অন্যান্য ইমামদের মতো ইমাম বুখারীও এখানে সাধারণভাবে কথা বলেছেন। কাউকে কাফির সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত শিরোনামকেই তিনি একমাত্র নীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং এখানে তিনি খারিজিদের খণ্ডন করতে চেয়েছেন, যারা ঢালাওভাবে সকল গুনাহগারকে কাফির সাব্যস্ত করে।

শারহুস সুন্নাহতে বারবাহারী বলেছেন,

> "একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয় না যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাবের এক বা একাধিক আয়াত প্রত্যাখ্যান করে, অথবা রাসূলুল্লাহর কোনো হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, অথবা আল্লাহ বাদে অন্য কারও কাছে দুআ করে বা কিছু উৎসর্গ করে। যদি সে এগুলোর কোনোটি করে, তবে অবশ্যই তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মনে করতে হবে। কিন্তু এগুলো না করলে সে একজন মুমিন...।"[৩১৪]

আল-বারবাহারী এখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করা এবং উৎসর্গ করার কথা বলেছেন। এগুলো গুনাহ এবং বাহ্যিক কাজ বা আমল। কিন্তু দেখুন এগুলোর কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো, বারবাহারী এখানে অল্প কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। সম্ভাব্য সব কুফরের তালিকা তিনি করেননি।

---

[৩১৩] সহিহুল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায় ২২।

[৩১৪] শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩১। ড. মুহাম্মাদ সাঈদ আল-কাহতানী সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

মতো গুনাহকে বোঝানো হয়। কিন্তু এসব মৌলিক বিষয়কে যারা অবহেলা করে, তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা হবে কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ সুপরিচিত।”[৩১৭]

‘*এসব মৌলিক বিষয়*’ বলে তিনি ইসলামের রুকন সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জকে বুঝিয়েছেন।

নিজেদের ভ্রান্ত যুক্তির সমর্থনে যারা, ‘গুনাহর কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করার বৈধ না’ উক্তি ব্যবহার করে, তাদের খণ্ডন করে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

“এটি সত্য, কিন্তু আমরা এখানে এই বিষয়ে আলাপ করছি না। খারিজিরা সেসব মানুষকে কাফির বলত যারা যিনা, চুরি কিংবা রক্তপাত করে। কোনো মুসলিম কোনো কবীরা গুনাহ করলেই খারিজিরা তাকে কাফির বলত। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হলো, কেবল শিরকের মাধ্যমেই একজন মুসলিম কাফির হতে পারে। পথভ্রষ্ট নেতা ও তাদের অনুসারীদের শিরক ব্যতীত অন্য কিছুর কারণে আমরা কাফির হিসেবে প্রত্যাখ্যান করিনি। যদি মনে করে থাকো, সালাত আদায়কারী ও নিজেকে মুসলিম দাবিকারীকে কখনোই কাফির সাব্যস্ত করা যায় না, তাহলে তুমি সবচেয়ে মূর্খ ব্যক্তিদের অন্যতম...।”[৩১৮]

এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করে তিনি আরও বলেছেন,

“তুমি কি দেখো না, রাসূল ﷺ -এর সাহাবিরা যখন যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তখন তারা তাওবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু বকর বললেন, ‘ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের তাওবাহ কবুল করব না যতক্ষণ না তোমরা সাক্ষ্য দেবে, আমাদের নিহতরা জান্নাতি আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী।’ তুমি কি মনে করো, আবু বকর ও তার সাথিরা যা বুঝতে পারেননি, তুমি এবং তোমার পূর্বপুরুষরা তা বুঝে ফেলেছ? আফসোস, হে মহামূর্খ, যদি তুমি তা-ই মনে করো!”[৩১৯]

তিনি শিরক এবং যাকাত প্রদান না করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ‘আমরা গুনাহর কারণে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করি না’, সালাফদের এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ‘নাওয়াক্বিদুল ইসলাম’ নামক সুপরিচিত প্রবন্ধের রচয়িতা, যেখানে হারামকে হালাল মনে করা সহ অন্যান্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : জাদুবিদ্যা বা কালোজাদু এবং আল্লাহর নাযিলকৃত

---

[৩১৭] প্রাগুক্ত, ৭/৩০২।

[৩১৮] মুআল্লাফাতু মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব, আর-রাসাইল আশ-শাখসিয়্যাহ, পৃ. ২৩৩।

[৩১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

Scanned by CamScanner

মতো গুনাহকে বোঝানো হয়। কিন্তু এসব মৌলিক বিষয়কে যারা অবহেলা করে, তাদেরকে কাফির ঘোষণা করা হবে কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ সুপরিচিত।"[৩১৭]

'এসব মৌলিক বিষয়' বলে তিনি ইসলামের রুকন সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জকে বুঝিয়েছেন।

নিজেদের ভ্রান্ত যুক্তির সমর্থনে যারা, 'গুনাহর কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করার বৈধ না' উক্তি ব্যবহার করে, তাদের খণ্ডন করে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> "এটি সত্য, কিন্তু আমরা এখানে এই বিষয়ে আলাপ করছি না। খারিজিরা সেসব মানুষকে কাফির বলত যারা যিনা, চুরি কিংবা রক্তপাত করে। কোনো মুসলিম কোনো কবীরা গুনাহ করলেই খারিজিরা তাকে কাফির বলত। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হলো, কেবল শিরকের মাধ্যমেই একজন মুসলিম কাফির হতে পারে। পথভ্রষ্ট নেতা ও তাদের অনুসারীদের শিরক ব্যতীত অন্য কিছুর কারণে আমরা কাফির হিসেবে প্রত্যাখ্যান করিনি। যদি মনে করে থাকো, সালাত আদায়কারী ও নিজেকে মুসলিম দাবিকারীকে কখনোই কাফির সাব্যস্ত করা যায় না, তাহলে তুমি সবচেয়ে মূর্খ ব্যক্তিদের অন্যতম...।"[৩১৮]

এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করে তিনি আরও বলেছেন,

> "তুমি কি দেখো না, রাসূল ﷺ -এর সাহাবিরা যখন যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তখন তারা তাওবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু বকর বললেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের তাওবাহ কবুল করব না যতক্ষণ না তোমরা সাক্ষ্য দেবে, আমাদের নিহতরা জান্নাতি আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী।' তুমি কি মনে করো, আবু বকর ও তার সাথিরা যা বুঝতে পারেননি, তুমি এবং তোমার পূর্বপুরুষরা তা বুঝে ফেলেছ? আফসোস, হে মহামূর্খ, যদি তুমি তা-ই মনে করো!"[৩১৯]

তিনি শিরক এবং যাকাত প্রদান না করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং 'আমরা গুনাহর কারণে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করি না', সালাফদের এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব 'নাওয়াক্বিদুল ইসলাম' নামক সুপরিচিত প্রবন্ধের রচয়িতা, যেখানে হারামকে হালাল মনে করা সহ অন্যান্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : জাদুবিদ্যা বা কালোজাদু এবং আল্লাহর নাযিলকৃত

---

[৩১৭] প্রাগুক্ত, ৭/৩০২।

[৩১৮] মুআল্লাফাতু মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব, আর-রাসাইল আশ-শাখসিয়্যাহ, পৃ. ২৩৩।

[৩১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

Scanned by CamScanner

বিধান বাদে অন্য বিধানে শাসন করা।

দাউদ ইবনু জারজিস আল ইরাকীর বক্তব্য খণ্ডন করে শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনু আব্দির রহমান ইবনু হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> শাইখ আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিমের ব্যাপারে সে (দাউদ ইবনু জারজিস) বলে, আহলে কিবলার কোনো অনুসারীকে তাঁরা কাফির সাব্যস্ত করতেন না।
>
> এর জবাব: সে যদি জানত এ ক্ষেত্রে আহলে কিবলা বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং কী বোঝানো হয়েছে, তাহলে সে এই কথা বলত না। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে ডাকে, অন্যের প্রতি দুআ করে তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করার বিপক্ষে দলিল হিসেবেও এটাকে উপস্থাপন করত না।
>
> যারা আলিমদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মনে করে সালাত আদায় করা ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা কোনো লোক শিরক করলেও তাকে আহলে কিবলার অনুসারী (মুসলিম) গণ্য করতে হবে—সে আসলে নিজের অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করছে। এসব দাবির মাধ্যমে সে নিজের মূর্খতা, দ্বীনবিমুখতা প্রকাশ করে। ইমাম আহমাদ ওই ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে বলে, 'আমরা কোনো গুনাহগারকে কাফির বলি না'[৩২০] অথচ এই ব্যক্তি ইমাম আহমাদের মাযহাব অনুসরণের দাবি করে। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য খারিজিদের আকীদাহ প্রত্যাখ্যান করা। তারা নিছক গুনাহর কারণে মানুষকে কাফির সাব্যস্ত করত।
>
> সুতরাং, যারা শিরক করে এবং অলি-আউলিয়াদের কাছে দুআ করে, তাদের ব্যাপারে উক্ত বক্তব্য প্রয়োগ ভুল, অপ্রাসঙ্গিক এবং বিকৃত উপস্থাপন। এভাবে সে (দাউদ ইবনু জারজিস) সন্দেহগ্রস্ত হয়েছে। ওই বাক্যাংশের মাধ্যমে সালাফরা কী বুঝিয়েছেন সে বোঝেনি। তার ভুল ব্যাখ্যা খণ্ডনের জন্য আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ ও আলিমদের ইজমাই যথেষ্ট। বিভিন্ন মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকীহগণ এই ইস্যুতে (রিদ্দা) পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তারা মুরতাদের হুকুম বর্ণনা করেছেন এবং এমন অনেক কাজের তালিকা প্রদান করেছেন যা কাউকে কাফির বানিয়ে দেয়। আমরা এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তা থেকে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর। তারা দৃঢ়ভাবে বলেছেন, কুফরের

---

[৩২০] আমি বলি : যখন শারহুত তাহাবীয়াতে ইবনু আবিল-ইয যে লিখেছেন, অনেক সুন্নি আলেম এই বাক্যের ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন, 'গুনাহের কারণে আমরা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করি না' (তৃতীয় পয়েন্টে আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করব)—সম্ভবত এর মাধ্যমে তিনি ইমাম আহমাদের উক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যা তার সূত্রে শাইখ আব্দুল লতিফ উল্লেখ করেছেন।

Scanned by CamScanner

বিরুদ্ধে সুরক্ষার উপায় হলো নিষ্ঠার সাথে ইসলাম অনুসরণ করা, এর মূলনীতি ও রুকনসমূহ পালন করা; ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কাজে লিপ্ত থেকে শুধু মুখের কথা আর সালাত আদায় করাই যথেষ্ট। মাত্রই পড়াশোনা শুরু করা ছাত্ররাও এটা জানে, আর আলোচ্য বিষয়টি হানবলী ও অন্যান্যদের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও উল্লেখিত আছে। মাদ্রাসার ছোট বাচ্চারা যা জানে, সে (ইবনু জারজিস) তাও জানে না। তার দাবি ভিত্তিহীন ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ।[৩২১]

শাইখ আব্দুল লতিফের কথাগুলো আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর এই বক্তব্য দ্বারা ওইসব লোকের যুক্তি খণ্ডন হয় যারা ইমাম তহাবীর উদ্ধৃতিকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে বলে, হারামকে হালাল মনে না করলে কেউ কাফির হয় না।

৩। *'গুনাহর কারণে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করি না'*, বক্তব্যের উদ্দেশ্য খারিজদের খণ্ডন: ওপরের আলোচনায় ইতোমধ্যে একাধিকবার বিষয়টির আলোচনা এসেছে। ইমামগণের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য খারিজিদের খণ্ডন। কিন্তু এই কথার উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করে ব্যাপকভাবে সব গুনাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ইমামগণ আদৌ এমন ব্যাপক অর্থে কথাটি বলেননি। উক্ত বাক্যাংশ-কেন্দ্রিক সন্দেহ দুইভাবে নিরসন করা যায় :

ক) আত-তহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার ইবনু আবিল-ইয বলেছেন, আহলুস সুন্নাহর অনেক ওলামায়ে কেরাম এই বাক্যাংশটিকে 'আমভাবে' (ব্যাপকভাবে) প্রয়োগ করা বন্ধ করে দেন। এ ক্ষেত্রে এটা বলাই সঠিক যে, 'আমরা সকল (প্রত্যেক) গুনাহর কারণে মানুষকে কাফির সাব্যস্ত করি না।'[৩২২] এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য খারিজিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করা। তারা যেকোনো গুনাহর জন্যই মানুষকে কাফির সাব্যস্ত করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ প্রত্যেক গুনাহর জন্য মানুষকে কাফির সাব্যস্ত করেন না। শুধু ওইসব গুনাহর কারণে কাফির সাব্যস্ত করেন যেগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল আছে, এগুলো করলে কেউ কাফির হয়ে যায়।

খ) এ বক্তব্য 'গুনাহ' বলতে সেসব অবাধ্যতাকে বোঝানো হয়েছে যেগুলো করলে ব্যক্তি কাফির হয় না। যেমন : যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, অন্যায় হত্যাকাণ্ড, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মানুষের বংশ নিয়ে কটু মন্তব্য করা, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ইত্যাদি। হালাল মনে না করলে, নিছক এসব গুনাহ করার কারণে কেউ কাফির হয় না। অন্যদিকে যেসব গুনাহ মানুষকে কাফির বানায় সেসবের মধ্যে আছে আল্লাহকে গালি দেয়া, মূর্তিপূজা, মুসহাফ অবমাননা ইত্যাদি। এগুলো

---

[৩২১] আদ-দুরারুর সানিয়্যাহ (আর-রুশদ), ভলিউম ৯, পৃ. ২৯০-২৯১, ১ম মুদ্রণ।
[৩২২] শারহুত তাহাবিয়াহ, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪, আত-তুর্কি ও শুয়াইব আল-আরনাউত সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। সে এগুলোকে হালাল মনে করল কি না, তা মোটেও বিবেচ্য না।

এই পয়েন্ট দুটি বিবেচনা করলে আত-তহাবীর বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়।

৪। প্রত্যাখ্যান ছাড়া কুফর হয় না, এটি মুরজিয়াদের অবস্থান: '(আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যান না করলে কেউ কাফির হয় না' এটি মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ ঈমানকে তারা শুধু অন্তরের বিশ্বাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। আর কুফরকেও ঈমানের বিপরীত অর্থাৎ কেবল অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছে।

সব রকমের মুরজিয়াদের বিরোধিতায় সালাফগণ ব্যাপারে একমত ছিলেন, হোক তারা 'জাহমিয়্যাহ', কালাম শাস্ত্রবিদ কিংবা মুরজিয়াতুল ফুকাহা। দুঃখের বিষয় হলো, কিছু মানুষ সালাফদের অনুসরণের দাবি করে, কিন্তু ঈমান সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে মুরজিয়াদের মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

> "জাহম (জাহমিয়্যাহ ফিরকার প্রবর্তক) বলত, ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস। যদিও কেউ মুখে ঈমানের সাক্ষ্য না দেয় (তবু অন্তর বিশ্বাস থাকলে তার ঈমান আছে)। উম্মাহর আলিম ও ইমামদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কথা বলেছেন বলে জানা নেই। নিঃসন্দেহে ইমাম আহমাদ, ওয়াকি ও অন্যান্যরা এই মত প্রকাশকারীদের কাফির গণ্য করেছেন। কিন্তু আল-আশআরী ও তার অধিকাংশ অনুসারীরা এই মতকে সমর্থন করেছেন। তবে তারা আরও বলেছেন, 'শরীয়াহ যাকে কাফির সাব্যস্ত করে, আমরাও তাকে কাফির সাব্যস্ত করি। বিষয়টিকে আমরা এভাবে বলি, শরীয়াহ তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছে এটা তার অন্তরে কোনো জ্ঞান না থাকার প্রমাণ।'"[৩২৩]

(আল্লাহর আইন) প্রত্যাখ্যান না করলে কেউ কাফির হয় না—এটি চরমপন্থী মুরজিয়াদের মতামত। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কালাম শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশ এবং মুরজিয়াতুল ফুকাহা একে চূড়ান্ত নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেনি। বরং তারা বলেছেন, '(অস্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোনো কুফরের কারণে) বিধানদাতা (আল্লাহ) যাকে কাফির সাব্যস্ত করে, আমরাও তাকে কাফির গণ্য করি।'

তাদের এ অবস্থান সাধারণভাবে সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এরপর তারা একটি বিদআহ প্রচলন করে বলেছেন,

> 'বিধানদাতা (আল্লাহ) কাউকে কাফির সাব্যস্ত করার অর্থ হলো তার অন্তরে কোনো জ্ঞান নেই।'

---

[৩২৩] মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৩/৪৭।

Scanned by CamScanner

তাদের এই নীতি সাধারণ বিবেক, বুদ্ধি ও শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। তাকফিরের মূলনীতি নিয়ে আমাদের আলোচনা না। তবে সুস্পষ্ট যুক্তিখণ্ডনের জন্য একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছি; যার ওপর ইজমা আছে এবং যার দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ও মুরজিয়াদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ নিরসন হবে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল একটি বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ থাকছি, কেননা যেগুলো ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিমাণের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "যেসব কথার কারণে ঈমান ভেঙে যায়, সেগুলো একটি না একাধিক তা গুরুত্বপূর্ণ না। এমনকি কেউ যদি স্পষ্ট কুফুরিপূর্ণ কথা না বলে, কিন্তু কুরআনের কোনো আয়াত অথবা কোনো ফরয বিধান অস্বীকার করা কিংবা মাত্র একবারের জন্য রাসূলুল্লাহর অবমাননা করা অপমান করা; এ ক্ষেত্রে সে যদি মুখে রাসূলুল্লাহকে অস্বীকার নাও করে, তবুও তার ঈমান ভেঙে যাবে। যেসব কথা উচ্চারণ করলে ঈমান ভেঙে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউ যদি বলে, 'আমি এই চুক্তি নাকচ করলাম', অথবা 'তোমার সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ করলাম', তাহলে এসব কথা বারবার বলার দরকার হয় না, মাত্র একবার বললেই ইসলামের চুক্তি ভেঙে যায়। অনুরূপভাবে, দ্বীনের বিষয়ে মাত্র একবার বিদ্রুপ করলেও ঈমান ভেঙে যাবে; পুনরাবৃত্তির দরকার নেই।"[৩২৪]

এসব বিষয়গুলো সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলো নিয়ে কারও কোনো বিবাদ নেই। যদি কেউ সব নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করে কিন্তু শুধু একজনকে—যেমন নূহ আলাইহিস সালামকে—অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। ওযু ও সালাত ভঙ্গের অনেক কারণ আছে। এগুলোর যেকোনো একটি ঘটলেই ওযু বা সালাত ভেঙে যায়। সব থাকার দরকার হয় না। একইভাবে, যদি কোনো মুসলিম দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয় এবং ইসলামের সকল রুকন পালন করে কিন্তু ঈমান ভঙ্গকারী কোনো একটি কাজ করে—যেমন : যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে—তবে আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সে একজন কাফির।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননা

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননার বিষয়টির আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তাই আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করছি। আলিমগণের ইজমা হলো, যে স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননা করবে সে কাফির। যারা এ ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন,

---

[৩২৪] আস-সারিমুল মাসলুল, ২/১৭৮।

Scanned by CamScanner

১. বিখ্যাত ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"শীর্ষস্থানীয় ইমামদের অন্যতম ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ বলেছেন, 'মুসলিমরা এই ব্যাপারে একমত, যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবমাননা করে বা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করে বা কোনো নবীকে হত্যা করে, তবে সে এসব কাজের কারণে কাফির হয়ে যাবে; যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত সবকিছু বিশ্বাস করে।'"[৩২৫]

২. ইবনুল মুনযির এবং আল-ফারিসি। ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজার বলেছেন,

"ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহকে অপমান করবে তাকে হত্যার ব্যাপারে ইজমা আছে।' শাফিয়ি মাযহাবের ইমামগণের অন্যতম ইমাম আবু বকর আল-ফারিসি তার কিতাবুল ইজমাতে বর্ণনা করেছেন,

'যে ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে অপবাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অপমান করবে, সে কাফির এবং এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা আছে।'"[৩২৬]

৩. মুহাম্মাদ ইবনু সাহনুন বলেছেন,

"যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপমান করবে ও তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, সে কাফির এবং আল্লাহর শাস্তির যোগ্য; আলিমরা এ ব্যাপারে একমত। উম্মাহর মতানুসারে, তাকে হত্যা করতে হবে এবং তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে ও শাস্তিযোগ্য হবার প্রতি যে সন্দেহ করবে, সেও কাফির।"[৩২৭]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননা করবে তার কুফরির হুকুমের ব্যাপারে সবার ঐকমত্য আছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে শুধু কাজটিই বিবেচ্য। যে অবমাননা করছে সে এটাকে বৈধ মনে করে নাকি অবৈধ মনে করে তা বিবেচ্য নয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (যাহিরী-বাতিনী) উভয় ক্ষেত্রেই সে কুফরি করেছে। যদিও মুরজিয়ারা এটা মনে করে না। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"আমরা বলি, আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবমাননা করা যাহিরী-বাতিনী (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) উভয় ক্ষেত্রেই কুফর। অবমাননাকারী এই কাজকে হালাল মনে করে, নাকি হারাম মনে করে, অথবা এ কাজ হালাল-হারাম হবার ব্যাপারে তার কোনো মত আছে কি নেই, ইত্যাদি মোটেও বিবেচ্য নয়। এ ব্যাপারে তার

---

[৩২৫] প্রাগুক্ত, ২/১৫, ৩/৯৫৫। ইসহাকের উক্তি দ্র. আত-তামহীদ, ইবনু আব্দিল বার, ৪/২২৬।

[৩২৬] ফাতহুল বারী, সহিহুল বুখারীর ৬৯২৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা (ফাতহুল বারী, ১২/২৮১, ১ম সালাফিয়া মুদ্রণ)

[৩২৭] আস-সারিমুল মাসলুল, ২/১৫-১৬, ৩/৯৫৬।

Scanned by CamScanner

মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। এটিই ফুকাহায়ে কেরামসহ সকল আহলুস সুন্নাহর রায়, যারা বলেন ঈমান কথা ও কাজের সমষ্টি।[৩২৮] এ ক্ষেত্রে কে কৌতুকবশত এমনকরল, আর কে গাম্ভীর্যসহকারেকরল, তাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই।”[৩২৯]

এখানে অবমাননা করার কাজটিই কুফরে আকবার, সে এটা জায়েজ-নাজায়েজ যা-ই মনে করুক। যারা বলে, যে ব্যক্তি বৈধ মনে করে অবমাননা করবে সে-ই কেবল অবমাননা করার কারণে কাফির হবে, তারা মুরজিয়াদের কথা গ্রহণ করেছে। এদের কড়া সমালোচনা করে ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> “একটি বিষয় লক্ষ করা আবশ্যক। অনেকে বলে থাকে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবমাননাকারী কাফির কারণ সে অবমাননা করাকে হালাল মনে করে। এটি মারাত্মক ভুল এবং গুরুতর ত্রুটি।
>
> কাযি আবুল ইয়ালার ওপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। তার বইগুলোর একাধিক স্থানে তিনি এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা তার এখানকার বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।
>
> তাদের এই বিভ্রান্তিতে পড়ার কারণ হলো, পরবর্তী যুগের মুতাকাল্লিমুনদের কাছ থেকে যা তারা শিখেছেন। পরবর্তী যুগের কালামশাস্ত্রবিদরা জাহমিয়্যাহদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলতেন, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম; যদিও এর সাথে মুখের উচ্চারণ (সাক্ষ্য) না থাকে এবং অন্তর ও দেহের আমল না থাকে...।”[৩৩০]

আলিমদের ইজমা এবং আলোচ্য বিষয়ে তাদের মন্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় বোঝা যায় :

ক) কুফর কেবল প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না।

খ) কথা বা কাজের মাধ্যমেও কুফর হতে পারে।

গ) কেবল কোনো হারামকে হালাল (বা হালালকে হারাম) মনে করার মধ্যে কুফর সীমাবদ্ধ না।

ঘ) এ ধরনের কুফর সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দলিলে যা বর্ণিত হয়েছে তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ (যাহিরী-বাতিনী) উভয়ভাবে কুফর এবং স্বতন্ত্রভাবে কুফর। কোনো ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করল কি না তার ওপর এটা নির্ভরশীল না।

ঙ) যারা এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা মুরজিয়াদের দলভুক্ত। হোক সে চরমপন্থী মুরজিয়া বা অন্যান্য কেউ।

---

[৩২৮] প্রাগুক্ত, ৩৫৫৯/

[৩২৯] প্রাগুক্ত, ৩৭৫৯/।

[৩৩০] আস-সারিমুল মাসলুল, ৩/৯৬০।

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ -এর অবমাননার প্রসঙ্গে মুরজিয়াদের বিভিন্ন মত

রাসূল ﷺ -এর অপমানের প্রসঙ্গে মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য তাদের নানা দলের মত আমরা এখানে তুলে ধরছি। সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এগুলোর সাংঘর্ষিকতাও তুলে ধরা হচ্ছে :

মুরজিয়াদের প্রথম মত: রাসূল ﷺ -এর অপমানকারীকে ততক্ষণ দুনিয়াতে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না, যতক্ষণ না সে সুস্পষ্টভাবে বলবে, সে (এই হুকুম) প্রত্যাখ্যান করে অথবা এ ধরনের অপমান করাকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে।

এটি চরমপন্থী মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি। চরম ইরজাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সালাফগণ এই মত পোষণ করা লোকদের বিদআতি সাব্যস্ত করেছেন। কাউকে শুধু তখনই কাফির বলা যাবে যখন সে ওই বিষয়ের হুকুম (হালাল হারাম, ইত্যাদি) প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে—এটি এই চরমপন্থী মুরজিয়াদের আবিষ্কৃত নতুন শর্ত। অথচ এটি কুরআন-হাদীসের দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক, কেননা কুফরি কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে কুরআন-হাদীসের দলিলে কাফির বলা হয়েছে এবং সেখানে (প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকারের) কোনো শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে মুরজিয়ারা কোনো কিছু অস্বীকার করা বা প্রত্যাখ্যান করাকে তাকফিরের পূর্বশর্ত নির্ধারণ করেছে।

মুরজিয়াদের দ্বিতীয় মত: রাসূল ﷺ -এর অবমাননাকারী বাহ্যিকভাবে (যাহিরী) কাফির। দুনিয়াবী আইনকানুন অনুসারে তাকে কাফির বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তার অন্তরে বিশ্বাস থাকলে, অভ্যন্তরীণভাবে (বাতিনী) সে ঈমানদার হতে পারে।

এরা বলে, শরীয়াহতে যাদেরকে কাফির বলা হয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই বাহ্যিকভাবে কাফির সাব্যস্ত করতে হবে। দুনিয়াতে তাদের ওপর কুফরের বিধানও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এমন ব্যক্তির অন্তরে যদি বিশ্বাস থাকে এবং সে যদি (হুকুম) প্রত্যাখ্যান না করে, তাহলে অভ্যন্তরীণভাবে (বাতিনী) সেও একজন মুমিন হতে পারে।

এটি চরমপন্থী মুরজিয়াদের মধ্যে একটি সুপরিচিত মত। কারণ তারা বলে, ঈমান হলো কেবল তাসদীক; অন্তরে বিশ্বাস। রাসূল ﷺ -এর অবমাননাকারীকে বাতিনী মুমিন বলার পক্ষে তাদের যুক্তি হলো, 'হয়তো-বা সে মুখে এমন কিছু বলেছে যা তার অন্তরে নেই। বাহ্যিক কথা বা আমলের মাধ্যমে (অর্থাৎ অবমাননার মাধ্যম) অন্তরের বিষয় (অর্থাৎ ঈমান) বাতিল হয় না। ঠিক যেভাবে (ইসলামের) বাহ্যিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে মুনাফিকরা মোটেও উপকৃত হয় না, কারণ এগুলো তাদের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।"[৩৩১]

---

[৩৩১] প্রাগুক্ত, ৩/৯৬৬।

Scanned by CamScanner

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই ভ্রান্ত ও মনগড়া যুক্তিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে খণ্ডন করেছেন, যার প্রথমটি এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,

> "এর (মুরজিয়াদের এই কথার) অর্থ হলো, কোনো জোর-জবরদস্তি ছাড়াই যারা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে কথা বলে, অথবা অন্য কোনো ধরনের কুফরি কথা বলে, তারাও ঈমানদার হতে পারে! যে এ কথা বিশ্বাস করে, ইসলামের বন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিল (অর্থাৎ কাফির হয়ে গেল)।"[৩৩২]

জাহমিয়্যাহদের কাছ থেকে আসা আলোচ্য ভ্রান্ত যুক্তিটি খুবই মারাত্মক। পরবর্তী যুগে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জাহমিয়্যাহদের পর আহলুল কালাম (দার্শনিক) কীভাবে এই ভ্রান্ত মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা নিয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

> "সুতরাং এটি সুস্পষ্ট, জাহম ইবনু সাফওয়ান ও তার অনুসারীরা ঈমানের সংজ্ঞায়নে ভুল করেছে। তারা মনে করে, ঈমান শুধু অন্তরে বিশ্বাস ও জানার নাম। অন্তরের আমলকে তারা ঈমানের অংশ মনে করে না। তাদের মতে, একজন ব্যক্তির অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে পারে, আবার একই সাথে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবমাননা করতে পারে। অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর আউলিয়াদের বিরোধিতা করতে পারে, আল্লাহর দুশমনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, নবীদের হত্যা করতে পারে, মাসজিদ ধ্বংস করতে পারে, মুসহাফের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবি করতে পারে, কাফিরদের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে এবং মুমিনদের প্রতি চূড়ান্ত অভক্তি প্রদর্শন করতে পারে!
>
> তারা বলে, এগুলো সবই এমন গুনাহ যার কারণে অন্তরের বিশ্বাস বাতিল হয় না। এগুলো করার পরও একজন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণভাবে এবং আল্লাহর সামনে ঈমানদার হতে পারে।
>
> আবার তারা বলে, নিশ্চয়ই এই দুনিয়াতে এমন ব্যক্তির ওপর কাফিরদের বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে, কারণ এসব কথা[৩৩৩] কুফরের নিদর্শন। এ কারণে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই তার বিচার করা হবে। ঠিক যেমন স্বীকারোক্তি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় দেয়া যায়; যদিও-বা সে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে কিংবা সাক্ষীরা যা সাক্ষ্য দিয়েছে অভ্যন্তরীণ অবস্থা তা থেকে ভিন্ন হতে পারে।
>
> যদি তাদের (এই যুক্তি লালনকারীদের) সামনে কুরআন-সুন্নাহ এবং আলিমদের ইজমার দলিল উপস্থাপন করে প্রমাণ করা হয় যে, এমন লোকেরা তাদের কাজের কারণেই কাফির এবং আখিরাতের শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তখন তারা বলে, এই

---

[৩৩২] প্রাগুক্ত, ৩/৯৭৩।

[৩৩৩] আল-আবিকান সংস্করণ, পৃ. ২১২-তে এসেছে, 'কাজ'।

Scanned by CamScanner

কাজগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের (এসব কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের) অন্তরে বিশ্বাস নেই এবং জ্ঞান নেই।

সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কুফরের অর্থ কেবল একটি; সেটা হলো অজ্ঞতা। একইভাবে তাদের মতে ঈমানও কেবল একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যা হলো জ্ঞান (তাসদীক)। অথবা বলা যায় তাদের কাছে ঈমান ও কুফর হলো অন্তরে বিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করা। অন্তরের বিশ্বাস কি শুধু সত্যকে জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাকি এর বাইরেও কিছু আছে—এটা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করে।

যদিও এটি ঈমান সম্পর্কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বিকৃত উক্তি, তবুও মুরজিয়াদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে কালামশাস্ত্রের অনেক আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। সালাফদের মধ্যে ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবু উবাইদ ও অন্যান্যরা এরূপ মত পোষণকারী ব্যক্তিদের কাফির বলেছেন।

তারা বলেছেন, কুরআনের দলিল অনুসারে ইবলিস একজন কাফির। সে কাফির হয়েছে তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে, এবং আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণে। সে কোনো দলিল বা নস অবিশ্বাসের কারণে কাফির হয়নি। একই কথা প্রযোজ্য ফিরআউন ও তার দলবলের ক্ষেত্রে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

'তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল (অর্থাৎ তারা অন্তরে বিশ্বাস করেছিল যে, এই নির্দর্শনসমূহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মুসা আলাইহিস সালাম সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল)... (সূরা আন-নামল, ২৭:১৪)।"[৩৩৪]

মুরজিয়াদের প্রথম ও দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা সবাই চরমপন্থী মুরজিয়া। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথম মতের অনুসারীরা (কোনো হুকুম) প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার না করলে, কাউকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোনো ক্ষেত্রেই কাফির মনে করে না।

আর দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা বলে, শরীয়াহ যাকে কাফির সাব্যস্ত করে, আমরাও তাকে দুনিয়াতে কাফির সাব্যস্ত করি। তবে হয়তো সে অভ্যন্তরীণভাবে (বাতিনী) একজন ঈমানদার হতে পারে, কাজেই আল্লাহর কাছে সে একজন ঈমানদার।

এই প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সালাফদের কেউ কেউ এই দুই দলকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন, যাদের কয়েকজনের নাম ইবনু তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃতিতে এসেছে।

---

[৩৩৪] আল-ঈমান, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/১৮৮-১৮৯।

Scanned by CamScanner

মুরজিয়াদের তৃতীয় মত: নস (দলিল-প্রমাণ) যাকে কাফির সাব্যস্ত করেছে—যেমন রাসূল ﷺ -এর অবমাননাকারী—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই কাফির। দুনিয়া ও আখিরাতেও সে কাফির। কিন্তু তার কুফর যদি কোনো বাহ্যিক আমলের কারণে ঘটে—যেমন কোনো কথা বা কাজ—তাহলে সে আসলে ওই কাজের কারণে কাফির হয় না। সে কাফির হয় কারণ ওই কাজটি ইঙ্গিত দেয় যে, তার অন্তরে ঈমান অনুপস্থিত। অর্থাৎ কাজটি ইঙ্গিত দেয় যে, তার অন্তরে কুফরি আছে।

এটি কালামি মুরজিয়া; যেমন আশ'আরী এবং অন্যান্যদের অবস্থান।

তারা দুটি অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় করতে চায়। শরীয়াহ এ ধরনের ব্যক্তিদের (যেমন: অবমাননাকারীদের) কাফির সাব্যস্ত করেছে। আবার মুরজিয়ারা মনে করে কুফর কেবল কোনো কিছু অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করার নাম। এই দুই অবস্থানের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে কালামি মুরজিয়ারা বলে, এই কাজটি কুফর আকবার (বড় কুফর), কিন্তু কুফরি ঘটেছে কারণ এটি তার (অবমাননাকারীর) অন্তরে থাকা অবিশ্বাসের একটি চিহ্ন। যারা বলে, অবমাননাকারীর কুফরির কারণ হলো সে এ ধরনের অপমান করাকে বৈধ মনে করে, এটি তাদেরও মতামত।

ইবনু তাইমিয়্যাহ একে মারাত্মক ভ্রান্তি ও চরম ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এটি পরবর্তী যুগের জাহমিয়্যাহদের মতামত যারা পূর্ববর্তী জাহমিয়্যাহদের অনুসরণকারী। আলোচ্য বিষয়ে এবং এই ভ্রান্ত-মনগড়া যুক্তির সমালোচনা করে দেয়া তার বক্তব্য আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

লক্ষ করার বিষয় হলো, এই তৃতীয় দলটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর উপসংহারের সাথে একমত। রাসূল ﷺ -এর অবমাননাকারী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই কাফির, এটা তারা স্বীকার করে। কিন্তু এই কুফরির কারণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছে। আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হলো, স্বতন্ত্রভাবে কুফরি কথা বা কাজের কারণেই এই ধরনের ব্যক্তিরা কাফির।

কিন্তু এরা বলে, এমন ব্যক্তি কাফির, কারণ এই কথা বা কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় তার অন্তরে ঈমান নেই। এই কথা বা কাজ হলো তার অন্তরে ঈমান না থাকার চিহ্ন। আর এটাই তার কাফির হওয়ার কারণ।

তাদের এই অবস্থান সঠিক না। কারণ সব কাফিরই যে অন্তরে অবিশ্বাস করে, তা না। ইবলিস, ফিরআউন, বনী ইসরাঈল, হেরাকল ও অন্যান্যরা অন্তরে বিশ্বাস করেছিল এবং সত্য জানত। কিন্তু তারপরও কাজের মাধ্যমে তারা কাফির হয়ে গেছে। কারণ তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এই ভ্রান্ত অবস্থানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইমামগণ বিতর্ক করেছেন। বিশেষত ইবনু

Scanned by CamScanner

তাইমিয়্যাহ তার দুইটি গ্রন্থ আল-ঈমান ও আস-সারিমুল মাসলুল-এ তাদের খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন,

> "আল্লাহর কালামে আছে বিভিন্ন তথ্য (খবর) ও আদেশ-নিষেধ। এসব খবর বা তথ্যগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটি অন্তরের আমল যার ভিত্তি হলো আদেশ-নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, সেসব আদেশ-নিষেধ পালন না করলেও এগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয়।...
>
> যদি অন্তরে সেসব আদেশ-নিষেধের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা অভক্তি থাকে, তাহলে আত্মসমর্পণ হয় না। ফলে অন্তরে কোনো ঈমান থাকে না। এটিই ছিল ইবলিসের কুফরের ধরন। সে আল্লাহর আদেশ শুনেছে এবং কোনো রাসূলের ওপরেও অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু সে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করেনি, এর প্রতি আত্মসমর্পণ করেনি। বরং অহংকার-ঔদ্ধত্যের সাথে আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে সে হয়েছে কাফির।
>
> পরবর্তী প্রজন্মের কিছু ব্যক্তি এই বিষয়ে সন্দেহগ্রস্ত হয়েছেন। তারা ধরে নিয়েছেন, ঈমান নিছক বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। এরপর তারা ভেবে দেখলেন ইবলিস, ফিরআউন এবং তাদের মতো অন্যান্যরা তো অবিশ্বাসের মাধ্যমে কুফরি করেনি; অথচ তাদের কুফরি ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ফলে তারা সন্দেহগ্রস্ত হলেন। তারা যদি সালাফুস সালিহিনের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতেন, তাহলে জানতেন যে ঈমান হলো কথা ও কাজ উভয়ের সমষ্টি...।"

তারপর ঈমান ও আনুগত্য উভয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> "উভয় শর্তপূরণ ছাড়া কেউ ঈমানদার হতে পারে না। যদি অহংকারের কারণে কেউ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে (অন্তরে) বিশ্বাস করলেও সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা কুফর কেবল কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করা না। কুফর আরও ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়। কুফর হতে পারে প্রত্যাখ্যান ও অজ্ঞতা, আবার কুফর হতে পারে অহংকার ও সীমালঙ্ঘন। এজন্যেই ইবলিসকে কাফির হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং উদ্ধত, অহংকারী বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে অবিশ্বাসী বা প্রত্যাখ্যানকারী বলে বর্ণনা করা হয়নি।
>
> সুতরাং জ্ঞান থাকার পরও, অন্তরে সত্যকে জানা সত্ত্বেও যারা কুফর করেছে; যেমন ইহুদি ও তাদের সমগোত্রীয়দের কুফরকে ইবলিসের কুফরের অনুরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর খ্রিষ্টান ও তাদের সমগোত্রীয়দের কুফরকে বর্ণনা করা হয়েছে পথভ্রষ্টতা বলে, যা হলো অজ্ঞতা।

Scanned by CamScanner

তুমি কে দেখো না, একদল ইহুদি নবী ﷺ-এর কাছে এসে কিছু বিষয়ে জানতে চাইল। সেগুলোর জবাব জানার পর তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি একজন নবী'; কিন্তু তারা তাঁর ﷺ অনুসরণ করেনি।[৩৩৫] একই কথা সত্য হেরাকল ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও। জ্ঞান ও বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে আসেনি...।"

তারপর দুই কালেমার সাক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

"যেহেতু ঈমানের ভিত্তি হতে হবে দুই কালেমার ওপর, তাই অনেকে দুই কালেমাকেই ঈমানের একমাত্র ভিত্তি মনে করতে শুরু করল। আর অন্যান্য অপরিহার্য নীতি ভুলে গেল, আত্মসমর্পণ। দুই কালেমার সাক্ষ্যের অর্থ হলো কেবল কালেমার বার্তাকে গ্রহণ করা। কাজেই, কোনো ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে রাসূল ﷺ -এর ওপর বিশ্বাস করেও তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণ করাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে এই বার্তা শুনে ইবলিস যা অর্জন করেছিল, রাসূল ﷺ -এর ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমে সে কেবল ততটুকুই অর্জন করল।[৩৩৬]

এটি ব্যাখ্যা করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক। ঈমানের অর্থের সাথেও এটি সাংঘর্ষিক, কারণ এটি ঈমানের ফলাফল ও ব্যাখ্যার বিপরীত। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ঈমানের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়।"[৩৩৭]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলে,

ঈমান যেমন অন্তরের বিশ্বাস, কথা ও আমল, তেমনিভাবে কুফরের ক্ষেত্রেও। কুফর হলো যা একজন ব্যক্তির অন্তরে আছে (বিশ্বাস) অথবা সে যা বলে (কথা) ও করে (কর্ম), অথবা সবগুলো একসাথে।

যদি ব্যক্তির কোনো কাজের মাধ্যমে কুফর প্রকাশ পায়—হোক সেটা মৌখিক (যেমন : আল্লাহকে গালমন্দ করা) অথবা কোনো বাহ্যিক কাজ (যেমন : মুসহাফের প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শন করা)—তাহলে এই স্বতন্ত্র কাজের মাধ্যমেই সে কাফির হয়ে যাবে।

---

[৩৩৫] সুনানুত তিরমিযিতে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং ২৮৭৭। তিনি বলেছেন, এটি সহীহ হাসান হাদীস।

[৩৩৬] ইবলিসের প্রতি কোনো ফেরেশতা বা নবীর মাধ্যম ব্যতীত বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এটি কোনো বিষয়ে দলিল প্রতিষ্ঠা করার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত, কেননা ইবলিস সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে (আদমকে) সিজদাহ করার নির্দেশ শুনেছিল।

[৩৩৭] আস-সারিমুল মাসলুল, ৩/৯৬৭-৯৬৯।

Scanned by CamScanner

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে। দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্রই তার ওপর কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তার অন্তরে কী আছে সেটা এখানে একেবারেই বিবেচ্য না—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যেটিই তার অন্তরে থাকুক না কেন।

আল্লাহ যা বলেছেন সেটা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলা যখন কারও কুফরের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অবশ্যই সত্য।

যেমন: যারা বলে 'আল্লাহ তিনের এক', অথবা 'মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ', অথবা যারা দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

> "তোমরা ওযর পেশ কোরো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরি করেছ।" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৬৬]

নিঃসন্দেহে এসব উক্তি সত্য এবং এ ধরনের ব্যক্তির কুফরও বাস্তব। এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তি যদি অন্তরে আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করে, কিংবা মাসীহকে ইলাহ মনে না করে, তবুও এগুলো কোনো উপকারে আসবে না।[৩৩৮]

এতক্ষণ উদাহরণসহ ও বিস্তারিতভাবে আমি উপরোক্ত মতামতগুলো উল্লেখ করেছি, যার মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অবস্থানের সাথে মুরজিয়াদের বিভিন্ন দলের অবস্থানের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

অবমাননা সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহার

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবমাননা করা কুফর। এবং এই কাজটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবার (বড় কুফর)।

কালাম-শাস্ত্রবিদগণ মুরজিয়াদের মত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেন, এটা কুফর আকবার। তাদের এ অবস্থান আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু তারা আরও বলেন, এটা কুফর কারণ এই কাজের দ্বারা অন্তরে থাকা অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান ফুটে উঠেছে। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছেন, কারণ তারা কুফরকে কেবল অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

এক দল চরমপন্থীরা বলে, রাসূল ﷺ -এর অবমাননা কেবল বাহ্যিক (যাহিরী) অর্থে

---

[৩৩৮] অর্থাৎ যারা বলে 'আল্লাহ তিনের এক', অথবা 'মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ', অথবা যারা দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে তারা যদি আল্লাহকে অন্তরে/অভ্যন্তরীণভাবে এক হিসেবে বিশ্বাস করে, শুধু বাহ্যিকভাবে আল্লাহকে এক বলে না; বরং তাঁর সাথে শিরক করে, কিংবা মাসীহকে অন্তরে/অভ্যন্তরীণভাবে ইলাহ মনে করে না, শুধু বাহ্যিকভাবে মাসীহকে ইলাহ বলে অথবা অভ্যন্তরীণভাবে দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে না, শুধু বাহ্যিকভাবে দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে তবুও এগুলো কোনো উপকারে আসবে না তথা সে কাফির হিসেবেই গণ্য হবে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই কুফরের বিধান হবে। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

কুফর। অর্থাৎ দুনিয়ার আইনকানুনের দিক থেকে এটা কুফর। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সেই ব্যক্তি একজন ঈমানদার হতেও পারে। এটি একটি মিথ্যা ও বাতিল মত।

আরেকদল চরমপন্থায় আরেক ধাপে উন্নীত হয়ে বলে, যে কাজের মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয় সেটাকে হালাল মনে না করলে, কিংবা সুস্পষ্টভাবে কোনো বিধান অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান না করলে কেউই কাফির নয়। এটিও একটি মিথ্যা ও বাতিল মত।

যারা এসব বিষয়ে কথা বলেন কিংবা লেখালেখি করেন এবং না বুঝে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতামত প্রচার করে সালাফদের নামে চালিয়ে দেন, তাদের উচিত গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা।

৫. অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কুফর সীমাবদ্ধ না: কুফর কেবল অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। কুফরের মাধ্যমে অবিশ্বাস বোঝানো হতে পারে আবার অন্যান্য এমন জিনিসকেও বোঝাতে পারে যেগুলোর দ্বারা কুফর নির্দেশিত হয়—সেটা মুখের কথা বা দৈহিক কাজের যেটাই হোক না কেন। এবার এ নিয়ে আলিমগণের বক্তব্যের কিছু উদাহরণ পেশ করছি :

ক) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর দ্বীন বা তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, সে কাফির। আল্লাহ বলেন,

> "আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, 'আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।' ছলনা কোরো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার (কাফির, মুশরিক, পাপী, অপরাধী)।" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৬৫-৬৬]

এ আয়াত সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন,

> "আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন, তারা ঈমান আনার পর কুফরি করেছে, যদিও-বা তারা বলে, 'আমরা কুফরের কথা বলেছি কিন্তু এগুলো বিশ্বাস করি না; আমরা কেবল হাসিঠাট্টা করছিলাম।' মহান আল্লাহ স্বয়ং এখানে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন নিয়ে হাসিঠাট্টা করা কুফর।"[৩৩৯]

তিনি আরও বলেছেন,

> *"আল্লাহ বলেছেন, 'আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে,*

---

[৩৩৯] আস-সারিমুল মাসলুল, ৩/৯৬৭-৯৬৯।

Scanned by CamScanner

আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।...' [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৬৫]

সুতরাং তারা এই কাজ করার কথা স্বীকার করেছে এবং অজুহাত দিয়েছে। আর তাই আল্লাহ বলেছেন,

'ছলনা কোরো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দিইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেবো। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার (কাফির, মুশরিক, পাপী, অপরাধী)।' [সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৬৬]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা নিজেদের কুফরের অপরাধে অপরাধী মনে করত না। এই বিদ্রুপ করাকেও তারা কুফর মনে করত না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ, তাঁর আয়াত-নিদর্শন ও তাঁর রাসূলদের নিয়ে বিদ্রুপ করা কুফর। এই কুফরের কারণে ঈমান আনার পরেও একজন ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা ছিল। জেনেশুনেই তারা একটি নিষিদ্ধ কাজ করেছে। এই কাজ যে হারাম, এটা তারা জানত। তবে তারা একে কুফর মনে করত না। কিন্তু এটা ছিল কুফর। যদিও তারা এই কাজকে বৈধ মনে করত না, কিন্তু এই কাজ করার কারণেই তারা কাফির হয়ে গেছে। মুনাফিকদের অবস্থা প্রসঙ্গে এটি একাধিক সালাফের মতামত। সূরা আল-বাকারাহতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে, যেমন : প্রথমে চক্ষুষ্মান হওয়ার পরেও তারা অন্ধ হয়ে গেল, প্রথমে জানল এরপর অস্বীকার করল, প্রথমে ঈমান আনল এরপর কুফরি করল...।"[৩৪০]

অর্থাৎ সূরা তাওবাহর ৬৫ ও ৬৬ নং আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা বিদ্রুপ করার কারণেই কাফির হয়ে গিয়েছিল। তাদের অন্তরে কী ছিল, মুখে যা বলছিল তা আসলেই তারা অন্তরে বিশ্বাস করত কি না, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আর আয়াতের অর্থ থেকে বোঝা যায় তারা যা বলেছিল, সেগুলো নিজেরাও বিশ্বাস করত না।

খ) ইবলিসের কুফরি: আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণে ইবলিস কাফির হয়েছে, যদিও সে আল্লাহকে স্বীকার করত। আল্লাহর ইয্যতের নামেই সে কসম করেছে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে অবকাশের জন্য দুআ করেছে আল্লাহর কাছেই। সুতরাং সে আল্লাহকে বিশ্বাস করত, আল্লাহর ব্যাপারে

---

[৩৪০] আল-ঈমান, পৃ. ২৬০।

Scanned by CamScanner

জানত এবং বিচার দিবসের ব্যাপারেও ঈমানদার ছিল।

আল্লাহ বলেন,

> “যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদামকে সাজদাহ করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।” [সূরা আল-বাকারাহ, ২:৩৪]

তার কুফরি ছিল ঘৃণা ও অহংকারবশত। এর উদ্ভব হয়েছিল আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে। ইবলিস কাফির হয়েছে শুধু তার এই কাজের কারণে। সে যে আগে ঈমানদার ছিল, সে যে সত্যকে অস্বীকার করেনি, এগুলো তার কোনো কাজে আসেনি।

গ) মুখের কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা কিছু লোককে কাফির হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

> “নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনু মারইয়ামই আল্লাহ।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:১৭, ৭২)

এবং তিনি বলেছেন,

> “নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৭৩)

এসব কথার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে কুফরে আকবার সংঘটিত হয়। যে এগুলো বলে তার অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও, তথা সে যদি এও বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ এক এবং শরিকহীন, তবু সেটা তার কোনো উপকারে আসে না।

ঘ) যারা কবরপূজারি ও গাইরুল্লাহর ইবাদাতকারী : যারা কবর-মাযার পূজা করে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করে, তাদের উদ্দেশে পশু কোরবানি করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে—এসব কাজের কারণেই তারা কাফির। এরপর যদি তারা তাওহীদে বিশ্বাসের দাবি করে কিংবা ভালো-মন্দ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বলেই অন্তরে বিশ্বাসের দাবি করে, এবং সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল; তবুও এগুলো তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

এ-সংক্রান্ত দলিলাদি সুপরিচিত এবং অতীত-বর্তমানের আলিমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে কবরপূজারিদের ভ্রান্ত ও মনগড়া যুক্তির খণ্ডন করেছেন। কবর-পূজারিরা মুরজিয়াদের দলিল উল্লেখ করে বলত, কবরের অধিবাসীদের কাছে দুআ করা, তাদের জন্য পশু যবাই করা এবং তাদের নামে শপথ করা শিরক বা কুফর হবে না, যদি এমন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস থাকে এবং সে দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়।

Scanned by CamScanner

বস্তুত এসব কাজ স্বতন্ত্রভাবে কুফরে আকবার। এমন কাজ করা ব্যক্তি এগুলোকে বৈধ মনে করে কি না তাতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদের দাবি বাতিল হয়ে যায়, যারা বলে, হালাল মনে না করলে কোনো গুনাহর কারণে কেউ কাফির হয় না।

ঙ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবমাননা করা কুফর আকবার, কেউ এটাকে বৈধ মনে করুক কিংবা নাই করুক। এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে একাধিক আলিমের বর্ণনা আছে। এ নিয়ে আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি।[৩৪১]

চ) যারা যাকাত আটকে রেখেছিল এবং এর জন্য লড়াই করেছিল, তাদের কুফরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা চতুর্থ অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে বিবেচ্য দিক হলো, যারা যাকাত আটকে রেখেছিল তারা শুধু এই কাজের মাধ্যমেই কাফির হয়ে গেছে—তারা যাকাতের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করত কি না, সেই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

ছ) 'কোনো ওলী, অন্য কোনো ব্যক্তি কিংবা মাখলুকের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীয়াহর পরিপন্থী কাজ করা বৈধ' এরূপ দাবি করা ব্যক্তি কাফির[৩৪২]—সে অন্তরে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক।

জ) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের প্রতি বেয়াদবি ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে সে কাফির।[৩৪৩] এ বিষয়েও ইজমা রয়েছে। এরপর সে অন্তরে কী বিশ্বাস, কী উদ্দেশ্য রাখে, সেটা মোটেও বিবেচ্য নয়।

৬. মনগড়া নীতি: আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, 'আল্লাহর হুকুম অস্বীকার না করলে নিছক গুনাহর কারণে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না'[৩৪৪] এটি মনগড়া নীতি। এটি প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা ও ভুলের ওপর। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

অস্বীকার করা ছাড়া কুফর হয় না—সব ধরনের গুনাহর ক্ষেত্রে এ মূলনীতির প্রয়োগ

---

[৩৪১] আল-ঈমান, পৃ. ২৯৫ থেকে আলোচনা

[৩৪২] আল-ইকনা, আল-হাজাওয়ি, ৪/২৯৯; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/৪২২।

[৩৪৩] আশ-শিফা, কাযি ইয়াজ, ২/১১০১, এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। আরও দেখুন, রাওজাতুত তালিবীন, ইমাম নববী, ১০/৬৪; আল-ইকনা, ৪ /২৯৭।

[৩৪৪] শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম তার ফাতাওয়া'তে (৬/১৮৯) লিখেছেন, 'যদি কোনো মানবরচিত বিধানে বিচারকারী বিচারক বলে, আমি বিশ্বাস করি এটি মিথ্যা' তবুও এ বিষয়ের হুকুম পরিবর্তন হবে না; বরং সে শরিয়াহ নির্মূলের দোষে অভিযুক্ত হবে। ওই বিচারকের উক্তি সেই ব্যক্তির মতো যে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি এগুলো মিথ্যা, তবুও আমি মূর্তিপূজা করি!'

Scanned by CamScanner

মনগড়া ও বাতিল। এই নীতিটি কেবল যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদির মতো গুনাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব গুনাহ করার কারণে কেউ কাফির হয় না। কেউ এগুলোকে বৈধ মনে করলে সেটা কুফর হবে। খারিজিদের দৃষ্টিভঙ্গির এর উল্টো। তারা ঢালাওভাবে সব গুনাহকে কুফর আকবার মনে করে।

অন্যদিকে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে যেগুলোর দ্বারা কুফর সংঘটিত হয় এবং যেগুলো ঈমান ভঙ্গ করে দেয় (যার কিছু উদাহরণ একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ধরনের গুনাহগুলো হালাল বা বৈধ মনে করা কুফর হবার শর্ত না। বরং যারা এসব গুনাহ করবে, স্বতন্ত্রভাবে এসব গুনাহর কারণেই তারা কাফির হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সেসব গুনাহকে বৈধ-অবৈধ মনে করা কিংবা না করায় পার্থক্য নেই।

যদি এতটুকু স্পষ্ট হয়, তাহলে আমরা বলতে চাই,

> যে শাসক (বা বিচারক) জাতীয় পর্যায়ে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন (বা বিচার) করে, মানবরচিত আইনে শাসন করাকে বৈধ মনে না করলেও শার'ঈ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সে কাফির। ইতোমধ্যে আমরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং অতীত-বর্তমানের আলিমদের উদ্ধৃতি ও মন্তব্য পেশ করেছি। যা থেকে এটি স্পষ্ট যে, তাঁরা এ ধরনের শাসক-বিচারকদেরকে কুফর আকবার অর্থে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। একে তারা অধিকতর সঠিক মত মনে করেন। আর এটাই আমাদের এই বইয়ের মূল বক্তব্য।

বিভিন্ন ভ্রান্ত যুক্তি উল্লেখ করে তারপর খণ্ডনের উদ্দেশ্য হলো, বিপরীত মত পোষণকারী ব্যক্তিরা যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে কথা বলেন, যেগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করেন, সেগুলোর অসারতা ধরিয়ে দেয়া।

পঞ্চম ভ্রান্ত যুক্তি

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে শাসন করাকে বিদআহর সাথে তুলনা করা

এই যুক্তি উত্থাপনকারীদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ অনেকটা এমন,

> একজন বিদআতি মূলত বিদআহর মাধ্যমে শরীয়াহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তার দৃষ্টিতে শরীয়াহতে কিছু অপূর্ণতা রয়েছে, বিদআহর মাধ্যমে সেগুলো সে পূরণের চেষ্টা করে। বিদআতি শরীয়াহ হতে বিচ্যুত এবং এর বিরোধিতাকারী। মানবরচিত আইনে শাসন করা ব্যক্তিও বিদআতির মতো। সেও মনে করে শরীয়াহ অপূর্ণ। মানবরচিত আইনকানুনের মাধ্যমে সে এসব অপূর্ণতা পূরণের চেষ্টা করছে। এভাবে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ভাবে সে শরীয়াহর অপূর্ণতার দাবি করে।
>
> যদি তাই হয়, তাহলে মানবরচিত আইনে শাসন করা ব্যক্তির চেয়ে একজন

Scanned by CamScanner

বিদআতি শরীয়াহর অধিক বিরোধিতাকারী। আর সে অধিক বিপজ্জনকও, কারণ সে তার বিদআহকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়। কিন্তু মানবরচিত আইনে শাসন করা লোকেরা তাদের বানানো বিধানকে শরীয়াহর নামে চালিয়ে দেয় না। সাধারণ মানুষ বিদআতির কারণে তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। কারণ, সে উম্মাহকে বিভক্ত করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ করে।

এরপর তারা বলে, ইমামগণ বিদআহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১। এমন বিদআহ যার মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয় এবং যেগুলো ব্যক্তিকে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেয়। যেমন : ইসলামের ওইসব সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার বিদআহ যেগুলো না জানার পক্ষে কোনো মুসলিমের কোনো ওজর থাকতে পারে না, অথবা সেসব বিষয়ের বিপরীত কিছু বিশ্বাসের কোনো সুযোগও মুসলিমদের জন্য নেই।

২। এমন বিদআহ যার মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয় না এবং যেগুলো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে না।

এরপর তারা মানবরচিত বিধানে শাসনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো প্রয়োগের চেষ্টা করে। এটিকেও তারা দুইভাগে বিভক্ত করে। অর্থাৎ তারা বলে মানবরচিত আইনে শাসনের বিষয়টিও দু-রকমের হতে পারে :

ক) এমন শাসক যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করাকে বৈধ মনে করে এবং (ইসলামের শাসন) প্রত্যাখ্যান করে। এটাকে তারা কুফর আকবার মনে করে।

খ) এমন শাসক (বা বিচারক), যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করাকে বৈধ মনে করে না; যদিও সে নিজেই মানবরচিত বিধান প্রণয়ন ও প্রচার করে এবং সেগুলো মানতে মানুষকে বাধ্য করে। এটাকে তারা ছোট কুফর মনে করে।

মানবরচিত আইনের শাসনকে যারা বিদআহর সাথে তুলনা করে, এই হলো তাদের ভ্রান্ত যুক্তির সারমর্ম।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বিদআহ প্রসঙ্গে সালাফগণের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা উল্লেখ করেছি। শরীয়াহর পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করা বিদআতিদের ব্যাপারে আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তার কিছু উদাহরণও আমরা তুলে ধরেছি। যেমন আশ-শাতিবি বলেছেন, বিদআহর অনুসারীরা মূলত শরীয়াহর অপূর্ণতার অভিযোগ করে।

Scanned by CamScanner

নিঃসন্দেহে বিদআহর সাথে মানবরচিত বিধানের অনেক সাদৃশ্য আছে।[৩৪৫] আর এটাই স্বাভাবিক কেননা মানবরচিত বিধান একটি নতুন আবিষ্কৃত বিষয়, যাকে ইসলামে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আর এ সাদৃশ্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এই ভ্রান্ত যুক্তির ভিত্তি। কিন্তু এ যুক্তির অনেক বৈসাদৃশ্য, ত্রুটি ও সাংঘর্ষিকতা আছে যেগুলো নিরীক্ষণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো :

১। ইসলামী শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক মানবরচিত বিধান প্রণয়ন করা এক ধরনের বিদআহ যা ইসলামে নতুন। নিঃসন্দেহে আজ যেভাবে, যে মাত্রায় এটি হচ্ছে তা নজিরবিহীন। মুসলিম বিশ্বে এর আগে আর কখনো এই মাত্রায় এমন ঘটনা ঘটেনি। এখন আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এটি কী ধরনের বিদআহ, এর মাধ্যমে কুফর হয় কি না ইত্যাদি। আর এটা করতে হবে দলিল-প্রমাণের আলোকে, দ্বীনের সঠিক মূলনীতি ও আলিমদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে।

২। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানে শাসন-বিচার পরিচালনা করা যদিও এক নতুন ধরনের বিদআহ, তবুও অন্যান্য সুপরিচিত বিদআহর সাথে সাধারণভাবে এর তুলনা করা ভুল। কারণ এখানে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন :

ক) মানবরচিত আইনের মাধ্যমে শাসন-বিচার পরিচালনা করা ব্যক্তি খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে শরীয়াহর বিরোধিতা করছে। কোনো শার'ঈ দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে সে আইনকানুন প্রণয়ন করে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় নিছক মানুষের মত বা মানবরচিত বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে। তার আইনকানুনের কোনো (শার'ঈ) দলিল নেই, এমনকি দলিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছুও নেই। তার আইনকানুনগুলো প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টভাবে ইসলামের শরীয়াহর বিরুদ্ধাচরণ করে।

কিন্তু বিদআহর অনুসরণকারী শরীয়াহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবি করে। নিজ অবস্থানের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ, কিয়াস থেকে কিংবা আলিমদের উদ্ধৃতি দিয়ে সে দলিল পেশ করে। অর্থাৎ বিদআহর অনুসারী মনে করে সে আসলে শরীয়াহ অনুসরণ করছে। তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে সেটাই যা আশ-শাতিবি বর্ণনা করেছেন[৩৪৬],

---

[৩৪৫] আল-ইতিসাম, দ্র. ১/৪৬-৫৩, সেখানেই তিনি বিস্তারিতভাবে শরীয়াহর পরিপূর্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন, মানুষের জন্য কোনটি সর্বোত্তম ও উপকারী তা নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের নেই। সেখানে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, কীভাবে বিদআতীরা শরীয়াহর বিরোধিতা করে এবং তারা কীভাবে বিদআতের মাধ্যমে ও নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়াহর সাথে পাল্লা দিতে চায়।

[৩৪৬] আমরা আশ-শাতিবির উক্তি উল্লেখ করেছি কারণ, যেসব আলেম শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক বিদআতের অনুসরণকারীদের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে

Scanned by CamScanner

"তারা এগুলোকে কখনো বিদআহ্ মনে করে না। বরং তাদের কাছে এগুলো শরীয়াহর অংশ যা শরীয়াহর মাধ্যমে নির্দেশিত। যেমন : যারা বলে, আমরা সোমবার সিয়াম রাখি কারণ এই দিনে নবী ﷺ জন্মেছিলেন[৩৪৭], অথবা যারা বারো রবিউল আউয়ালকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করে কারণ নবী ﷺ সেদিন জন্মেছিলেন...।"[৩৪৮]

কেন কিছু ক্ষেত্রে আলিমরা বিদআতিদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমলে নেন, তার আলোচনা করতে গিয়ে আশ-শাতিবি বলেছেন,

"যদি আমরা স্বীকার করি যে, তারা (আলিমরা) কিছু ক্ষেত্রে বিদআতিদের দৃষ্টিভঙ্গি আমলে নেন, তাহলে এর কারণ হলো বিদআতিরা সবক্ষেত্রে নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয় না। যারা নিছক খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, তারা তো শরীয়াহতেই বিশ্বাস করে না। কিন্তু কোনো বিষয়ে যাদের বিশ্বাস এতটাই শক্তিশালী যে তারা মনে করে দলিল-প্রমাণে নির্দেশিত পথই তা অনুসরণ করছে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বলা যায় না যে তারা চূড়ান্তভাবে নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করছে। বরং সে শরীয়াহর অনুসরণ করছে, কিংবা এভাবে বলা যায় যে, সে মূলত নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করছে, কারণ সে এমন কিছু অনুসরণ করছে যা অস্পষ্ট। সুতরাং সহজ কথায়, যারা খেয়ালখুশির অনুসরণ করে তাদের সাথে তার (বিদআতির) কিছু মিল আছে, আবার যারা হকের অনুসরণ করে তাদের সাথেও কিছু অংশে মিল আছে। কেননা সাধারণভাবে সে দলিল-প্রমাণের ভিত্তি ছাড়া কোনো কিছু কবুল করে না। সাধারণ অর্থে আরও মনে হয়, সত্যানুসারীদের সাথে তার নিয়তের মিল আছে, কারণ সকলেই শরীয়াহ অনুসরণ করতে চায়...।"[৩৪৯]

যে বিদআহর অনুসরণ করে, সে তার বিদআহকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয় এবং

সুপরিচিতদের একজন। বিদআতীরা শরীয়াহর অপূর্ণতার অভিযোগ করে, যা আগেই বলেছি।

[৩৪৭] সোমবারে সিয়াম পালনের একটি কারণ হলো, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। সিয়াম পালন অবস্থায় যাতে আমল পেশ করা হয় এ জন্য রাসূল ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন পছন্দ করতেন। আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হয়। তাই আমার পছন্দ হলো, আমার আমল সিয়াম পালন অবস্থায় পেশ করা হোক। (সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং ৭৪৭, হাদীসের মান : সহীহ)। তা ছাড়াও সোমবারে সিয়াম পালনের কারণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ওই দিন আমার ওপর (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪০)। [সম্পাদক]

[৩৪৮] আল-ইতিসাম, ২/৬৩।

[৩৪৯] আল-মুওয়াফাকাত, ৫/২২২। মাশহুর হাসান সালমান সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

শরীয়াহর দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করে।[৩৫০] অন্যদিকে আল্লাহর শরীয়াহকে যে মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করে সে সরাসরি শরীয়াহর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার আইনকানুনের কোনো (শার'ঈ) দলিল নেই।

সুতরাং, বিদআহর অনুসারী এবং শরীয়াহর সাথে বিরোধপূর্ণ আইনকানুন প্রচলনকারীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। এজন্য শাতিবি মানবরচিত বিধান প্রচলনকারীকে চূড়ান্তভাবে খেয়ালখুশির অনুসরণকারী বলেছেন। সে তো শরীয়াহতেই বিশ্বাস করে না, কারণ সে কোনো দলিল-প্রমাণ কিংবা দলিলের ব্যাখ্যা কিছুই অনুসরণ করে না।

খ) বিদআহর বিভিন্ন রকমফের আছে। আছে ছোট-বড় প্রকারভেদ। কিছু বিদআহ একজন ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয়, আবার কিছু বিদআহ তেমন নয়। কিন্তু শরীয়াহ পরিবর্তন করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফর, হোক সেটা ছোট কিংবা বড় কুফর।

বিদআহর মাধ্যমে কিছু নতুন আইনকানুনের প্রচলন, বিদআহর শ্রেণিবিভাগ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর তালিকাভুক্ত করার সময় এদিকে ইঙ্গিত করে আশ-শাতিবি বলেছেন,

> "প্রতিটি ছোট বিদআহর মাধ্যমেও কিছু আইনকানুন ও ধর্মীয় রীতিনীতির সংযোজন অথবা বিয়োজন অথবা সেগুলোর আদিরূপের বিকৃতি ঘটে। এগুলো শরীয়াহর কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটতে পারে অথবা শরীয়াহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এভাবে শরীয়াহর নির্দেশনার অবমূল্যায়ন ঘটে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এমন করলে সে একজন কাফির। কারণ শরীয়াহর কোনো অংশের পরিবর্তন করা কিংবা যোগ-বিয়োগ করা কুফর—সেটা অল্প পরিমাণে হোক কিংবা বেশি পরিমাণে হোক। এ ক্ষেত্রে অল্প বা বেশি পরিমাণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ভুল ব্যাখ্যা বা শরীয়াহর ওপর আরোপিত কোনো ভুল মতের কারণে সেগুলো করে, সে ক্ষেত্রে যদিও তাকে আমরা কাফির সাব্যস্ত করি না, তবুও তার কাজটি নিঃসন্দেহে ভুল যা পরিমাণ বা মাত্রার ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ এর সবটাই গুনাহ এবং পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, শরীয়াহতে এর অনুমোদন নেই।"[৩৫১]

---

[৩৫০] এটি বিদআতের মাধ্যমে সংঘটিত ইসলামের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিগুলোর একটি, কারণ বিদআতীরা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, এভাবে সাধারণ মানুষদেরকে ও তাদের সমগোত্রীয়দের ধোঁকা দেয়। কিন্তু ইসলামে বিদআতের কোনো সুযোগ নেই। আর আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। (লেখক)

[৩৫১] আল-ই'তিসাম, ২/৬১।

Scanned by CamScanner

আশ-শাতিবির মন্তব্যগুলো থেকে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় :

◆ বিদআহর প্রচলন করা আর শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রচলন করার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এটা সত্য।

◆ অল্প বা বেশি যে মাত্রাতেই এমন করা হোক না কেন, সবগুলোই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা।

◆ বিদআহর প্রবর্তক ও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তনকারীর মধ্যে দুইটি বড় পার্থক্য আছে :

- বিদআতি নিজের মতামতকে (শার'ঈ) দলিলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। যদিও সে যে ব্যাখ্যা দেয় তা ভুল। অন্যদিকে যে ব্যক্তি বিনা দলিল-প্রমাণে আইনকানুন প্রবর্তন করে সে ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়াহর বিরুদ্ধে যায়। বিদআতি ও মানবরচিত আইনকানুন প্রচলনকারীর মধ্যে এই পার্থক্যটি খুবই সুস্পষ্ট।

- যে ইচ্ছাকৃতভাবে আইনকানুন প্রবর্তন করে এবং শরীয়াহর বিভিন্ন অংশ সংযোজন-বিয়োজন করে, সে কাফির। অপরদিকে একজন সাধারণ বিদআতি কাফির হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। বিদআতি কাফির হওয়া বা না হওয়া বিদআহর পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

কাজেই কোনো বিদআহর প্রবর্তক ও মানবরচিত আইনের মাধ্যমে শাসন-বিচার পরিচালনাকারী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। ঢালাওভাবে উভয়ের মধ্যে তুলনা করা ভুল। এসব মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও যারা এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করে, ভ্রান্ত ও মনগড়া যুক্তির কারণে তারা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

৩। যিনি এই ভ্রান্ত ও মনগড়া যুক্তির প্রবর্তক, তার উপস্থাপিত তুলনাটি ভুল উপসংহার আনে। এখানে বিদআহকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে—এক ধরনের বিদআহর দ্বারা কুফর হয়, আরেক ধরনের বিদআহর কারণে কুফর হয় না। একইভাবে মানবরচিত আইনের শাসনকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার : যার মাধ্যমে কুফর আকবার সংঘটিত হয়; এর মধ্যে রয়েছে হারামকে হালাল মনে করা, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বিতীয় প্রকার : যা কেবল কুফর আসগার। কোনো বিধান অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান না করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করা এবং আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তিত করা।

এই অবস্থান দুটি ভুল পরিসমাপ্তির দিকে পরিচালিত করে :

Scanned by CamScanner

ক) মানবরচিত আইনে শাসন-বিচারের ক্ষেত্রে কুফর আকবারের হুকুমকে এখানে শুধু বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। কোনো কিছু অবিশ্বাস করা ও প্রত্যাখ্যান করাকেই কেবল কুফর ধরা হয়েছে। এই যুক্তির অনুসারীরা যদি সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে তাদের উচিত বিদআহর ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ করা এবং বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে কুফর আকবার ঘোষণা করা। কারণ উল্লেখিত ভ্রান্ত যুক্তির অর্থ হলো বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট (আকীদাহর) ব্যাপারে যাদের মধ্যে কোনো বিদআহ আছে, তাদের সবাইকে কাফির সাব্যস্ত করতে হবে!

যারা আল্লাহ তা'আলার কিছু সিফাতের অপব্যাখ্যা করে; অথবা বলে যে এগুলোর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে তা আমাদের জানা সম্ভব নয় ফলে এগুলো আল্লাহর কাছেই ছেড়ে দেওয়া উচিত—তখন তাদের সবার ওপর কুফর আকবারের 'ট্যাগ' লেগে যাবে।

অথবা যারা আবু বকর ও উমারের চেয়ে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ মনে করে—যদিও তারা তাঁদের সকলের ব্যাপারেই উত্তম বিশ্বাস রাখে—অথবা যারা আল-কাদর (তাকদীর) এর কিছু অনুষঙ্গ অস্বীকার করে—যেমন : কাদরিয়া, মু'তাযিলা ও অন্যান্যরা—এদের সবার ওপর কুফর আকবারের হুকুম চলে আসবে।

নিঃসন্দেহে এটি মিথ্যা ও বিভ্রান্তি।

খ) যেহেতু তার নীতির অর্থ হলো, মানবরচিত আইনে শাসন করাকে বৈধ মনে না করলে তিনি ওই আইনের শাসককে কাফির সাব্যস্ত করেন না, সুতরাং তার উচিত হবে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্যগত বিদআহর কারণেও কাউকে কাফির সাব্যস্ত না করা। সেই বিদআহর মধ্যে যত মারাত্মক কুফর সংযুক্ত থাকুক না কেন।

যেমন : কবরপূজা ও কবরের অধিবাসীদের উদ্দেশে কুরবানী করা, অথবা এমন কথা বলা যে আরিফ ও আউলিয়ারা ইসলামের বাধ্যবাধকতা মানতে বাধ্য নন। অথবা আল-হাকিম বি আমরিল্লাহর ইবাদাত করা[৩৫২], দ্রুজদের মতো কুফরি করা বা মূর্তির প্রতি সিজদা করা। এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকেও তাহলে কাফির বলা যাবে না। বিশেষ করে সে যদি বলে আমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি এরা আমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এভাবে মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে যে কাজগুলো কুফর সেগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কাফির বলা যাবে না। এসব ক্ষেত্রেও কি একই নীতি অনুসরণ করা হবে?

বস্তুত উল্লেখিত ভ্রান্ত যুক্তি অনুসরণ করলে এমন ভুল উপসংহার চলে আসে। কারণ

---

[৩৫২] ষষ্ঠ ফাতিমী খলিফা (ও ইসমাঈলী ইমাম), সে ৪১১ হিজরী/১০২১ ইং সনে কায়রোতে ইন্তেকাল করে।

Scanned by CamScanner

এই মতামতের ভিত্তি হলো কুফরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা; যার একটি কুফর আকবার বা 'বিশ্বাসগত কুফর', আরেকটি কুফর আসগার বা ছোট কুফর।

দেখুন, এই ভ্রান্ত যুক্তিগুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত :

♦ একটি ভ্রান্ত যুক্তি যা বলে : মানবরচিত আইনকানুন প্রণয়ন করা 'কার্যগত কুফর', আর কার্যগত কুফরের কারণে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয় না।

♦ একটি ভ্রান্ত যুক্তি যা বলে : আল্লাহর শরীয়াহর কিছু প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার না করলে কেবল মানবরচিত আইনে শাসন-বিচার করার কারণে (বা অন্যান্য ক্ষেত্রে) কেউ কাফির হয় না। এই কথার অর্থ হলো কাউকে কখনোই কোনো কাজের কারণে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না।

♦ একটি ভ্রান্ত যুক্তি যা বলে : ঠিক যেভাবে (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো বিদআতিকে কাফির সাব্যস্ত করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার না করলে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না।

এভাবে এই ভ্রান্ত যুক্তিগুলো পরস্পর সম্পর্কিত এবং এগুলো মানুষকে ভুল উপসংহারে নিয়ে যায়।

৪) যেসব বিদআহর কারণে ব্যক্তি কাফির হয় তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এগুলোর মাধ্যমে ওইসব বিদআহকে বোঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াহর সুপরিচিত-সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ের মধ্যে থেকে কোনো কিছুকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা হয়। যে বিষয়গুলো এতই সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত যে এগুলো না জানার পক্ষে অথবা এর বিপরীত কিছু বিশ্বাসের পক্ষে কোনো মুসলিমের কোনো ওজর থাকতে পারে না।

এ সম্পর্কে নিচের কথাগুলো বলা যায় :

♦ শরীয়াহর কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার না করলে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না—এটি মুরজিয়াদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতের জবাব একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রান্ত যুক্তির খণ্ডন দ্রষ্টব্য।

♦ ইমামগণ বিদআহর শ্রেণিবিভাগ করেছেন বিদআহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতে। কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা বা উক্ত কাজটি বিশ্বাসগত নাকি শুধু কার্যগত, এ ধরনের কিছুর ভিত্তিতে তারা শ্রেণিবিভাগ করেননি।

নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

Scanned by CamScanner

ক) চরমপন্থী জাহমিয়্যাহরা আল্লাহ্ তা'আলার সব গুণবাচক সিফাত অস্বীকার করত। তাদের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সালাফদের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য আলিমদের অভিমত হলো, তারা কাফির। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার কিছু গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের ভুল ব্যাখ্যা করে, যেমন আশআরীরা, তাদের কাফির সাব্যস্ত করা হয়নি। এটাই ইমাম ও ফকীহদের সুপরিচিত অভিমত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, উভয় দলই আকীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা করত, কিন্তু দুই দলের ওপর প্রযোজ্য হুকুমে ভিন্নতা এসেছে।

খ) ইসলামের কোনো রোকন প্রত্যাখ্যান করা বা কোনো সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা, যেমন: চুরি, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা, কিংবা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে—এই বিদআহগুলো কুফর আকবার, এ ব্যাপারে ইজমা আছে।

অন্যদিকে যারা মীযান (আমলনামা পরিমাপক দাঁড়িপাল্লা) অস্বীকার করে, শাফায়াতের কয়েকটি প্রকার অস্বীকার করে, কিংবা আহাদ হাদীসে বর্ণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করে–তাদের কাফির সাব্যস্ত করা হবে কি না তা নিয়ে দ্বিমত আছে। অধিকাংশ আলিমের মতে তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে না।

দেখুন, এখানে সবগুলো বিষয়ই আকীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু হুকুমে ভিন্নতা এসেছে।

গ) বাতিনী ফিরকার লোকেরা সালাত ও সিয়ামের যে অপব্যাখ্যা করত তা কুফর আকবার। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার কিছু সিফাত, তাকদীর ও আকীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের অপব্যাখ্যা করে তাদের কাজকে কুফরে আকবার ধরা হয় না।

ঘ) সুফী-যিন্দীকদের মধ্য থেকে যারা বলে অলি-আউলিয়াদের ওপর শরীয়াহর বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য না, তাদের কুফরের ব্যাপারে ইজমা আছে। কিন্তু তাদের অন্যান্য বিদআতী আমল, চর্চা ও শরীয়াহ বহির্ভূত বৈরাগ্য কুফর আকবার না।

ঙ) যে বিদআতীরা কবরের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু উৎসর্গ করে, এগুলোর চারপাশে তাওয়াফ করে এবং মৃত ব্যক্তির কাছে দুআ করে, তারা কুফর আকবার করে। কিন্তু যারা মিলাদ (১২ রবিউল আউয়াল নবী (ﷺ)-এর জন্মদিন পালন) উদযাপন করে, মধ্য শাবানের রজনিতে (শবে বরাত) একত্রিত হয়ে সালাত, যিকির করে, যারা সশব্দে নিয়ত (সালাতের নিয়ত) পড়ে এবং ঈদের নামাযের পূর্বে আযান দেয়—এগুলো

Scanned by CamScanner

কুফরে আকবার নয়।[৩৫৩]

এগুলো সবই কিন্তু কার্যগত বিদআহ।

নির্ভরযোগ্য ইমামগণ বিদআহকে বিশ্বাসগত ও কার্যগত শিরোনামে বিভক্ত করেননি। কেবল, বিশ্বাসগত বিদআহ কুফর আর কার্যগত বিদআহ কুফর না, এমনও বলেননি; বরং বিশ্বাসগত ও কার্যগত বিদআহর সবগুলোকেই অবস্থাভেদে যাচাই করে কোনোটিকে কুফর আকবার হিসেবে আবার কোনোটিকে কুফর আসগার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আলোচ্য ভ্রান্ত যুক্তির মূল ত্রুটি হলো, এখানে ভুল তুলনার মাধ্যমে কুফর আকবারকে শুধু অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার না করলে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না—এই ধারণা বাতিল, এই মানদণ্ড ভুল এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিগুলোও ভুল।

সারমর্ম

আলোচ্য ভ্রান্ত যুক্তির জবাবে উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম নিম্নরূপ :

ক) সঠিক মূলনীতি হলো, বিদআহ কথা, বিশ্বাস, কাজ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। বিদআহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক প্রকার কুফর আকবার, আরেক প্রকার কুফর আসগার। এই শ্রেণিবিভাগ কার্যগত বিদআহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করার হুকুমের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এটিও কথা, বিশ্বাস বা কাজ—বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। এটিও দুই ভাগে বিভক্ত, কুফর আকবার ও কুফর আসগার। এভাবে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব সেটা হলো:

◆ যে ব্যক্তি মুখে কিংবা অন্তরে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে সে কুফর আকবার করে। সে কাফির।

◆ একইভাবে যে মানবরচিত বিধানে শাসন-বিচার পরিচালনা করে ও সেগুলো আঁকড়ে ধরে, সেও কুফরে আকবার করে কাফির হয়ে যায়।

◆ আর যে ব্যক্তি কোনো ছোটখাটো বিষয়ে নিজের খেয়াল-খুশি অনুসারে শাসন-বিচার করে কিন্তু (আল্লাহর বিধানকে) অস্বীকার করে না বা প্রত্যাখ্যান করে না,সে ছোট কুফর (কুফর আসগার) করল।

---

[৩৫৩] বিদআতের মধ্যে কোনগুলো কুফরি আর কোনগুলো কুফরি নয়, এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও ইমামদের উদ্ধৃতি পড়তে চাইলে এই গবেষণাপত্রটি দেখুন, হাকীকাতুল বিদআহ ওয়া আহকামুহা, শাইখ সাঈদ ইবনু নাসির আল-গামিদি, ২/১৯০-৩০৫; মাকতাবাতুর রাশিদ প্রকাশিত।

Scanned by CamScanner

যে এই ধরনের কথা বলবে, সে সঠিক কথা বলছে, যা উম্মাহর ইমামদের মতামত এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

খ) কিন্তু যে বলে : ইসলামের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার না করলে বা প্রত্যাখ্যান না করলে কোনো বিদআহ এর মাধ্যমে কুফরি সংঘটিত হয় না–তার অবস্থান ভুল।

একইভাবে কেউ যদি বলে: আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী ছাড়া অন্য কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না–সে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং উম্মাহর ইমামদের মতামত এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

ষষ্ঠ ভ্রান্ত যুক্তি

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান না করে কেউ যদি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানে শাসন-বিচার করে তাহলে সে কাফির হয় না–এ ব্যাপারে ইজমা আছে।

আমরা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করা দুই প্রকার :

- যখন কোনো ব্যক্তি মানবরচিত মাধ্যমে শাসন-বিচার করাকে বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহর শরীয়াহ দ্বারা শাসন-বিচার করাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে—এই ব্যক্তি কাফির। এ ব্যাপারে কোনো বিবাদ নেই। এ ব্যাপারে সালাফদের ইজমা সুপরিচিত। সে সকল ক্ষেত্রে কাফির। যদি সে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে, তবে আল্লাহর বিধানে বিচার করুক কিংবা মানবরচিত বিধানে, সকল ক্ষেত্রেই সে কাফির।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করে কিন্তু এই কাজকে বৈধ মনে করে না। এটি দুইভাবে ঘটতে পারে :

প্রথম ক্ষেত্রে, সে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক মানবরচিত আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে এবং এই ব্যবস্থা মান্য করাকে ঢালাওভাবে সকলের জন্য সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক করতে পারে। এই ব্যক্তি কুফর আকবারের অপরাধে অভিযুক্ত, যেমনটা এই বইতে এতক্ষণ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিতভাবে **একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনায়** যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে বিচার করে, নিজের খেয়াল-খুশি অনুসরণ বা অন্য কোনো কারণে, কিন্তু সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে বিশ্বাস করে এবং সেগুলো আঁকড়ে ধরে, তাহলে এমন ব্যক্তি কবীরা গুনাহর অপরাধে অপরাধী হবে। এই ব্যক্তির

Scanned by CamScanner

কুফর হলো ছোট কুফর, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের সীমানা থেকে বহিষ্কার করে না।

সুতরাং মোট তিন রকম পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে :

ক) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানে শাসন-বিচার করাকে বৈধ মনে করা এবং আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা।

খ) ব্যক্তিগত পর্যায়ে, বিচারের ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশি অনুসরণের কারণে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানে বিচার করা, তবে এর অনুমতি নেই বলে বিশ্বাস করা।

গ) আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তবে একে বৈধ মনে না করা।

ক-নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। সকলের ঐকমত্য অনুসারে এই ব্যক্তি কাফির।

খ-এর ক্ষেত্রে কিছু মানুষ এমন ব্যক্তিকে কাফির গণ্য করেন। এই মতটি দুর্বল। সঠিক মত হলো উল্লিখিত ব্যক্তি কুফর আকবারের অপরাধে দোষী নন; বরং এটি ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত। সামনের অনুচ্ছেদে এটি নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব।

গ-এটিই সব আলোচনা ও মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু, বিশেষত পরবর্তী যুগের আলিমদের মধ্যে। কুরআন-সুন্নাহ ও আগের-পরের যুগের নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আলিমদের উদ্ধৃতি থেকে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ আমরা এরই মধ্যে উল্লেখ করেছি। এ সবকিছুর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো এ ক্ষেত্রে **কুফর আকবারের হুকুম প্রযোজ্য হবে।**

যারা একে কুফর মনে করেন না, নিজেদের মতামত সমর্থনে দলিল হিসেবে কিছু আলিমের উদ্ধৃতি ছাড়া আর কিছুই তারা পেশ করতে পারে না। বিষয়টি এখানেই থেমে গেলে ততটা মারাত্মক হতো না। কিন্তু তারা এ বিষয়ে ইজমা থাকারও দাবি করে বসেছে! বড়ই অদ্ভুত! অথচ এমন কোনো ইজমা থাকার ব্যাপারে কোনো আলিমের উদ্ধৃতি তাদের পেশ করতে দেখা যায় না। আসলে বাস্তবতা হলো, এমন কাজ যে কুফর আকবার উল্টো সেই মর্মে একাধিক আলিম ইজমার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

তা সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ মতপোষণকারীদের মধ্যে যারা ইজমার দাবি করে, তাদের দাবি আমরা এখন নিরীক্ষণ করব। এখানে শুধু দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি অর্থাৎ খ. নিয়ে আলোচনা করা হবে, কেননা এটিই সকল মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু।

বিরুদ্ধ মত পোষণকারীরা দাবি করে :

Scanned by CamScanner

◆ সালাফদের মধ্যে ইজমা আছে, কবীরা গুনাহর কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না, যদি না সে ওই গুনাহকে বৈধ মনে করে কিংবা এর নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করে।

◆ সূরা মায়িদাহর—'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির' (৫:৪৪)—এই আয়াতের তাফসীর নিয়ে আগের—পরের প্রজন্মের মুফাসসিরীনদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, অস্বীকার করা ব্যক্তি আর যে অস্বীকার করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে : প্রথমোক্ত ব্যক্তি কুফর আকবার অর্থে কাফির এবং পরবর্তী ব্যক্তি ছোট কুফর অর্থে কাফির।

◆ আহলুস সুন্নাহ একমত যে বিদআহ দুই প্রকার : যার একপ্রকার কুফর, আরেক প্রকার কুফর নয়। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

◆ লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই মর্মে ইজমা আছে বলা হলেও এর পক্ষে কোনো আলিমের কাছ থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং এই কথিত ইজমা তাদের নিজস্ব আবিষ্কার।

এই বিষয়ে বিভিন্ন রকমের দলিল-প্রমাণ ও আগের-পরের যুগের আলিমদের উদ্ধৃতি রয়েছে, যা উল্লিখিত বিষয়ে কথিত ইজমার দাবিকে খণ্ডন করে।

উল্লিখিত দাবি খণ্ডনের লক্ষ্যে আমরা বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করব :

১. এই যে ইজমার দাবি করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আলিমদের উদ্ধৃতিগুলো কোথায় গেল? কোনো বিষয়ে ইজমা রয়েছে বলে দাবি করা কোনো হালকা বিষয় না। অনেকে কোনো মতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেন এবং ধরে নেন যে এ ব্যাপারে কেউ তার সঙ্গে দ্বিমত করবেন না। ফলে তিনি এ বিষয়ে ইজমা থাকার দাবি করে বসেন। অনেকের ক্ষেত্রে অনেকবার এমন ঘটেছে। কিন্তু একপর্যায়ে দেখা যায় তারা যেমন ভেবেছিলেন বিষয়টি আসলে তেমন নয়। তাহলে এই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কী বলা উচিত, যেখানে বিরোধী পক্ষ যা দাবি করছে উল্টো তার বিপরীত মতের ব্যাপারেই ইজমার কথা বর্ণিত হয়েছে?

২. কবীরা গুনাহর কারণে কেউ কাফির হয় না যতক্ষণ না সে ওই গুনাহকে বৈধ মনে করে—তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রান্ত যুক্তির খণ্ডনে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে সালাফগণ যে বিষয়ের ওপর একমত পোষণ করেছিলেন তা হলো ওইসব কবীরা গুনাহ, যেগুলোর মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয় না—যেমন : যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। কিন্তু যেসব গুনাহর মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয়—যেমন : আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা বা

Scanned by CamScanner

শিরক করা, মূর্তিপূজা, গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবমাননা করা, মুসহাফের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইত্যাদি–সেগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো করা বৈধ মনে করা হচ্ছে কি না, সেটা বিবেচ্য না। আর এই বিষয়ে সালাফদের ইজমা আছে। চরমপন্থী মুরজিয়া ও অন্যান্য চরমপন্থী মুতাকাল্লিমুন (কালামশাস্ত্রবিদ) বাদে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করেনি। সুতরাং, যেসব কবীরা গুনাহর মাধ্যমে কুফরে আকবার সংঘটিত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতি প্রযোজ্য নয়।

কাজেই নিজেদের যুক্তির সমর্থনে যারা উক্ত ধারণাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে এবং যারা এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে বলে কল্পনা করেন, তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক।

যদি কোনো কবর-পূজারি কাছে এসে বলে: 'বৈধ মনে না করলে, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার মাধ্যমে কুফরে আকবার হয় না—এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা রয়েছে। এই ইজমার দলিল হলো সালাফদের নীতি যেখানে তারা বলেছেন, কবীরা গুনাহকে বৈধ মনে না করলে কোনো মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করা যায় না।'

তবে কি তারা এই যুক্তি মানবেন?

যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালমন্দ করে কিংবা মুসহাফের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সেও যদি নিজের কাজের পক্ষে এই নীতির দলিল দেয়, তবে কি তারা সেটা মানবেন?

যারা এই ধরনের ইজমার দাবি করে তাদেরকে নিচের কথাগুলো হতে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে:

> নিজেদের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে তাদের বলতে হবে যারা গাইরুল্লাহর কাছে দুআ করে, অথবা আল্লাহকে গালমন্দ করে কিংবা কুরআনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তারা এসব কাজকে বৈধ মনে না করলে কাফির হয় না।
>
> যদি তারা এই অবস্থান গ্রহণ করে তাহলে তারা আলিমদের ইজমার বিরুদ্ধাচরণ করলেন এবং চরমপন্থী মুরজিয়াদের জাহমিয়্যাহের মতো মতামত প্রকাশ করলেন।

অথবা,

> তাদেরকে এ সকল কবীরা গুনাহর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে হবে। বলতে হবে যে এসব কবীরা গুনাহর মাধ্যমে কুফর সংঘটিত হয়। ফলে এ ক্ষেত্রে তাদের সালাফদের মতামত গ্রহণ করতে হবে–এই কাজগুলো করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে, সে এগুলো বৈধ মনে করুক কিংবা না-ই করুক।

আর এটা মেনে নিলে তার ব্যবহৃত নীতি ভিত্তিহীন হয়ে যাবে। সমস্ত যুক্তি-তর্কে

Scanned by CamScanner

ধস নামবে। আলোচ্য বিষয়ে ইজমার দাবি করা তো বহু দূরের বিষয়।

সুতরাং এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হলো, এই নীতির ব্যবহার মিথ্যা ও বাতিল। আর আল্লাহ তা'আলাই সরল পথের হিদায়াত দান করেন।

৩. সূরা মায়িদাহর উক্ত আয়াতে মুফাসসীরদের মন্তব্য থেকে যে ইজমার প্রস্তাব করা হয়, সেটাও দুটি কারণে বাতিল ও পরিত্যাজ্য :

ক) ইসমাঈল আল-কাযির মতো আলিমরা বলেছেন:

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হতে নির্দেশিত হচ্ছে, যারা তাদের অনুরূপ কাজ করেছে এবং আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তন করেছে এবং সেটা অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে, তাদের জন্যও একই সাবধানবাণী প্রযোজ্য, সে কোনো শাসক হোক কিংবা না-ই হোক।[৩৫৪]

তিনি কিন্তু মানবরচিত আইনে শাসন-বিচারকে বৈধ মনে করার ব্যাপারে এ কথা বলছেন না; বরং তার এ মন্তব্য নিজের পক্ষ থেকে আইনকানুন প্রবর্তন ও সেগুলোর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে। যা এই আয়াতের শানে নুযুলের আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

যদিও কিছু আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বদলে অন্য কিছু দিয়ে শাসন-বিচার করার ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে একে বৈধ মনে করার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য মুফাসসিরীন এসব শর্ত উল্লেখ করেননি। তাহলে ইজমা গঠিত হলো কীভাবে?

এর সাথে যদি ইবনু কাসীর ও অন্যান্য ইমামদের মন্তব্য আমরা যুক্ত করি, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ ব্যাপারে ইজমার দাবি প্রত্যাখ্যাত। এখানে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সূরা মায়িদাহর আয়াত সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, প্রয়োজনে সেটা দেখা যেতে পারে।

খ) আশ-শাবী হতে বর্ণিত হয়েছে : আল-কাফিরিন (অবিশ্বাসী) বলে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের কথা বুঝিয়েছেন, আয-যালিমীন (সীমালঙ্ঘনকারী) বলে ইহুদিদের কথা বুঝিয়েছেন এবং আল-ফাসিকীন (অবাধ্য) বলে খ্রিষ্টানদের কথা বুঝিয়েছেন।

ইবনুল আরাবী আল-মালিকী এবং শায়খ আশ-শানকীতি তার আদ্বওয়াউল বায়ান-এ এই মতকে সমর্থন করেছেন, যা তাদের উদ্ধৃতি হতে পূর্বেই উল্লেখ করা

---

[৩৫৪] ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার, কিতাবুল আহকাম, বাবু আজরি মান কাজা বিল হিকমাহ, হাদীস নং ৭১৪১।

Scanned by CamScanner

হয়েছে।[৩৫৫] যারা আলোচ্য বিষয়ে ইজমার দাবি করে, তারা আশ-শাবীর মতামত সম্পর্কে কী বলবেন? কিংবা ইবনুল আরাবী আল-মালিকী এবং শায়খ আশ-শানকীতির মতামত সম্পর্কে কী বলবেন, যারা তাফসীরের দুইজন ইমাম, একজন প্রাচীন যুগের আরেকজন আধুনিক যুগের।

যদি কেউ বলে, আশ-শাবী ছোট কুফরের কথা বুঝিয়েছেন, তাহলে আমরা বলব এটা তার বক্তব্যের প্রসঙ্গের সাথে খাপ খায় না; বরং তিনি এর মাধ্যমে বড় কুফরের কথাই বুঝিয়েছেন। তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য মন্তব্যের আলোকে উক্ত ইজমার দাবির ব্যাপারে কী বলা হবে?

৪. বিদআতীদের ওপর প্রযোজ্য হুকুমের ক্ষেত্রে, সালাফদের মতামতের ভিত্তিতে যারা ইজমার দাবি করেন, ষষ্ঠ ভ্রান্ত যুক্তির জবাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদআতীদের ওপর প্রযোজ্য হুকুমকে যদি মানবরচিত আইনের মাধ্যমে শাসনকারীর ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়, তবে এটা বাতিল গণ্য হবে। এ বিষয়ে ইজমার দাবি করা নিছক কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু না। নিরপেক্ষভাবে ও গভীর মনোযোগের সাথে যারা বিষয়টি নিরীক্ষণ করবেন তাদের কাছে এর ভ্রান্তি সুস্পষ্ট।

তা ছাড়া আমরা যদি তাদের ইজমার দাবিকে উল্টে দিয়ে বলি, সালাফগণ যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সেটা হলো কার্যগত বিদআহর অনেকগুলো কুফর আকবার—যেমন কবরের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু উৎসর্গ করা কিংবা মুসহাফের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করা, যদিও ব্যক্তি এগুলো হারাম হিসেবে বিশ্বাস করুক না কেন—সে ক্ষেত্রে এই বক্তব্য বিরোধী মত পোষণকারীদের দাবি অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু শুধু কার্যগত মিল (অর্থাৎ উভয়টিই একপ্রকার বাহ্যিক কাজ) থাকার কারণে কবরপূজার সাথে আমরা মানবরচিত আইনে শাসন-বিচার করার তুলনা করি না; বরং আমরা বলি প্রত্যেকটি বিদআহকে নিজ গুণাগুণ অনুসারে নিরীক্ষা করতে হবে, তারপর যথোপযুক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে সালাফগণ বিভিন্ন কাজকে কুফর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেই কাজকে বৈধ মনে করার শর্ত নির্ধারণ করেননি। এ নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা এনেছি।

৫. আলিমরা একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করে, সে কাফির; যদিও সে অন্য বিধানে শাসন-বিচার করাকে অবৈধ মনে করে। এ বিষয়ে ইজমার কথা একাধিক আলিমের মাধ্যমে বর্ণিত

---

[৩৫৫] এই বইয়ের ৯৭-৯৮ পৃ. দেখুন।

Scanned by CamScanner

আছে।

বিরুদ্ধমত পোষণকারীদের দাবি খণ্ডন করার জন্য শুধু এই একটি বিষয়ে যথেষ্ট। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, তাদের দাবির পক্ষে কোনো আলিম ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন, তখন আমরা বলব, এর বিপরীত মত সম্পর্কেও ইজমার বর্ণনা এসেছে। কাজেই নিজের ইচ্ছেমতো একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ নেই।

আর বাস্তবতা হলো যারা বিরোধী মত পোষণ করে তারা এই দাবির পক্ষে কোনো আলিমের সূত্রে ইজমা পেশ করতে পারে না; বরং এটি তাদের নিজস্ব আবিষ্কার। ইতিমধ্যেই আমরা এ দাবির দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো ব্যাখ্যা করেছি।

অন্যদিকে, মানবরচিত আইনে শাসন-বিচার করা ব্যক্তি কাফির—এই অবস্থানের পক্ষে একাধিক আলিমের সূত্রে ইজমার কথা বর্ণিত আছে। আলিমগণ বলছেন, এই কুফরের হুকুম প্রত্যেক এমন লোকের ওপর প্রযোজ্য, যারা জাহিলিয়াত বা অন্য কোনো ব্যবস্থার আইনকানুন প্রণয়ন করে। তারা যদি এগুলোর (শরীয়াহ বাদে অন্যান্য বিধান) দ্বারা শাসনকে অবৈধ মনে করে, তবু তারা কাফির। এসব আলিমদের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যিম এবং হাফেজ ইবনু কাসীর (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু কাসীর এর আগের যুগের আলিমদের মতামত কী, তারা এই বিষয়ে কী বলেছেন কিংবা তাদের সূত্রে কোনো ইজমার কথা বর্ণিত আছে কি না?

এর জবাব হলো: তাতারদের আগমন এবং তাদের ইয়াসিক বিধান প্রবর্তনের আগে মুসলিম উম্মাহ শরীয়াহর পরিবর্তে অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা, আইনকানুন বা বিচারব্যবস্থা প্রণয়নের দৃষ্টান্ত দেখেনি। এমন ঢালাওভাবে শরীয়াহ বিকৃতির নমুনা দেখেনি। এরপরেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাতাররা প্রথমে এই ইয়াসিক বিধান মানার জন্য বাকি মুসলিম উম্মাহকে বাধ্য করেনি। সেই যুগে মুসলিম বিশ্বে এমন বহু এলাকা ছিল যেখানে বিশুদ্ধ শরীয়াহর শাসন অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাতাররা যখন তাদের পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত আইনকানুন আঁকড়ে ধরল তখন উম্মাহর নির্ভরযোগ্য ইমাম ও ফকীহগণ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাদের ওপর প্রযোজ্য শরীয়াহর হুকুমের ব্যাখ্যা দিলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এই সকল আলিমদের অন্যতম, যা এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

এখন, নিচের কথাগুলো লক্ষ করুন:

Scanned by CamScanner

ক) ইসলামের সূচনালগ্নে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রিসালাত পেলেন, তখন জাহেলী সমাজের লোকেরা আল্লাহর আনুগত্য করত না। মক্কার মুশরিকরা বিচারের জন্য শরণাপন্ন হতো তাদের জাহিলি প্রথা-রীতিনীতি ও বাতিল আইনকানুন বা বাতিল বিচারকদের (তাগূত)। অন্যদিকে মদীনার ইহুদিরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করে আইনকানুন বদলে ফেলেছিল। তারা এ কাজ করেছিল নিজেরা একমত হয়ে। তাদের ব্যাপারে সূরা মায়িদাহর আয়াতগুলো নাযিল হয়। এমতাবস্থায় যখন কুরআন নাজিল হলো, তখন মুশরিক বা আহলে কিতাবীদের আনুগত্য করা ও তাদের কুফরি বিধিবিধান অনুসরণের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সর্তক করা হলো। সেসব সতর্কবাণীতে বলে দেয়া হলো, যারা তাদের (মুশরিক ও আহলে কিতাব) অনুরূপ কাজ করবে তারাও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) মুসলিমদের মধ্যে কেউই কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে অন্য কোনো বিধানে বিচার প্রার্থনা করতেন না। কেবল মুনাফিকদের কয়েকটি ঘটনা ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছেন। অন্য বিধানে বিচার প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে, উন্মোচিত হয়েছে মুনাফিকদের দূষিত স্বভাব-চরিত্র। মুনাফিকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

এভাবেই মুসলিম উম্মাহ কেবল কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমেই বিচারকার্য পরিচালনা করে এসেছে। কেবল অল্প কয়েকটি ঘটনা এর ব্যতিক্রম, তবে সেগুলোও ছিল ব্যক্তি পর্যায়ে নির্দিষ্ট মামলা-মোকদ্দমায় সীমাবদ্ধ, যেখানে কিছু শাসক ও বিচারকের তরফ থেকে অবিচার ও যুলুম হয়েছে।

গ) এই বিষয়টি মুসলিমদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল। কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লিখিত দলিল-প্রমাণসমূহ খুবই পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন।

বিদআহর উদ্ভবের আগ পর্যন্ত উম্মাহ এই স্পষ্ট পথের অনুসরণ করল। এ বিষয়ে বিদআহর অনুসারীদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানীয়, তারা দুই দলে বিভক্ত :

- একদল এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করল এবং শাসক-বিচারকের সকল প্রকার অবিচারকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচার করা হিসেবে গণ্য করে ফলে তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করল। এমনকি এ বিষয়ে আরও সীমালঙ্ঘন করে তারা বলল, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ করা লোকেরাও আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান অনুসরণ করে। ফলে এই সীমালঙ্ঘনকারীরা সাধারণ গুনাহগারদেরও কুফর আকবারের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে শুরু করল।

Scanned by CamScanner

উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকীহগণ এই চরমপন্থী খারিজি দলের বিরোধিতা করলেন। খণ্ডন করলেন তাদের ভ্রান্ত দাবিগুলো। চরমপন্থী খারিজিদের দাবি ছিল যেকোনো অবিচার ও কবীরা গুনাহর মাধ্যমে কুফর হয়, কারণ এটি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানের অনুসরণ।

কিন্তু আলিমরা তাদের এ ভুল দাবির খণ্ডন করলেন। বললেন, এ ধরনের অবিচার ছোট কুফর, অথবা এমন কুফর, যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয় না। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বক্তব্য নিরীক্ষা করেছি।

♦ আরেকদল লোক বিপরীত দিকে বাড়াবাড়ি করল। তারা বলল, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কোনো ফরয আমল পালন করা কিংবা হারাম থেকে বিরত থাকা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত না–এরা হলো মুরজিয়া। উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ তাদের বিভ্রান্তির মোকাবেলা করেছেন ও ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি চরমপন্থী মুরজিয়াদের তারা কাফিরও সাব্যস্ত করেছেন।

ঘ) বাস্তবতার বিচারে ও বাস্তবিক ঘটনার নিরিখে দেখা যায়, পরবর্তী যুগের দুইটি সময় ব্যতীত মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করা ও ইসলামী শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করার দৃষ্টান্ত এই উম্মত দেখেনি :

প্রথমবার: যখন তাতারদের আগমন ঘটল এবং তারা ইয়াসিক বিধান প্রবর্তন করল। শরীয়াহর পরিবর্তে তারা ইয়াসিকের মাধ্যমে বিচার করত অথচ নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত। উম্মাহর ইতিহাসে এটি ছিল নজিরবিহীন ও অভূতপূর্ব ঘটনা। অতীতের কোনো ঘটনায় এর সমপর্যায়ের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আলিমরা এই ফিতনার প্রতিরোধ করলেন এবং এ নিয়ে ফতোয়া প্রকাশ করলেন। তারা ইয়াসিক ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতেন এবং এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুমও জানতেন।

তাতাররা প্রথমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ইয়াসিক বিধান চাপিয়ে দেয়নি,[৩৫৬] মুসলিম বিশ্বে তখন বিশুদ্ধ শরীয়াহর শাসন অব্যাহত ছিল। কিন্তু একপর্যায়ে তাতাররা ইয়াসিকের বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরল এবং শরীয়াহর পরিবর্তে এর মাধ্যমে বিচার করত। ইমামগণ তাদের এই কাজকে শরীয়াহর পরিবর্তন ও বিকৃতি রূপে গণ্য করলেন

---

[৩৫৬] লক্ষণীয় বিষয় হলো এসব আইনকানুন অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলে এই বিধানটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়নি। আলেমরা এই বিষয়ে কঠোর ভাষায় নিষ্পত্তিমূলক ফতোয়া জারি করেছিলেন, সম্ভবত এ কারণে ইয়াসিকের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এ ছাড়া, মুসলিমদের সাথে তাতারদের একীভূত হয়ে যাওয়াও আরেকটি কারণ।

Scanned by CamScanner

উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকীহগণ এই চরমপন্থী খারিজি দলের বিরোধিতা করলেন। খণ্ডন করলেন তাদের ভ্রান্ত দাবিগুলো। চরমপন্থী খারিজিদের দাবি ছিল যেকোনো অবিচার ও কবীরা গুনাহর মাধ্যমে কুফর হয়, কারণ এটি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধানের অনুসরণ।

কিন্তু আলিমরা তাদের এ ভুল দাবির খণ্ডন করলেন। বললেন, এ ধরনের অবিচার ছোট কুফর, অথবা এমন কুফর, যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয় না। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বক্তব্য নিরীক্ষা করেছি।

♦ আরেকদল লোক বিপরীত দিকে বাড়াবাড়ি করল। তারা বলল, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কোনো ফরয আমল পালন করা কিংবা হারাম থেকে বিরত থাকা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত না–এরা হলো মুরজিয়া। উম্মাহর ইমাম ও ফকীহগণ তাদের বিভ্রান্তির মোকাবেলা করেছেন ও ভুলক্রটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি চরমপন্থী মুরজিয়াদের তারা কাফিরও সাব্যস্ত করেছেন।

ঘ) বাস্তবতার বিচারে ও বাস্তবিক ঘটনার নিরিখে দেখা যায়, পরবর্তী যুগের দুইটি সময় ব্যতীত মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করা ও ইসলামী শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করার দৃষ্টান্ত এই উম্মত দেখেনি :

প্রথমবার: যখন তাতারদের আগমন ঘটল এবং তারা ইয়াসিক বিধান প্রবর্তন করল। শরীয়াহর পরিবর্তে তারা ইয়াসিকের মাধ্যমে বিচার করত অথচ নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত। উম্মাহর ইতিহাসে এটি ছিল নজিরবিহীন ও অভূতপূর্ব ঘটনা। অতীতের কোনো ঘটনায় এর সমপর্যায়ের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আলিমরা এই ফিতনার প্রতিরোধ করলেন এবং এ নিয়ে ফতোয়া প্রকাশ করলেন। তারা ইয়াসিক ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতেন এবং এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুমও জানতেন।

তাতাররা প্রথমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ইয়াসিক বিধান চাপিয়ে দেয়নি,[৩৫৬] মুসলিম বিশ্বে তখন বিশুদ্ধ শরীয়াহর শাসন অব্যাহত ছিল। কিন্তু একপর্যায়ে তাতাররা ইয়াসিকের বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরল এবং শরীয়াহর পরিবর্তে এর মাধ্যমে বিচার করত। ইমামগণ তাদের এই কাজকে শরীয়াহর পরিবর্তন ও বিকৃতি রূপে গণ্য করলেন

---

[৩৫৬] লক্ষণীয় বিষয় হলো এসব আইনকানুন অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলে এই বিধানটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়নি। আলেমরা এই বিষয়ে কঠোর ভাষায় নিষ্পত্তিমূলক ফতোয়া জারি করেছিলেন, সম্ভবত এ কারণে ইয়াসিকের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এ ছাড়া, মুসলিমদের সাথে তাতারদের একীভূত হয়ে যাওয়াও আরেকটি কারণ।

Scanned by CamScanner

এবং এই কাজকে কুফর আকবার ঘোষণা করলেন।

দেখুন, এটাই সেই পয়েন্ট এবং এই প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকিহদের মধ্যে ইজমা আছে। এটি সাধারণ অন্যায় বা যুলুমের মতো না, যা উম্মাহর ইতিহাসে আগেও ছিল; বরং তাতাররা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের বিধান চাপিয়ে দিল। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের বানানো এ আইন দিয়েই তারা বিচার ফায়সালা করত। ফলে, সেই যুগের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকীহগণ ব্যাখ্যা দিলেন উক্ত কাজের মাধ্যমে তাতাররা কুফর আকবার করেছে এবং এ বিষয়ে ইজমা আছে। তারা আরও ঘোষণা করলেন, যারা তাতারদের অনুরূপ কাজ করবে, তাদের ওপরেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়বার: আধুনিক যুগ। যখন মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত ও দুর্বল হলো, তখন ইসলামের শত্রুরা, বিশেষ করে খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের ওপর হামলে পড়ল। মুসলিম ভূমিতে তারা যেসব ক্ষতিকর বিষয় ও কুফরের অনুপ্রবেশ ঘটাল তার মধ্যে অন্যতম মারাত্মক কুফর হলো তাদের রেখে যাওয়া মানবরচিত আইনকানুন ও সংবিধান, যার ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।

পূর্ববর্তী ইমামদের মত, সমকালীন ইমামরাও এসব মানবরচিত বিধানের মোকাবেলা করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন এসব আইনকানুন ও এর মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান।

আধুনিক যুগের অবস্থা তাতারদের চেয়ে মারাত্মক। আর তাই বর্তমানের জন্য ইসলামের বিধান ব্যাখ্যা করা আরও জরুরি। কেননা মানবরচিত আইনের শাসন আজ মুসলিম ভূমিতে মহামারির মতো ছড়িয়ে গেছে। এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও অনেক দল-উপদল তৈরি হয়েছে, যারা এসব আইনকানুনের প্রচারণা করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়াহর পরিবর্তে এগুলোকে প্রাধান্য দেয়। আর আমরা কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এবার আমরা এমন কয়েকজন ইমামদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করব, যারা এই বিষয়ে ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন। আসুন দেখা যাক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা কী বলেছেন :

১) শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন:

> যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়কে হালাল মনে করে, যা হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা আছে, বা এমন কোনো বিষয়কে হারাম মনে করে, যা হালাল হবার ব্যাপারে ইজমা আছে, অথবা সে যদি শরীয়াহর যেসব বিষয়ে ইজমা আছে এগুলোর কোনোটির পরিবর্তন বা বিকৃতি করে, তবে ফকিহদের ইজমা অনুসারে

Scanned by CamScanner

সে একজন কাফির।[৩৫৭]

তিনি আরও বলেছেন:

'এটি সুপরিচিত যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে যেসব আদেশ-নিষেধ নাযিল করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা করবে বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, সে একজন কাফির। এ বিষয়ে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান সকলের ইজমা আছে।'[৩৫৮]

২) ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

'কুরআনে এবং বিশুদ্ধ সূত্রে আলিমদের ইজমার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, দ্বীন ইসলামে পূর্ববর্তী সকল ধর্মের রহিতকারী। (এমতাবস্থায়) যে ব্যক্তি তাওরাত, ইনজিলের বিধি-বিধান আঁকড়ে থাকবে এবং কুরআন অনুসরণ করবে না, সে কাফির।'[৩৫৯]

৩) ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

'যে ব্যক্তি নবীদের সিলমোহর (খাতামুন্নাবিয়্যিন) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নাযিলকৃত বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং (পূর্ববর্তী নবীদের) রহিত হয়ে যাওয়া কোনো আইনকানুনের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করবে, সে একজন কাফির। সুতরাং, যে ব্যক্তি শরীয়াহর পরিবর্তে ইয়াসিকের বিধানকে প্রাধান্য দেবে, এর মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করবে তার ওপর কী হুকুম প্রযোজ্য হবে তা সহজেই অনুমেয়। যে এটা করবে, মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে সে কাফির সাব্যস্ত হবে।'[৩৬০]

এই হলো আলিমদের ইজমার বর্ণনা। এর মাধ্যমে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি শরীয়াহর পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করবে সে কাফির। দেখুন, আধুনিক যুগের মানবরচিত আইনকানুনগুলো কোনো পূর্ববর্তী নবীর রহিত হয়ে যাওয়া বিধান না। এগুলো তাতারদের ইয়াসিকের সাথে কিছুটা মেলে। ইয়াসিক বিভিন্ন বিধিবিধানের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল। যার কিছু অংশ নেয়া হয়েছিল ইহুদি-খ্রিষ্টান মুসলিমদের শরীয়াহ থেকে আর বাকি অংশ অন্যান্য উৎস থেকে। তবে আধুনিক যুগের জাহিলী আইনকানুনগুলো তাতারদের ইয়াসিকের চেয়েও আরও মারাত্মক কুফর। কাজেই এ ক্ষেত্রে কুফরের হুকুম আরও বেশি প্রযোজ্য, যা আহমাদ শাকির ও শাইখ আশ-শানকীতি (রাহিমাহুল্লাহ) চিহ্নিত করেছেন। আগের অধ্যায়গুলোতে তাদের বক্তব্য আমরা এনেছি।

---

[৩৫৭] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/২৬৭।

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, ৮/১৬০।

[৩৫৯] আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ১/২৫৯।

[৩৬০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১১৯।

Scanned by CamScanner

উপসংহার: যারা বিরোধী মত পোষণকারী, তাদের ইজমার দাবি প্রত্যাখ্যাত; বরং উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকীহগণ হতে তাদের দাবির বিপরীত মতের পক্ষে ইজমা রয়েছে। বিরোধীপক্ষের কথা খণ্ডনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

সপ্তম ভ্রান্ত যুক্তি

সর্বত্র পাইকারিভাবে কুফরের হুকুম প্রয়োগ করা, এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও।

এই ভ্রান্ত যুক্তিটি আগের ভ্রান্ত যুক্তির বিপরীত। সমকালীন কিছু লেখকের মধ্যে এটা দেখা যায়। সূরা মায়িদাহর আয়াতে বর্ণিত হুকুমকে তারা সর্বক্ষেত্রে কুফর আকবার হিসেবে প্রয়োগ করেন। তারা যেসব বিষয়েকে কুফর আকবার মনে করেন তার কয়েকটি উদাহরণ :

- ♦ আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা অথবা আইনের মাধ্যমে এমন বিষয়ের বৈধতা প্রদান করা, যা আল্লাহ নাযিল করেননি।

- ♦ শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক শাসনব্যবস্থা, আইন ও বিধিবিধানের প্রচার। যদিও এগুলোকে বৈধ মনে করা না হয়।

- ♦ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করা, যদিও সেটা কোনো একক ঘটনা হয় বা কোনো নির্দিষ্ট মামলায় ব্যক্তির খেয়াল-খুশি অনুসরণের কারণে হয় (যেমন : ঘুষ গ্রহণ, বা অন্যান্য কারণে)। এসব ক্ষেত্রে সেই বিচারক যদি নিজের কাজকে হারাম মনে করে, তবুও এই মতের অনুসারীরা একে কুফরি মনে করে।

ওপরের তিনটি পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না। তবে মুজতাহিদের ইজতিহাদী ভুলকে গ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে কাফির সাব্যস্ত করেন না; বরং স্বীকার করেন যে তিনি নিজের ইজতিহাদের জন্য পুরস্কৃত হবেন।

তৃতীয় ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানের সাথে আমরা একমত নই। কোনো একক ঘটনায় কিংবা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্রে হুকুম কেমন হবে তা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা এনেছি। এটি ছোট কুফর ও কবীরা গুনাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেটাকে বৈধ মনে না করে।

যারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে বিচার করেন তাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে কারণে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটা হলো:

১. সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মন্তব্য, 'এটা ছোট কুফর'-কে তারা দুর্বল বর্ণনা গণ্য করেন। ফলে (তারা

Scanned by CamScanner

বলেন) মানবরচিত আইনের মাধ্যমে শাসন বিচারের ক্ষেত্রে এই দলিল ব্যবহার করে বলা যাবে না যে এটা ছোট কুফর।

২. (তারা বলেন,) শুধু একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মায়িদাহর আয়াত নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যিনাকারীর শাস্তি পরিবর্তন করা জনৈক ইহুদির ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছিল। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে কাফির ঘোষণা করে বলেছেন : যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪)

দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এসব ভ্রান্ত যুক্তির জবাব দেওয়া যায়।

১. অধিকতর সঠিক মত হলো, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) যা বলেছেন সেই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন, 'এটা ছোট কুফর', অথবা 'এটা সেই কুফর নয়, যার কথা তারা ভাবছে'। ইবনু আব্বাস এর বর্ণনাগুলোর ইসনাদ একত্রিত করলে এটাই বোঝা যায়।

উপরন্তু, এটা ছোট কুফর, এই বর্ণনাটি তাউস হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যিনি তাবেয়ীদের অন্যতম। সুতরাং এই বক্তব্যটি সালাফদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যালিম শাসক ও কাযিদেরকে খারিজিরা কাফির সাব্যস্ত করত। খারিজিদের এই অবস্থানের খণ্ডনের জন্য ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কথাটি বর্ণনা করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উদ্ধৃতিটি সঠিক। যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়াহকে আঁকড়ে ধরে, তারপর কোনো একক ঘটনা বিচার করতে গিয়ে নিজের খেয়াল-খুশি অনুসরণের কারণে বা অন্য কোনো কারণে যুলুম করে, তবে সেটা কবীরা গুনাহ, যা ছোট কুফর। এর কারণে কেউ ইসলামের সীমা থেকে বহিষ্কৃত হয় না।

২. সূরা মায়িদাহর আয়াতে ইহুদিদের যে কুফরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কোনো একক ঘটনা ছিল না। বাস্তবতা হলো, ইহুদিরা যিনাকারীর ব্যাপারে আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি বদলে ফেলার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। তারপর তারা নতুন শাস্তি ঠিক করল, যিনাকারীর মুখে কালি লাগিয়ে দেওয়া। এই বিধান তারা সর্বজনীনভাবে সব যিনাকারীর ওপর প্রয়োগ করত।

সুতরাং কেবল একটি ঘটনাতেই ইহুদিরা আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেনি। এ আয়াতের শানে নুযুল যারা অধ্যয়ন করেছেন, তারা কেউই বলতে পারেন না যে, ইহুদিরা সামগ্রিকভাবে ও সাধারণ অর্থে আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ছিল। কিংবা এটাও বলতে পারেন না যে, কেবল একজন ব্যক্তির যিনার শাস্তি ক্ষেত্রেই তাদের বানানো বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। বরং তারা শরীয়াহ পরিবর্তন করতে এবং নতুন বিধানের

Scanned by CamScanner

দ্বারা শরীয়াহ প্রতিস্থাপন করতে একমত হয়েছিল। এরপর তারা সেই বিধান সকলের ওপর বাধ্যতামূলক করে দেয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে স্বীকার করে ও আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কোনো একটি ঘটনায় আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের বিপরীত রায় দেয় (যেমন যিনার ক্ষেত্রে নিজের মনমতো কোনো শাস্তি দেয়)–তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো না, যে সম্পূর্ণভাবে যিনার শাস্তির বিধানকেই বদলে ফেলে, প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক বিধি-বিধান জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয় এবং নিজেও সেই সাংঘর্ষিক বিধান আঁকড়ে ধরে।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

৩. ইহুদিরা কেবল একটি ঘটনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের ভিন্নতা করেছে, এই দাবি সঠিক নয়। শানে নুযুলের বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগে করেছি। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ সংক্ষেপে আবার উল্লেখ করা হলো:

> বারা ইবনু আযিব এর বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ইহুদি নবী ﷺ-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, যার মুখে কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ইহুদি আলিমকে যিনার শাস্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। তখন সে বলল, ...আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে যিনার অপরাধ বেড়ে গেল। এমতাবস্থায় আমরা সম্ভ্রান্ত লোককে গ্রেপ্তার করলে তাকে ছেড়ে দিতাম এবং দুর্বল ও অসহায় লোককে গ্রেপ্তার করলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতাম। (একপর্যায়ে) আমরা বললাম, এসো আমরা একটা বিষয়ে একমত হই, যা আমরা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল সকলের ওপর কার্যকর করতে পারি। তখন থেকে আমরা (শাস্তি লাঘব করে) রজমের পরিবর্তে মুখে কালি মেখে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করতে একমত হই। ...[৩৬১]

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে আবু হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> তোমরা প্রথম কার ব্যাপারে এই শাস্তির বিধান উঠিয়ে দিয়েছিলে? লোকটি বলল, আমাদের বাদশাহর নিকটাত্মীয় এক ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার পদমর্যাদা ও বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাকে রজম করা সম্ভব হয়নি। পরে এক সাধারণ ব্যক্তি ব্যভিচার করল এবং তাকে রজম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তার গোত্রের সকল লোক এই বলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল যে, সেই লোকটিকে রজম না করা হলে একেও রজম করা যাবে না। তখন আমরা সবাই মিলে নতুন ধরনের শাস্তি প্রদানের

---

[৩৬১] তাফসীরুত তাবারী, ১০/৩০৫, হাদীস নং, ১১৯২২, আরও দেখুন, ১০/৩৫১, হাদীস নং, ১২০৩৩, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে তাওরাত মোতাবেক শাস্তির নির্দেশ দিচ্ছি।

তখন সূরা মায়িদাহর ৪১ থেকে ৪৪ নং আয়াত নাযিল হয়...।[৩৬২]

দেখুন, দুটি ঘটনার মধ্যে ইহুদিরা কীভাবে পার্থক্য করেছে।

প্রথম ক্ষেত্রে, তারা যিনার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান আঁকড়ে থেকেছে। কিন্তু একটা অবিচারও করেছে। সেটা হলো, সম্ভ্রান্ত লোকদের ওপর যিনার সঠিক শাস্তি প্রয়োগ করেনি। এটি তাদের তরফ থেকে একটি অবিচার (যুলুম) ও মারাত্মক কবীরা গুনাহ, যদিও তাঁরা এই কাজকে বৈধ মনে করত না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তারা যিনার ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির বিধানকেই বদলে ফেলেছে এবং একে তাদের জন্য আগের অবস্থার চেয়ে উত্তম মনে করেছে। রজমের পরিবর্তে অন্য বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তারা একমত হয়েছিল এবং একে সাধারণ নিয়ম বানিয়ে তারা সবার ওপর প্রয়োগ করত। এভাবে তারা শরীয়াহকে বিকৃত করল। এটা কুফর আকবার। এই প্রসঙ্গেই সূরা মায়িদাহর সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

দেখুন, দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কত বিশাল! যদি কেউ সংশয়গ্রস্ত হয়ে এক ঘটনার বিধানকে আরেক ঘটনায় প্রয়োগ করতে শুরু করে, তাহলে ভুল করবে। যারা এই মতের বিরোধিতা করে তাদের যুক্তি দুর্বল এবং আমাদের কথাই সঠিক। এটা স্পষ্ট। সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কোনো সর্বজনীন আইন প্রণয়ন করা এবং কিছু একক ঘটনায় ভিন্ন বিধান প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৫. বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার বিচারের ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচারের ইতিহাস মুসলিম বিশ্বে সুপরিচিত। বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলাম যখন পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে, তখন এমন বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি নগর-জনপদে গভর্নর ও কাযি ছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে অনেক অবিচার হয়েছে। ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবদ্ধ নানা ঘটনায় তারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। খেয়ালখুশির অনুসরণ, ঘুষ ইত্যাদি নানা কারণে এমন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু উম্মাহর ইমাম ও ফকিহগণ এ কারণে কাউকে (শাসক বা বিচারক) কুফর আকবার অর্থে কাফির সাব্যস্ত করেছেন এমন নজির দেখা যায় না। যদি এমনটা ঘটত, তাহলে সে ব্যাপারে অনেক বর্ণনা থাকত এবং তা সুপরিচিত হতো।

এ থেকে বোঝা যায়, কোনো শাসক বা বিচারক যদি সাধারণভাবে আল্লাহর নির্ধারিত

---

[৩৬২] তাফসীরুত তাবারী, ১০/৩০৬, হাদীস নং ১১৯২৪, মাহমুদ শাকির সম্পাদিত।

Scanned by CamScanner

শরীয়াহকে আঁকড়ে থাকে এবং তার প্রয়োগ করে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়াহ কার্যকর না করে অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করে, তবে সেটা হারাম ও কবীরা গুনাহ হবে। এর ফলে সে কাফির হয়ে যাবে না। এসব ক্ষেত্রে সে কাফির হবে যখন সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করাকে বৈধ মনে করবে।

শাসকদের পক্ষ থেকে অবিচার-যুলুমের ঘটনা সুপরিচিত। কাযিদের অবিচারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এগুলো কখনো অল্প মাত্রায় হয়েছে, আবার কখনো বেশি হয়েছে। এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হিসেবে সর্বজনীনভাবে ইসলাম ও শরীয়াহকেই আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছিল। কোনো শাসক বা বিচারকের মাধ্যমে ইসলামের সীমা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার মতো কিছু ঘটে থাকলে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ব্যাপকভাবে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি।

সব যুগের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম ফকিহ্ ও আকীদাহ বিশারদগণ এ বিষয়ে অবগত। এমনকি কিছু ঘটনায় তারা নিজেরাও অবিচারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তারা এগুলোকে যুলুম-অত্যাচারের থেকে বেশি কিছু মনে করেননি; এগুলোকে কুফর আকবারের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেননি।

৬. আলী ইবনু আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকালে খারিজিদের উদ্ভব ঘটে। উমাইয়া খিলাফতকালে তারা একের পর এক বিদ্রোহ করে। এগুলো সুবিদিত। এ সময় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খারিজিরা এসব বিদ্রোহের কারণ হিসেবে শাসকদের বিভিন্ন যুলুম ও অবিচারের কথা বলত। তাদের কাছে এটাই ছিল আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করা। এ কারণে তারা ঢালাওভাবে সব শাসকের ওপর কুফরের হুকুম প্রয়োগ করত এবং বিভিন্ন আয়াতের ব্যাপারে নিজস্ব ব্যাখ্যার অনুসরণ করত।

যদিও এটা সুপরিচিত যে কিছু[৩৬৩] উমাইয়া শাসক ও তাদের প্রাদেশিক গভর্নরদের মাধ্যমে নানা রকমের যুলুম অবিচার ঘটেছে, কিন্তু সালাফদের ইমামগণ খারিজিদের সাথে একমত পোষণ করেননি। শাসকদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে যুদ্ধ করতেও একমত হননি। মনে রাখবেন, তখনকার যুগে ইমামদের অধিকাংশই ছিলেন তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী। তারা খারিজিদের কর্মপদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নানারকম অবস্থান নিয়েছেন। যেমন :

---

[৩৬৩] 'কিছু' শব্দ ব্যবহারের কারণ, মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্যরা তাদের সুশাসনের জন্য সুপরিচিত।

Scanned by CamScanner

ক) তারা খারিজিদের বিদআতী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। খারিজিদের বিদআহর বিরুদ্ধে অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থে সর্তকতা এসেছে, এসব হাদীসগ্রন্থের অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে উমাইয়া যুগের পর।

খ) তারা ওইসব যালিম শাসক ও বিচারকদের কাফির আখ্যা দেননি; বরং তাদেরকে মুসলিম গণ্য করেছে, তাদের পেছনে সালাত আদায় করেছেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক গণ্য করেছেন।

যদিও বিভিন্ন সময়ে অনেক অবিচার ঘটেছে, কিন্তু এগুলো মূলনীতিকে বাতিল করে না। যেমন কিছু আলিম হাজ্জাজ বিন ইউসূফকে তাকফির করে থাকতে পারেন। কিন্তু এটি একটি ব্যতিক্রম ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আর এটিও সুবিদিত যে হাজ্জাজকে সেই সময়কার অধিকাংশ আলিম তাকফির করেননি।

সুতরাং, এর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন-বিচারকারীর ওপর সর্বক্ষেত্রে কুফরের হুকুম প্রয়োগ করতে চান, এমনকি বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনাগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেন, তারা ভুল করছেন। আর আল্লাহ তা'আলাই সব বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

মানবরচিত আইনে শাসন-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে অনেকেই ভুল করেন। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এমন কিছু বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো।

শার'ঈ ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

দুই দল এ বিষয়ে ভুল করে থাকেন।

প্রথম দল মনে করেন, শাসকের প্রণীত যেকোনো ব্যবস্থাই আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরের শাসন, এমনকি সেটা যদি নিরেট প্রশাসনিক ব্যবস্থাও হয়। যেসব প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা হয় না, যেখানে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ হয় না, সেগুলোকেও তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরে শাসন মনে করেন।

অন্য দল মনে করে, শাসক যেহেতু প্রশাসনিক নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারে, কাজেই সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা সব ব্যবস্থাই বৈধ। শাসক যদি মুখে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেয় তাহলে তার বানানো আইনকানুন ও ব্যবস্থার মধ্যে যতই শরীয়াহর সাংঘর্ষিক বিধান পাওয়া যাক না কেন, প্রয়োজনের খাতিরে সেগুলো বৈধ। এমন আরও বিভিন্ন অজুহাত তারা দিয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে দু-দলই বিভ্রান্তির শিকার। আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক শাসনব্যবস্থা আর শরীয়াহর সাংঘর্ষিক নয় এমন প্রশাসনিক নিয়মকানুনের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটির বৈধতা নেই। অন্য দিকে দ্বিতীয়টি নিয়ে আপত্তির কিছু নেই।

এ বিষয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শাইখ আশ-শানকীতি রাহিমাহুল্লাহ। মানবরচিত আইন প্রণয়ন ও এর দ্বারা শাসন নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি বলেছেন,

'আসমান-জমিনের রবের প্রতি কুফর সংঘটিত হয় এমন মানবরচিত ব্যবস্থা প্রণয়ন

Scanned by CamScanner

করা আর যে ব্যবস্থায় কুফর সংঘটিত হয় না, তাদের মধ্যে আমাদেরকে পার্থক্য করতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়।'

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বলা যায়, ব্যবস্থা দুই রকমের হয়ে থাকে; একটি প্রশাসনিক, আরেকটি আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত।

কাজের শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি প্রশাসনিক নিয়মকানুন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, যদি সেগুলো শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এ ব্যাপারে সাহাবা ও পরবর্তীদের কোনো দ্বিমত নেই। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় করা হয়নি। এর একটি উদাহরণ হলো সৈনিকদের নাম রেজিস্ট্রি করা, যাতে এর মাধ্যমে উপস্থিত-অনুপস্থিত চিহ্নিত করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি করেননি। তাবুক অভিযানে কাব ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আসেননি, এটা তাবুকে পৌঁছানোর আগে তিনি জানতেন না।

এ ছাড়া, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কাতে সফওয়ান ইবনু উমাইয়ার বাড়ি কিনে সেটাকে কারাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কেউই কারাগার প্রতিষ্ঠা করেননি।

এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যাপারে আপত্তির কিছু নেই। এগুলোর উদ্দেশ্য কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, এতে শরীয়াহর বিরুদ্ধাচরণও হয় না। কাজেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজকর্ম নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুসজ্জিত করা অথবা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক না এমনভাবে প্রশাসনিক কাজের কাঠামো বিন্যস্ত করায় কোনো সমস্যা নেই। এ ধরনের মানবরচিত ব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি নেই। এর মাধ্যমে জনকল্যাণের স্বার্থ রক্ষিত হয়, যা শরীয়াহর উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম।

কিন্তু আসমান-জমিনের রবের নির্ধারিত শরীয়াহর বিপরীতে আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং তার মাধ্যমে বিচার, শাসন, ফায়সালা করা কুফর। যেমন : সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া অন্যায্য ঘোষণা করে নারী-পুরুষ উভয়কে সমান সম্পত্তি দিতে হবে দাবি করা, পুরুষের বহুবিবাহকে যুলুম বলা বা শরীয়াহতে নির্ধারিত তালাকের পদ্ধতিকে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে দাবি করা, বা রজম, চোরের হাত কাটা ইত্যাদি শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে বর্বরোচিত বলা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় কুফর।

সমাজের সদস্যদের জান-মাল, সম্মান, বংশ, পরিবার, মনন ও জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর ইসলামী শরীয়াহর পরিবর্তে এ ধরনের আল্লাহদ্রোহী কোনো সিস্টেম চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আসমান-জমিনের রবের প্রতি কুফরি করা হয়। যিনি সমগ্র মানবজাতির স্রষ্টা, মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে যিনি সর্বাধিক জ্ঞাত, এটি তার নির্ধারিত

Scanned by CamScanner

ও প্রণীত ঐশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তিনি পবিত্র মহামহিম। আইন-বিধান প্রণয়নে তিনি শরিকবিহীন।[৩৬৪]

তিনটি বিষয়ে লক্ষ করলে শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক মানবরচিত আইনব্যবস্থা আর শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সহজে বোঝা যাবে :

ক) কোনো রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংবিধান অনুসারে আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকার কার? এমন কোনো কর্তৃপক্ষ, কাউন্সিল, কমিটি বা ব্যক্তি কি আছে যাকে আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয়েছে? এমন কোনো কাউন্সিল কি আছে যারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে? যাদের অনুমোদন ছাড়া আইন পাশ হয় না, আবার তাদের অনুমোদন থাকলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিধানের বিপরীত হলেও আইন পাশ হয়ে যায়?

নাকি সেই রাষ্ট্রে প্রচলিত সিস্টেম ও আইনের ভিত্তি আল্লাহর শরীয়াহ? সেখানে কি আল্লাহর শরীয়াহ চূড়ান্ত? শরীয়াহর আনুগত্য করতে সবাই কি বাধ্য, যেমন ইসলামী শাসন ও এর যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে সহজেই নিছক প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর আইন ও শাসনব্যবস্থার পার্থক্য করা সম্ভব।

খ) এই ব্যবস্থায় কি এমন কিছু আছে, যা শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক? শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা বলতে এমন-সব বিষয়ের বিরোধিতার কথা বোঝানো হচ্ছে, যা মানবজীবনের সবকিছুর সাথে জড়িত এবং যেগুলোর পক্ষে শার'ঈ দলিল বর্ণিত আছে। সেটা হতে পারে কুরআন-হাদীসের নসের এর মাধ্যমে কিংবা ইজতিহাদ ও ইস্তিমবাতের মাধ্যমে।

গ) যেসব বিষয়ে আলিমদের ইখতেলাফ আছে, সেগুলো তুচ্ছ কোনো বিষয় না। আইনপ্রণেতারা এসব বিষয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে না; বরং মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রথমত, দেখতে হবে ওই রাষ্ট্রের আইন ও শাসনব্যবস্থার উৎস কী? যেটা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়ত, আলিম-মুজতাহিদদের ইজতিহাদের মধ্যে দলিলের আলোকে কোনটি অধিকতর বিশুদ্ধ?

---

[৩৬৪] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৪/৯২-৯৩।

Scanned by CamScanner

তাকফিরের ক্ষেত্রে সালাফগণের মানহাজ

কাউকে কাফির সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সালাফদের পদ্ধতি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে তারা মুরজিয়া ও খারিজি উভয় দলের বাড়াবাড়ির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার অনুসারী। লক্ষণীয় বিষয়, এ ব্যাপারে মতভেদগুলো আসলে ঈমান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে জড়িত। ঈমান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। এর জন্য আলাদা বই প্রয়োজন। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু কথা আনব, যাতে এ বিষয়ে সালাফদের ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা সহজে বোঝা যায়।

মুরজিয়া ও খারিজি, দু-দলই একটি বিষয়ে ভ্রান্তির শিকার। দু-দলই ঈমানকে একটি অবিভাজ্য একক মনে করে। তাদের মতে, যদি ঈমানের কোনো একটি অংশে ঘাটতি থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ঈমান বাতিল হয়ে যায়।

খারিজি ও তাদের সাথে একমত পোষণকারীরা বলে :

> কুরআন-সুন্নাহ বুঝে পাওয়া যায়, আমল ঈমানের অংশ। কাজেই কোনো আমল বা তার অংশবিশেষে যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে পুরো ঈমানে ঘাটতি হয়ে যাবে। এ জন্যই কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুসলিম নয়, আখিরাতে সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

ওদিকে মুরজিয়ারা বলে :

> কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, কবীরা গুনাহ করা লোকেরা যদি এক আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে একসময় তারা জান্নাতে যাবে।
>
> এ ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হলো ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা এবং আমলকে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন সাব্যস্ত করা। কারণ, আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হলে একাংশের ঘাটতির অর্থ হবে পুরো ঈমানের ঘাটতি।

খারিজিরা ঢালাওভাবে সব কবীরা গুনাহগারকে কাফির সাব্যস্ত করে। যেমন, তারা মনে করে শাসক বা বিচারকের যুলম কবীরা গুনাহ এবং এটি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-বহির্ভূত শাসন। কাজেই এটি কুফর আকবার। যদিও এটা কোনো একটা মামলার ক্ষেত্রে ঘটে এবং সেই বিচারক নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতাকারী বলে বিশ্বাস করে।

একইভাবে সুদখোর, মদ পানকারী, যিনাকার ইত্যাদি গুনাহগারদেরও তারা কাফির বলে, যদিও এই গুনাহগাররা এসব গুনাহকে হালাল মনে করে না। নিঃসন্দেহে এটি পথভ্রষ্টতা ও মারাত্মক বিচ্যুতি।

ওদিকে মুরজিয়ারা নিজেদের যুক্তির সাথে অদ্ভুত বৈপরীত্যপূর্ণ কথা বলে। তারা বলে :

Scanned by CamScanner

যার অন্তরে বিশ্বাস আছে সে মুমিন, এরপর সে যা খুশি করুক না কেন। যতক্ষণ ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস থাকবে সে কখনো কাফির হতে পারে না, সে যা-ই করুক না কেন।

এরপর যখন প্রশ্ন করা হয় : সেসব লোকের ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কী, যারা জেনেশুনে আল্লাহকে গালমন্দ করে অথবা মূর্তির প্রতি সিজদাহ করে বা মুসহাফ (কুরআন) পদদলিত করে—মুসলিমদের ইজমা অনুসারে এই কাজগুলো কি কুফর না?

তারা বলে, হ্যাঁ অবশ্যই।

এরপর তাদেরকে বলা হয় : অন্তরে বিশ্বাস রেখেও তো কেউ এসব কাজ করতে পারে। যেমন অহংকার-ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামির কারণে। কিংবা সে এসব কাজকে তুচ্ছ মনে করে করতে পারে। কাজেই অন্তরে বিশ্বাস আছে এমন ব্যক্তিও কুফর করতে পারে। যেমন : ইবলিস, ফিরআউন ও ইহুদিরা তাদের অন্তরে সত্য জানত, কিন্তু অহংকার ও গোঁড়ামির কারণে তারা কাফির।

জবাবে মুরজিয়ারা বলে: কোনো কথা বা কাজের মাধ্যমে যারা কুফর করে, সেই কথা বা কাজ তাদের অন্তরে ঈমান না থাকার একটি চিহ্ন অথবা তাদের অজ্ঞতা ও ইলমের ঘাটতির নিদর্শন।[৩৬৫]

অথচ এটা বাস্তবতা এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধির বিপরীত। যেমন ফিরআউন তার রবের পরিচয় জানত, কিন্তু সে ঈমান আনেনি। আল্লাহর পাঠানো রাসূল মুসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করেনি। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন,

> 'তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।...' [সূরা আন-নামল, ২৭:১৪]

একই কথা প্রযোজ্য ইবলিস ও ইহুদিদের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ তারা অন্তরে সত্য জেনেও প্রত্যাখ্যান করেছে। ইহুদিদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> '...তারা তাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে।...' [সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৪৬; সূরা আল-আনআম, ৬:২০]

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহকে আল্লাহ মধ্যপন্থা ও সত্যের হিদায়াত দান করেছেন। এ জন্য তারা বিশ্বাস করেন ঈমান হলো কথা, বিশ্বাস ও কাজের সমষ্টি। যদি কেউ আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে তবে ঈমান বৃদ্ধি পায়। যদি অবাধ্যতা ও গুনাহ

---

[৩৬৫] তাদের কেউ কেউ বলেছেন : এরা বাহ্যিকভাবে কাফের হলেও বাস্তবে ঈমানদার!

Scanned by CamScanner

করে তবে ঈমান হ্রাস পায়।

খারিজি ও মুরজিয়ারা ঈমানের ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী। ঈমানের কোনো একটি অনুষঙ্গে ঘাটতি হলে ঈমানের বাকি অংশ নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং অন্যান্য অনুষঙ্গে ঘাটতি হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা নির্ভর করে ঈমানের মাত্রা ও শাখাগুলোর ওপর।

কোনো কবীরাহ গুনাহ করা ব্যক্তি ওই গুনাহকে হালাল মনে না করলে, সে একজন মুসলিম। তার ঈমানে ঘাটতি আছে, অথবা সহজ ভাষায় বলা যায় সে একজন অবাধ্য মুসলিম। আখিরাতে তার ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করবেন। কুরআন-হাদীসের দলিলের নির্দেশনা থেকে সালাফগণ নিশ্চিতভাবে জানতেন, কাফির ছাড়া কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যারা কবীরা গুনাহ করেছে কিন্তু কাফির নয়, তারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি পাবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

যে পদ্ধতির ভিত্তিতে সালাফগণ কাউকে কাফির সাব্যস্ত করতেন তা বেশ কয়েকটি মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল, যেমন :

১. মুসলিম হবার ঘোষণা এবং দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়া প্রত্যেকে মুসলিম। অন্যান্য মুসলিমদের মতো তারাও সমান অধিকার ও দায়িত্ব পাবে। সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত আমরা কিবলার কোনো অনুসারীকে (অর্থাৎ মুসলিমকে) কাফির বলি না। সুতরাং, যেসব ফিরকা ও দলের অনুসারীরা বাকি সবাইকে কাফির বলে, তাদের বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এসব দলের লোকেরা নিজেরা কিছু শর্ত বানায়, যেমন তাদের দলে যোগ দেয়া। যাদের মধ্যে এসব শর্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই মুসলিম, বাকি সবাই তাদের কাছে কাফির!

এই সংজ্ঞা রাসূল ﷺ-এর যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে জাহেলী সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, কিংবা যেসব স্থানে অধিকাংশ মানুষ মুশরিক বা খ্রিষ্টান এবং যেখানে কাফিররা প্রভাবশালী ও মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানেও প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু তারপরেও, যে ব্যক্তি দুই কালেমার সাক্ষ্য দিবে এবং ইসলাম বিনষ্টকারী কোনো কাজ করবে না–সে একজন মুসলিম।

যারা বিভিন্ন কারণে ঢালাওভাবে কোনো মুসলিম সমাজকে কাফির বা মুরতাদ আখ্যা দেয় এবং মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইসলামের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত কাফির গণ্য করে, তারা সালাফদের পথ থেকে বিচ্যুত, চরমপন্থী। উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনার দিকে দেখুন, যখন কালেমার সাক্ষ্য শোনার পরেও তিনি জনৈক

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিকে হত্যা করলেন—তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কী বলেছিলেন?[৩৬৬]

২. প্রত্যেক গুনাহর কারণে মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করা যায় না। এটি খারিজি ও তাদের সাথে একমত পোষণকারীদের অনুসৃত মূলনীতির বিপরীত। কাজের মাধ্যমেও কুফর হতে পারে। এটি মুরজিয়াদের অবস্থানের বিপরীত।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলে, যেসব কুফর ও শিরক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তা হতে পারে মুখের কথা, অন্তরের আমল (বিশ্বাস) ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের মাধ্যমে। এই মূলনীতি অনুসারেই আহলুস সুন্নাহ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে।

একজন মুসলিম কালেমার সাক্ষ্যদান, ইসলামের রুকনসমূহ পালন এবং অন্যান্য অনেক নেক আমল করতে পারে। কিন্তু ঈমান ভঙ্গকারী কিছু করলে সে ইসলামের সীমানা থেকে বের হয়ে যেতে পারে। মুরজিয়ারা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মনে করে, কালেমার সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করা ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলাম ত্যাগ করতে পারে না, যতক্ষণ না এমনভাবে অবিশ্বাস করে যাতে অন্তরে ঈমানের অনুপস্থিতি প্রকাশ পায় :

---

[৩৬৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং, ৯৬,৯৭। হাদীসটি হলো এই-
উসামা ইবনু যাইদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক জিহাদ অভিযানে পাঠালে আমরা প্রত্যুষে 'জুহাইনার' (একটি শাখা গোত্র) 'আল-হুরাকাতে' গিয়ে পৌঁছালাম। এ সময়ে আমি এক ব্যক্তির পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলি। তখন সে বলল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। (কালিমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি) বিধায়, আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হলো। তাই ঘটনাটি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও হত্যা করেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে অস্ত্রের ভয়ে জান বাঁচানোর জন্য এরূপ বলেছে। রাসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখেছো, যাতে তুমি জানতে পারলে যে, সে এ কথাটি ভয়ে বলেছিল নাকি সত্যিকার অর্থে বলেছিল? (রাবি আনাস বলেন) রাসূল ﷺ এ কথাটি বারবার আবৃত্তি করতে থাকলেন। আর আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকলাম, 'হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম!'
কাউকে কাফির আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা প্রয়োজন। শুধু ধারণার ভিত্তিতে কাউকে কাফির আখ্যা দেয়া জায়িয নেই। বরং কাউকে কাফির আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে তাকফিরের মূলনীতি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকতে হবে। তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যথেষ্ট ইলম থাকতে হবে। কেননা, যার কুফরি সুস্পষ্ট তাকে তাকফির করা যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি কুফর থেকে মুক্ত বা যাকে তাকফির করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকাও জরুরী। মুমিনকে কাফির বলা এবং কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন বলা কোনোটাই শরীয়াহ সমর্থন করে না। [সম্পাদক]

Scanned by CamScanner

ক) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করে, যেমন : অলি-আউলিয়া বা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে যারা দুআ করে, তার কথা ধরুন।

মুরজিয়ারা বলে, এরা যদি বিশ্বাস করে অমুক অলি বা কবরে শায়িত ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বাধীন সৃষ্টিক্ষমতা আছে, তাহলেই শুধু তাদের কাফির বলা যাবে। এই বিশ্বাস না থাকলে শুধু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করার কারণে এদেরকে কাফির বলা যাবে না। তাদের মতে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ বাদে অন্য কারও ইবাদাত করে, কিন্তু অন্তরে শিরকী বিশ্বাস না থাকে, তবে এটা শিরক না!

এটি নিঃসন্দেহে ভুল। মক্কার মূর্তিপূজারি মুশরিকরাও একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করত। মূর্তিগুলোকে তারা মনে করত আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও সুপারিশকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনে তাদেরকে কাফির ও মুশরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ) মুরজিয়াদের কেউ কেউ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের প্রতি সিজদাহ করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা ও কসম করাকে বৈধ মনে করে। তারা বলে, এগুলোর (চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি) নিজস্ব ক্ষমতা আছে এমনটা বিশ্বাস না করলে এতে শিরক হবে না। কেউ যদি শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বা তাদের সুপারিশকারী গণ্য করে তাদের প্রতি সিজদাহ, কুরবানী বা কসম করে, তবে সেটা শিরক হবে না।[৩৬৭]

গ) মানবরচিত আইনে শাসনের ব্যাপারে মুরজিয়ারা বলে, যারা আল্লাহর শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সাংঘর্ষিক মানবরচিত বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করে, এই কাজকে বৈধ মনে না করলে তারা কাফির হব না। কারণ কুফরের ক্ষেত্রে শুধু বিশ্বাসের বিষয়গুলো ধর্তব্য। এটি তাদের একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, যা নিয়ে আগে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

৩. ঈমান কুফর ও শিরক সম্পর্কে যে-সকল দলিল রয়েছে, সেগুলো নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, নিফাক, কুফর, শিরক, যুলুম, ফিসক ইত্যাদির মধ্যে ছোট-বড় প্রকারভেদ আছে।

বড়গুলো একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে, আর ছোটগুলো ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। সুতরাং, একজন ব্যক্তির মধ্যে আনুগত্য-অবাধ্যতা, ঈমান-কুফর এবং ইসলাম ও নিফাকের মিশ্রণ থাকতে পারে। কিন্তু এটা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

---

[৩৬৭] দারউ তাআরুদ্বিল আকল ওয়ান-নাকল, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ১/২২৭।

Scanned by CamScanner

অথচ মুরজিয়ারা এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে ও সব দলিলকে একই অর্থে ব্যাখ্যা করে। তাদের মতে, কুরআন-হাদীসের দলিলে উল্লিখিত প্রতিটি কুফর, নিফাক, শিরক মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তারা ছোট-বড় ভেদাভেদ করে না। এটি পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি। তারা কিছু দলিল গ্রহণ করে বাকিগুলো উপেক্ষা করে।

৪. যেকোনো বিষয়ের সাধারণ নিয়ম ও সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ওই নিয়ম প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য আছে। কুফরের হুকুমের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে দুইটি দল ভুল করেছে:

একদল মনে করে, একজন ব্যক্তিকে কখনোই কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না। তারা রিদ্দার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বলে, কোনো ব্যক্তির ওপর কুফরের বিধান প্রয়োগ করা খুবই কঠিন, কারণ কাফির সাব্যস্ত করার কোনো শর্ত পাওয়া যায় না অথবা সেখানে তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা আছে। এটি মুরজিয়াদের অবস্থান। তাদের মতে কুফর কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফর হতে পারে না।

আরেকদল মনে করে, যদি কোনো কাজ কুফর হবার ব্যাপারে সাধারণ হুকুম পাওয়া যায়, তাহলে ওই কাজ সম্পাদনকারী সবার ওপর ওই হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং এমন প্রত্যেককে কাফির সাব্যস্ত করতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সবার অবস্থা যাচাই-বাছাইয়ের, তাকফিরের শর্তগুলো উপস্থিত আছে কি না, কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না, এগুলো দেখার প্রয়োজন নেই।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতে উপরোক্ত দুই দলের কোনোটিকেই সমর্থন করে না। ব্যক্তিকে কখনো কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না, তারা এটা বলেন না। আবার কোনো গুনাহ করলেই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর কুফরের হুকুমও প্রয়োগ করেন না; বরং তারা যাচাইবাছাই করে দেখেন যে ওই সুনির্দিষ্ট ঘটনাটি কুফর হিসেবে বিচারযোগ্য কি না।

এ ক্ষেত্রে সালাফদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষা করলে দেখা যায়, তারা অনেক সময় কিছু কাজ, বিদআহ, মতামত ইত্যাদির ব্যাপারে সাধারণভাবে কুফর হবার কথা বলেছেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তারা খুবই সর্তকতা অবলম্বন করেছেন। এর বিভিন্ন কারণ আছে। যেমন : এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তি মূর্খ হতে পারে, অথবা ওই ঘটনার পক্ষে ক্ষমাযোগ্য কোনো ভুল ব্যাখ্যা থাকতে পারে, ওই ব্যক্তি নও-মুসলিম হতে পারে, অথবা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে যেগুলোর কারণে একজন ব্যক্তিকে তাকফির করা যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন :

'কুরআন-সুন্নাহ এবং আলিমদের ঐকমত্য অনুসারে যেসব চিন্তাধারা ও কাজকে

Scanned by CamScanner

কুফর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, শরয়ী দলিল অনুসারে সাধারণভাবে সেগুলোকে কুফরই গ্রহণ করতে হবে। তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঈমান আছে কি নেই, এটি বিচারের বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নির্ধারিত নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, এটি মানুষের ধারণা, অনুমান বা খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কুফরি বলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা কাফির সাব্যস্ত করব না, যতক্ষণ না এটি প্রমাণিত হবে যে তার ক্ষেত্রে তাকফিরের শর্তগুলো উপস্থিত এবং তাকে তাকফিরের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

যেমন, কেউ বলল, মদ-সুদ হালাল। কিন্তু দেখা গেল সে নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা দূরবর্তী মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছে অথবা এ ব্যাপারে বিধান শোনার পরে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ সে এগুলোকে কুরআন বা রাসূল ﷺ -এর হাদীস মনে করেনি।

সালাফদের মধ্যেও কয়েকজন কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে যখন তারা প্রমাণ পেলেন যে আসলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বলেছেন, তখন তারা মেনে নিয়েছেন। সরাসরি রাসূলুল্লাহর কাছে প্রশ্ন করার আগ পর্যন্ত সাহাবিরাও কিছু বিষয় সন্দেহ করতেন, যেমনিয: (আখিরাতে) আল্লাহকে দেখা।

আলোচ্য বিষয়ের আরেকটি উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির উক্তি—'মৃত্যুর পর আমাকে ভস্মীভূত করে ছাইগুলো সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত করে দেবে, ফলে আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালিয়ে যাব (আমার হাশর হবে না এবং শাস্তি পাব না!)', ইত্যাদি। হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত না হলে এ ধরনের লোকদেরকে তাকফির করা যায় না কারণ, আল্লাহ বলেন,

'...যাতে রাসূলগণ প্রেরণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।...' [সূরা আন-নিসা ৪:১৬৫]

আল্লাহ এই উম্মাহর ভুলত্রুটি ও ভুলে যাওয়া ক্ষমা করেছেন।[৩৬৮]

ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা জাহমিয়্যাহ মতবাদের ওপর কুফরের হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন। জাহমিয়্যাহরা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করত, কুরআনকে একটি মাখলুক (সৃষ্ট) বলত, তাকদীর (আল-কাদ্বা ওয়াল কাদর) ও (আখিরাতে) আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করত। কিন্তু কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়া ইমামগণ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করেননি। যেসব ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কুফরির শর্ত পূরণের প্রমাণ ছিল এবং তাকফিরের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না, শুধু

---

[৩৬৮] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩৫/১৬৫-১৬৬।

Scanned by CamScanner

তখনই তারা রিদ্দার হুকুম প্রয়োগ করতেন।

৫. কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করা নয়। অনেকেই ভুলবশত মনে করেন যাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুমতি আছে কিংবা লড়াই করা বাধ্যতামূলক, তারা সবাই কাফির-মুরতাদ। এটি নিঃসন্দেহে ভুল। ইসলামের বিধানসমূহ থেকে এটি সুপরিচিত যে, মুরতাদ না হলেও কোনো দলের ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বা লড়াই করা যায়, যেমন: খুনি বা লড়াইরত বিদ্রোহীদের দমন করা। তেমনিভাবে যালিম অথবা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও তাকফির না করে লড়াই করা যায়।

নিঃসন্দেহে সাহাবিরা কিছু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একমত হয়েছিলেন, যেমন খারিজি, কিন্তু তারা কাফির কি না এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অধিকতর সঠিক মত হলো তারা কাফির নয়।[৩৬৯]

আবার আহলুয যিম্মা অর্থাৎ (ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত চুক্তিবদ্ধ) ইহুদি-খ্রিষ্টানরা নিঃসন্দেহে কাফির। কিন্তু কাফির হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিভঙ্গ না করলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না...ইত্যাদি।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল মানবরচিত আইনে শাসন-বিচার পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম ও আলিমদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা। এটি একটি অ্যাকাডেমিক গবেষণা, যেখানে দলিল-প্রমাণ ও আলিমদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে শরীয়াহর হুকুম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তবে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে–যেমন কোনো নির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে কী হুকুম প্রযোজ্য হবে–খুবই সতর্কতার সাথে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা জরুরি। এ ধরনের হুকুম প্রয়োগের আগে ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করার শর্ত ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আর আল্লাহই সব বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

---

[৩৬৯] মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/২৮২, ৭/২১৭-২১৮, ২৮/৫০০, ৫১৮।

Scanned by CamScanner

উপসংহার

ইসলামী শরীয়াহর বদলে মানবরচিত আইনের শাসন সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যার অন্যতম। এটি এক চরম বিপর্যয়, যা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে ব্যাপকভাবে। মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এটি। অন্তরে ইসলামের জন্য গীরাহ আছে এমন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটি মনোবেদনার কারণ।

আলিম, তালিবে ইলম ও দাঈদের আবশ্যক দায়িত্ব হলো এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা। শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন এবং সব ক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান মোতাবেক বিচার ফায়সালা করা বাধ্যতামূলক—এটি তুলে ধরতে হবে মানুষের সামনে। স্পষ্টভাবে মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে মুসলিমদের জন্য শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু বেছে নেয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য জাহিলি জীবনব্যবস্থা, আইনকানুন ও মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করার বিপদও প্রচার করতে হবে।

আশা করি সত্য প্রচারের সেই প্রচেষ্টায় এ বইটি একটি ক্ষুদ্র অবদান হিসেবে সংযুক্ত হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তিনি আমাকে ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতা দান করেন এবং এই কাজকে সকলের জন্য কল্যাণকর হিসেবে কবুল করেন।

এই বইটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. শরীয়াহ দিয়ে শাসন করা ইসলামী আকীদাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি নানাভাবে আকীদাহর সাথে সংযুক্ত। যেমন আল্লাহর ওপর ঈমান, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা, আল্লাহর আসমা ওয়া আস-সিফাতের স্বীকৃতি, মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করা তথা দুই কালেমার সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের সাথে শরীয়াহ শাসনের বিষয়টি সংযুক্ত।

২. যেসব দলিলে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে বিচার-ফায়সালা করার বাধ্যবাধকতার কথা এসেছে সেগুলোর সংখ্যা অনেক এবং সেগুলো বৈচিত্র্যময়। যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে কখনো মুশরিক, কখনো কাফির আবার কখনো মুনাফিক হিসেবে। এ বিষয়ের বৈচিত্র্যময় দলিল থেকেও

Scanned by CamScanner

বোঝা যায় ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের জন্যই বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর। আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য থেকে সরে যাওয়া।

৩. মানবরচিত আইনে বিচার ও শাসনের বিষয়টি দুইভাবে ঘটতে পারে :

ক) কুফর আকবার (বড় কুফর): এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এ বিষয়টির কুফর শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার বা মানবরচিত আইনে শাসনকে হালাল মনে করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং এটা ঘটতে পারে বিভিন্নভাবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অস্বীকার, মানবরচিত আইনে শাসনকে জায়েজ মনে করা কুফর আকবার। একইভাবে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক আইনব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং এসব জাহিলি বিধানকে মানা বাধ্যতামূলক করে দেয়াও স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবার।

খ) কুফর আসগর (ছোট কুফর): ছোট কুফরের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। এটি তখন প্রযোজ্য, যখন ব্যক্তিপর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় বা সীমিত পরিসরে যুলুম-অবিচারের ঘটনা ঘটে। বিচারক এ জন্য নিজেকে গুনাহগার বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর বিধানকে সঠিক মনে করে। তবে এটিও কবীরা গুনাহ এবং অন্যান্য অনেক কবীরা গুনাহর চেয়ে মারাত্মক।

অন্যান্য কবীরা গুনাহর (যিনা, চুরি, সুদ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তটি এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই কাজকে বৈধ (হালাল) মনে করা যাবে না। যদি বৈধ মনে করা হয়, তবে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কারণ হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়।

৪. সূরা মায়িদাহর আয়াত,

'...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৪]

এর ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তি উল্লেখ করে অনেকে বলে থাকে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইনের শাসন ছোট কুফর।

এ বইতে বিষয়টির বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর অন্যান্য দলিল, সাহাবিদের উক্তি কিংবা ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অন্যান্য বর্ণনা উপেক্ষা করে, যারা শুধু এই একটি উক্তি আঁকড়ে ধরে, তাদের যুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে।

৫. ইতিহাসে শরীয়াহ্ পরিবর্তনের বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছিল। তৎকালীন আলিমরা সেসব ফিতনার মোকাবেলা করেছেন। কিছু উদাহরণ আমরা বইতে উল্লেখ করছি।

Scanned by CamScanner

যারা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট আকীদাহগত বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তারা এ থেকে উপকৃত হতে পারেন।

৬. মানবরচিতে আইনে শাসন কুফর আকবার হবার বিষয়টি যারা স্বীকার করতে চান না, তারা অনেক মনগড়া, ভ্রান্ত যুক্তিতর্ক পেশ করেন। সেগুলোর প্রচারের মাধ্যমে এ গুরুতর বিষয়টিকে তারা উপস্থাপন করতে চান গুরুত্বহীন কিংবা নিদেনপক্ষে স্বাভাবিক কিছু হিসেবে। এই বইতে তাদের এসব ভ্রান্ত যুক্তি ও আপত্তিগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

আবার, যারা বিপরীত প্রান্তে অবস্থান নিয়ে সুনির্দিষ্ট ঘটনার বাছবিচার না করে সবাইকে পাইকারিভাবে কাফির সাব্যস্ত করে, তাদের ভ্রান্ত যুক্তিতর্কের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৭. পরিশেষে, এসব বিষয় আলোচনা এবং এর ফলাফল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। আইনব্যবস্থার সাথে নিছক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। তাড়াহুড়া করা যাবে না মানুষদের 'কাফির' ঘোষণায়। সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পরই কেবল সুনির্দিষ্ট ঘটনায় অবস্থান নেয়া যাবে। এসব ক্ষেত্রে তাকফিরের শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কি না, লক্ষ রাখতে হবে। এ বিষয়ের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হয়েছে কি না, নিশ্চিত করতে হবে সেটাও।

সবশেষে বলতে চাই, আমি প্রথমে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি, তারপর দলিল-প্রমাণসমূহের ওপর। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রাচীন ও বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইমাম, ফকিহ ও আকীদাহ বিশারদদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা তুলে ধরেছি।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই বইটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করেন এবং আমার নিয়তে ইখলাস ও বিশুদ্ধতা দান করেন। আমি দুআ করি, যেন তিনি আমাকে, আমার পিতা-মাতা, শাইখবৃন্দ ও মুসলিম ভাইদেরকে এর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না করেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

পরিশেষে জগৎসমূহের রব আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

Scanned by CamScanner

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা

কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে। আর **শয়তান** চায় তাদেরকে **ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।**

| সূরা আন-নিসা : ৬০ |

Scanned by CamScanner

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,

"আমরা বলি, আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল (ﷺ) -এর অবমাননা করা যাহিরী-বাতিনী (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) উভয় ক্ষেত্রেই

। অবমাননাকারী এই কাজকে হালাল মনে করে, নাকি হারাম মনে করে, অথবা এ কাজ হালাল-হারাম হবার ব্যাপারে তার কোনো মত আছে কি নেই, ইত্যাদি মোটেও বিবেচ্য নয়। এ ব্যাপারে তার মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। এটিই ফুকাহায়ে কেরামসহ সকল আহলুস সুন্নাহর রায়, যারা বলেন ঈমান কথা ও কাজের সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে কে কৌতুকবশত এমন করল, আর কে গাম্ভীর্যসহকারে করল, তাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই।"

বই: অপরিহার্য শরীয়াহ

Scanned by CamScanner

ইবনু কাসীর বলেন,

খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়াহকে যে অগ্রাহ্য করে, রহিত হয়ে যাওয়া কোনো বিধানের দ্বারস্থ হয়, **সে কাফির।**

তাহলে **ইয়াসিকের দ্বারস্থ হওয়া** এবং কুরআন-সুন্নাহর ওপর একে অগ্রাধিকারদাতার কী অবস্থা হবে?

যে কেউ এমনটি করবে, **মুসলিমদের ঐকমত্যে**

▪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১১৯ ▪

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner